
বিশ্বাসঘাতকের সন্ধানে
অভীক দত্ত

বিশ্বাসঘাতকের সন্ধানে

অভীক দত্ত

বিশ্বাসঘাতকের সন্ধানে



পত্রভারতী®

www.patrabharati.com

পত্রভারতী®

প্রথম প্রকাশ **ডিসেম্বর ২০২৩**
দ্বিতীয় মুদ্রণ **জানুয়ারি ২০২৪**

পত্রভারতী বুকস প্রাইভেট লিমিটেড, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

অলংকরণ **আশিস ভট্টাচার্য**

BISWASGHATAKER SANDHANE
Spy Fiction *by* Abhik Datta
Published by PATRA BHARATI BOOKS Pvt. Ltd.
1/1 Brindaban Mallick Lane, Kolkata 700009

Sales Office : PATRA BHARATI®
at 3/1 College Row, Kolkata 700009
+91-33-22411175, 9433075550
info@patrabharati.com
patrabharatibooks 9830806799

ISBN 978-93-95635-66-0

বাবাকে

এ গল্পের উৎপত্তি আমার অডিও চ্যানেলের জন্য স্পাই থ্রিলার ‘অপারেশন ট্রেইটর’ লিখতে গিয়ে। শুরু তো করেছিলাম, খানিকটা লেখার পর বুঝলাম, ওভাবে হবে না। লেখার একটা পটভূমি দরকার। সে ভাবনা থেকে অপারেশন ট্রেইটর লেখা বন্ধ করে আগে ‘দিন প্রতিদিন’ লিখতে শুরু করলাম।

রুমা ও দিব্যেন্দুর কাহিনি। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে এ দেশ খুব একটা পিছিয়ে পড়ে নেই। লেখার সময় সেই সত্যি ঘটনাগুলো খুঁজতে গিয়েও মন খারাপ গ্রাস করেছে বার বার। অবশেষে লিখতে পারলাম। ‘দিন প্রতিদিন’-এর পর অপারেশন ট্রেইটরও শেষ হল। মূল লেখা আর তার পূর্ব পটভূমি, এই দুটি কাহিনিই এই বইয়ের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ। লেখার সময় চরিত্রেরা স্বপ্নে হানা দেয়। লেখা শেষের পরেও দেয়। তারাই বার বার বলে চলেছে তাদের গল্প আরও বেশি করে বলতে হবে। পরের অপারেশনগুলো কী হবে, সে সম্পর্কে না বললে কী করে হবে? অগত্যা ঠিক করা গেল, এই বই দিয়েই এই সিরিজ শুরু হোক।

আশা করি, এ বই পাঠকপ্রিয় হবে।

ধন্যবাদান্তে

অভীক দত্ত

২৪শে নভেম্বর, ২০২৩

প্লট ১। দিন প্রতিদিন



১

'জয় কালী ফ্লুটস।'

অফিস থেকে ফেরার সময় রোজই দোকানটা দেখে দিব্যেন্দু। দেখাই হয়। সাতজন্মে তাদের পরিবারে কেউ গান বাজনা করেনি। গানের ব্যাপার পরিবারে নেই। কেউ শোনেও না। তাই দোকানটা দেখাই হয়। এর বেশি কোনকালেই হয়নি। শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা।

প্রবল গরম পড়েছিল।

এখন মেঘ হচ্ছে। বৃষ্টিও হচ্ছে। অফিস ফেরতা বৃষ্টির চোটে জয় কালী ফ্লুটসেই আটকে গেল দিব্যেন্দু। গিটার, মাউথ অর্গান, হারমোনিয়াম, তবলা...কত জিনিস।

দিব্যেন্দু মরা চোখে দেখতে লাগল।

হঠাৎ একটা জিনিসের উপর তার চোখ আটকাল। বাঃ। ভালো তো। এটা কাজের।

'কত দাদা?'

দাম বলল দোকানদার। দিব্যেন্দু দরদাম না করেই কিনে ফেলল।

বৃষ্টি নামতে দৌড়। শেয়ালদা অবধি দৌড়ে যেতে পারলে বাস ভাড়াটুকু বাঁচে।

বাসভাড়া X মাসের ওয়ার্কিং ডে = সেভিংস। খারাপ না।

ট্রেন শেয়ালদায় দাঁড়িয়ে আছে। ঝড়ের মতো পাবলিক ছুটছে। ডানদিক থেকে বাঁদিক থেকে। সামনে থেকে পাঁচ নাম্বার বগি। তাদের গ্রুপের ওই একটাই কামরা।

দিব্যেন্দু ছুটল না। জানে সিট রেখে দেবে কামরুল।

কামরুলকে সবাই ভিমরুল বলে। কামরুল রাগে না। কিংবা রাগলেও দেখায় না। হাওয়া খারাপ হচ্ছে। রাগ দেখিয়ে লাভ নেই।

দিব্যেন্দু ঢুকতেই কামরুলের চোখ খুশিতে ভরে উঠল, 'এসো এসো।'

দিব্যেন্দু বসল। উইন্ডো সিট। সিটে বসার আগে একটু দেখে নেয় দিব্যেন্দু। লোকজন খুব হারামি। একবার ফাঁকা সিট দেখে বসার পর দেখা গেল কেউ হেগে রেখে দিয়েছিল।

লোকজন ট্রেনে কী করে হাগে কে জানে। হাগার পর ছোঁচে কোথায়? কই, তার তো হাগা পায় না এতো। সেদিন গোটা রাস্তাটা কী করে ফিরেছিল সেই জানে।

তাস সাফল করছে তাপস। আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কালকের পেমেন্টটা পাইনি কিন্তু।'

দিব্যেন্দু ফোন বের করে বলল, 'দিয়ে দিচ্ছি। ভাবখানা এমন করছ, যেন পালিয়ে যাব।'

তাপস খিকখিক করে ওর বিশ্রী হাসিটা হেসে বলল, 'শালা বাঙাল, কাঁটাতার পেরিয়ে এসেছিস। কবে আবার ও পারে চলে যাবি।'

দিব্যেন্দু বলল, 'চোপ শালা, পোকা খোর।'

তাপস কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কামরুল অন্য কথা তুলল। অন্য কথা তোলার দায় কামরুলেরই থাকে। না তুললেই সব ঝামেলা শেষমেশ হিন্দু-মুসলমানেই চলে যাবে। কামরুল বলল, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ কীভাবে হারলো দেখলে?'

তাপস বলল, 'নেদারল্যান্ডের কাছে তো? হবেই তো। যে দেশে মোল্লা নেই, সে দেশ উন্নতি করবেই।'

কামরুল দাঁত বের করল। এটা ছোট। গায়ে লাগছে না।

ট্রেন ছাড়ল। বিকাশ বলল, 'আদা তিনশো টাকা কেজি। খাব কী রে ভাই? কার পেছনে গুঁজব?'

তাপস বলল, ‘আদা খাবি না। যেটার দাম বেশি, সেটা খাবি না।’

বিকাশ চুপ করে গেল। সে কথা কম বলে।

তাপস দিব্যেন্দুর দিকে তাকাল, ‘কীরে বাঙাল, তুই দেখলি আমি টেক্কা দিয়েছি, তারপর তুই ট্রাম্প করলি? এই শুঁটকি মাছের বুদ্ধি নিয়ে খেলতে আসিস?’

দিব্যেন্দু ফ্যাকাসে মেরে গেল। অন্যমনস্ক হয়ে ভুল করে ট্রাম্প করে দিয়েছে। তাপস এবার ছাড়বে না। দিব্যেন্দু গলা তুলল, ‘ঠিক আছে গেড়ি গুগলি। থাম। অনেক হয়েছে। বাড়ি গিয়ে মাংস রান্নার সময় আরও দু’থাবা চিনি দিয়ে দিস।’

তাপস বলল, ‘খেলতে পারিস না, খেলতে আসিস কেন?’

ও পাশ থেকে একটা বাচ্চা ড্যাবড্যাব চোখে তাদের দেখছে। দিব্যেন্দু সেটা দেখে চুপ করে গেল।

এক-একটা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াচ্ছে, আরও লোক উঠছে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অফিসে মারাত্মক ঝামেলা হয়েছে আজ। চাকরিটা যাবে যাবে করছে। দিব্যেন্দুর কাঁধের কাছটা কেমন দপ দপ করছে। প্রেশার বেড়েছে। ওষুধ খেতে হবে।

তাপসের বক বক আর উল্লাসে গোটা রাস্তাটা কাটল।

তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে।

স্টেশনে ট্রেন থামার পরে অপেক্ষা করল না দিব্যেন্দু। দৌড়ে সাইকেল স্ট্যান্ডে গিয়ে সাইকেল নিয়ে সাইকেলে উঠে পড়ল। দাঁড়ানো যাবে না। পায়খানা পেয়েছে।

প্রতিদিন ঠিক এই সময়টাই পায়খানা পায়। ট্রেন দাঁড়ালেই। ঠিক কোন টাইমটেবিলে এটা হয় জানা নেই।

মুখে মারিতং বীর তাপস ভেজা বেড়ালের মতো স্টেশনেই দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনে বাতেলায় অন্ধকার করে দেওয়া তাপস বাড়িতে খুব একটা কথা বলে না।

তাপসের বাড়িতে যেতে ভালো লাগে দিব্যেন্দুর। তখন কী ভদ্র!

তাপসের বউ বাঙাল। বাড়িতে পারে না। বাঙাল বউয়ের উপর সব ফ্রাস্ট্রেশন ট্রেনে ঝাড়ে।

বৃষ্টি হচ্ছে। অনেক কষ্টে পায়খানা আটকে দিব্যেন্দু মফস্সলের রাস্তায় সাইকেল দৌড় করাচ্ছে।

রুমা জানলা দিয়ে দেখছিল দিব্যেন্দু আসছে। দৌড়ে দরজা খুলে দিল।

দিব্যেন্দু সাইকেল ফেলে জামা প্যান্ট খুলে গামছা নিয়ে বাথরুমে দৌড়ল।

দশ মিনিটে শান্তি নেমে এল।

দিব্যেন্দু এরপর স্নান করবে কুড়ি মিনিট ধরে। গান বর্জিত জীবন। একটাও গান বেরোবে না। কোনও হু হাও না।

আধঘণ্টা পর সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে লুঙ্গি পরল।

ফতুয়া পরে ব্যাগ থেকে জয় কালী ফ্লুটস থেকে কেনা জিনিসটা বের করে রুমাকে ডাকল, ‘এসো দেখি।’

রুমা ঘরে ঢুকল।

দিব্যেন্দু বলল, ‘এসো। কাছে এসো।’

রুমা আরেকটু এগিয়ে এল।

দিব্যেন্দু অভ্যস্ত হাতে রুমার চুল ধরল, ‘এসেছিল আজ? তোর নাং?’

রুমা চুপ করে রইল। কথা বলল না।

দিব্যেন্দু হাতে নিল জিনিসটা। তবলার হাতুড়ি। ছোট অথচ কার্যকর।

মেঝেতে বসে রুমার বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলে এক বাড়ি মারল। রুমা আর্তনাদ করে মেঝেয় বসে পড়ল।

রক্ত বেরোচ্ছে।

দিব্যেন্দু রুমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'আজকেই কিনলাম। এটা কাজে দেবে। যাও, মুড়ি গরম করে নিয়ে এসো।'

রুমা ফ্যালফ্যাল করে দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে।

তার ব্যাকগ্রাউন্ডে তাদের প্রি-ওয়েডিং ফটোশুটের ছবিগুলো কোলাজ করা। রুমার এক ভাই করে দিয়েছিল...

২

'যখন মারবে, তখন দেখবে যেন পোশাকের উপর দিয়ে মারে। তাতে লাগে কম।'

পলা বলল।

পায়ে ব্যান্ডেজ করতে হয়েছে। ইনজেকশন পড়েছে। ব্যথা হচ্ছে ভীষণ।

ওষুধের দোকানে জিগ্যেস করেছিল কী হয়েছে। রুমা বলেছে পায়ে হাতুড়ি পড়েছে। দোকানদার বিশ্বাস করছিল না।

এই দোকানেই পলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল রুমার। পলার হাত ভেঙে দিয়েছিল ওর বর। এখন অনেকটাই ঠিক আছে। আজ পলার হাতে ইস্তিরি ঘষে দিয়েছে। কালো হয়ে ভয়াবহ দেখাচ্ছে।

রুমা বলল, 'তোমাকে যখন ইস্তিরি দিল, তখন কি জামা পরেছিলে?'

পলা মাথা নাড়ল, 'না। স্নান করে এসেছিলাম। কী মনে হয়েছিল, ছ্যাকা দিয়ে দিল।'

আজমত স্টোরের গেটের পাশ দিয়ে ঘড়ি দেখা যাচ্ছে। রাত আটটা বেজে গেছে। বৃষ্টি প্রচুর হয়েছে। রাস্তা ভেজা।

দিব্যেন্দু যেমন রুমাকে সন্দেহ করে, পলার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেটা না। পলার বাবার কাছে ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে পনেরো লাখ টাকা পণ চেয়েছিল। পলার বাপের বাড়ি তেরো লাখ জোগাড় করতে পেরেছিল। ওই দু'লাখের জন্যই মার খেতে হচ্ছে এখনও। ওর বরের ইচ্ছে হলেই পলাকে মারে।

রুমার পায়ে বেশ ব্যথা হচ্ছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটছে।

পলা বলল, 'সেই যে ছেলেটা, যাকে নিয়ে তোমাকে সন্দেহ করে, সে এখন কোথায় আছে?'

রুমা মাথা নাড়ল, 'জানি না।'

পলা বলল, 'আমার বাবাকে ফোন করেছিল। বলেছে এই সপ্তাহের মধ্যে টাকা না পেলে যেভাবে শুয়োর মারে, সেভাবে রড গরম করে আমার ওখানে...'

পলার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

রুমা তাদের বাড়ির সামনে পৌঁছতে দেখল পাড়ার কোন এক বয়স্ক লোকের সঙ্গে দিব্যেন্দু গল্প করছে। পাড়ায় দিব্যেন্দুর ইমেজ অত্যন্ত ভদ্র সভ্য একজন মানুষের। রুমা ফিসফিস করে বলল, 'আমি ঢুকলাম। সাবধানে যাও।'

পলা বলল, 'ঠিক আছে।'

দিব্যেন্দু দেখল রুমা ঘরে ঢুকছে। সে কিছু বলল না। যার সঙ্গে দিব্যেন্দু কথা বলছিল, সেই ভদ্রলোক বললেন, 'কী হয়েছে বউমা? খুঁড়িয়ে হাঁটছ যে?'

রুমা বলল, 'ওই রান্না করতে গিয়ে...'

দাঁড়াল না সে। দ্রুত পায়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। বাইরে থাকলে রাতে দিব্যেন্দু এসে বলবে সে ওই লোকটার সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করছিল। রুমা যখন বলবে লোকটা তার বাবার বয়সি, তখন দিব্যেন্দু বলবে সুগার ড্যাডি বোঝো? বোঝো না? কোথায় কী ফুল ফুটিয়ে রাখছ আমি কী করে বুঝব? আমি তো বুঝতে পারব না।

রুমা ঘরে ঢুকে গেল। ফোনে প্রত্যুষের নাম্বার ডায়াল করল। ফোন এখনও অফ। রুমা হাল ছাড়ে না। রোজই একবার চেষ্টা করে।

দিব্যেন্দু হুট করে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

রুমার হাতে ফোন দেখে বলল, 'কী হল? কাকে ফোন করছিলে?'

রুমা বলল, 'কাউকে না।'

দিব্যেন্দু স্থির চোখে রুমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যথা হয়েছে পায়ে?'

রুমা ঘাড় নাড়ল। দিব্যেন্দু বসার ঘরে গিয়ে টিভি চালাল।

রুমা শ্বাস ছাড়ল। ফুলসজ্জার রাতে দিব্যেন্দু জিগ্যেস করেছিল, 'প্রেম করেছ কোনও দিন?'

রুমা মাথা নেড়ে 'না' বলেছিল।

দিব্যেন্দু খাটে শুয়ে চুল ঠিক করতে করতে বলেছিল, 'আমার ছিল। কেটে গেছে। খুব ভালোবাসত। শোন, প্রেম টেম নিয়ে এত চাপ নেবে না। ওগুলো পাস্ট লাইফ। অত চাপের তো কিছু নেই।'

রুমা বলেছিল, 'না, সত্যি নেই।'

দিব্যেন্দু স্থিরচোখে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমাদের আগে বন্ধু হওয়া দরকার। তাই না?'

রুমা তাও বলেনি। রাত কেটে গেল। পরের দিন দিব্যেন্দু কেমন মায়াভরা চোখে তার সঙ্গে কথা বলল। ভালো ভালো চকলেট এনে দিল। তিন চার দিন কেটে গেল। রুমার মনে হল সে খুব বড় কোনও অন্যায় করছে। তার এভাবে লুকিয়ে রাখা ঠিক হচ্ছে না। রাতে ক্রিম মাখতে মাখতে বলেছিল, 'একজন ছিল। কথা হত ফোনে। এটুকুই। আর কিছু না।'

দিব্যেন্দু খুশি গলায় বলল, 'এই তো। সব বলা উচিত। ঠিক করেছ।'

রুমা একটু একটু করে বলতে শুরু করল।

হাসি হাসি মুখ করে সব কথা শুনছিল দিব্যেন্দু।

তারপর রাত বাড়তেই শুরু হল অকথ্য অত্যাচার...

৩

'আদা কত? পঁয়ত্রিশ টাকা শ? কী বল?'

বলভদ্র দামটা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন। মাথাটা কেমন বন বন করছে। জিনিসের দাম যে হারে বাড়ছে, তাতে সামলানো যাচ্ছে না আর। গিন্নি বলল আদা আনতে, তিনিও হ্যাঁ-হ্যাঁ করে বেরিয়ে এলেন। দোকানে একটু আদা আর কাঁচালঙ্কা নেওয়ার পর বলছে পঞ্চাশ টাকা। প্রথমে ঠাহর করতে পারছিলেন না, দামটা কোনটার বেড়েছে। আদা, না কাঁচালঙ্কার। এবার পরিষ্কার হল।

টাকা মিটিয়ে পোস্ত কেনার আগে একবার জোরে দম নিয়ে নিলেন। এটা করতে হয়। পোস্ত কিনতে গেলেও বুকে একটা ধাক্কা লাগে। তবে পোস্ত বরাবরই মহার্ঘ্য। ভোটের আগে জনগণের দাম যেমন বেড়ে

যায় আদার মতো, পোস্তর ব্যাপারটা সেরকম নয়। পোস্ত সারাবছরই ঘ্যাম নিয়ে থাকে।

দিব্যেন্দুকে দোকানে দেখে মনটা ভালো হয়ে গেল বলভদ্রের। ভারি ভালো ছেলে। মিষ্টি ভাষী। সম্মান করে বড়দের। এরকম ছেলে দেখলে মন ভালো হবেই।

দিব্যেন্দু তাকে দেখে হাসল, 'ভালো তো দাদা?'

বলভদ্র বললেন, 'ভালো আর কী দেখলে হে? আদা সাড়ে তিনশো। ভাবো! এবার তো আদা পাদা লবনচাদা বলার আগেও টাকা দিতে হবে মনে হচ্ছে।'

কথাটা বলে একচোট হেসে নিলেন বলভদ্র। জমেছে জোকটা। লিখে রাখতে হবে। দিব্যেন্দু হাসল না। কেমন গুটিশুটি মেরে গেল।

বলভদ্র অপ্রস্তুত হলেন, 'আহা, তুমি আবার খারাপ ভাবলে নাকি?'

দিব্যেন্দু লাজুক গলায় বলল, 'না না দাদা। ঠিক আছে।'

জোকটা তার মতো লোকের হিসেবে অশ্লীল হয়ে গেছে বুঝে বলভদ্র মেক আপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন, 'আজ তো ছুটি?'

দিব্যেন্দু বলল, 'হ্যাঁ দাদা।'

বলভদ্র বললেন, 'তো আজ চলে এসো আমাদের বাড়ি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে যাও।'

দিব্যেন্দু অবাক হল, 'আজ?'

বলভদ্র বললেন, 'হ্যাঁ, চলে এসো। তোমার বউদি তো অনেক দিন ধরেই বলছিল। কী খাবে বল? খাসি না ইলিশ?'

দিব্যেন্দু আমতা আমতা করতে লাগল, 'আজ? মানে দাদা, আজ...'

বলভদ্র দিব্যেন্দুর হাত চেপে ধরলেন, 'ওসব কথা শুনবো না ভাই। আজকেই আসতে হবে। অনেক ডেট পিছিয়েছ। আর না।'

দিব্যেন্দু নিমরাজি হয়ে মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে দাদা। যাব।'

বলভদ্র খুশি হলেন, 'ঠিক আছে। এসো তবে। আমি মাছ আর মাংস নিয়েনি।'

পোস্ত নিয়ে বলভদ্র হন্তদন্ত হয়ে মাছ বাজারের দিকে রওনা হয়ে গিন্নিকে ফোন করলেন, 'হ্যাঁ, শোন, দিব্যেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। দুপুরে বলে দিয়েছি।'

গিন্নি শান্ত গলায় বলল, 'বাজার নেই কিছু নেই, এখন প্রায় দশটা বাজে।'

বলভদ্র বললেন, 'ও যা করবে তাই খেয়ে নেবে। দিব্যেন্দু ভারি ভালো ছেলে।'

ফোন কেটে বলভদ্র চোখ বন্ধ করে হিসেব করে নিলেন। যা টাকা আছে হয়ে যাবার কথা।

ঠিক আছে। যা হবে দেখা যাবে। কিনে নেওয়া যাক।

সাড়ে দশটা নাগাদ বাজার হল।

স্কুটির সামনে ব্যাগ ঝুলিয়ে বলভদ্র রওনা দিলেন। বৃষ্টির মধ্যেই রোদ উঠে গেছে। তাতে প্রবল গরম লাগছে। স্কুটি চালালে যদিও হাওয়া লাগায় গরম কম লাগে।

বাড়ির সামনে এসে স্কুটি রেখে আগে তালা খুললেন তিনি। সাধারণত কোথাও গেলে বাড়ির দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে দিয়ে যান।

দরজা খুলে আবার স্কুটির থেকে ব্যাগ নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে বললেন, 'এই নাও। করে ফেলো।'

গিন্নি বললেন, 'করছি।'

বলভদ্র বললেন, 'গলার কাছটা কিছু একটা দাও। দিব্যেন্দুর বউয়ের সামনে আবার গল্প করতে বসে যেও না দাগটা আমার সিগারেটের ছ্যাকায় হয়েছে।'

গিন্নি ঘাড় নাড়লেন।

বলভদ্র সিগারেট ধরালেন। দিব্যেন্দুকে দিয়ে একটা পলিসি করাতেই হবে। নইলে এ মাসের টার্গেট ফুলফিল হবে না। জীবনে কত জ্বালা!

৪

দিব্যেন্দু মিষ্টি নিয়ে এসেছে। বলভদ্র প্যাকেটটা নিয়ে বললেন, 'আরে, আবার এসবের কী দরকার ছিল? এসো এসো।'

রুমাকে নিয়ে দিব্যেন্দু ড্রইংরুমে ঢুকল।

বলভদ্র বললেন, 'বস।'

রুমা খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। বলভদ্র বললেন, 'বউমার কী হয়েছে?'

রুমা সসংকোচে বলল, 'চোট লেগেছে।'

দিব্যেন্দু বলল, 'খুব চিন্তায় আছি বুঝলেন দাদা, পা বেশ ফুলেছে। একজন ভালো ডাক্তার দেখাতে পারলে ভালো হত।'

বলভদ্রের স্ত্রী রুপালী ঘরে ঢুকেছিলেন। দিব্যেন্দুর কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। দিব্যেন্দু কত খেয়াল রাখে স্ত্রীর।

বলভদ্র বললেন, 'সরকারবাবুকে দেখিয়ে নাও। ভালো ডাক্তার। অনেক দিন ধরে প্র্যাকটিস করছেন।'

দিব্যেন্দু বলল, 'আজকেই দেখাচ্ছি।'

রুমা চুপ করে বসে রইল।

বলভদ্র তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বউমাকে নিয়ে ঘরে যাও।'

রুপালী রুমাকে নিয়ে তাদের বেডরুমে গেলেন। রুপালী বললেন, 'দিব্যেন্দু খুব খেয়াল রাখে তোমার?'

রুমা ঘাড় নাড়ল।

রুপালী গলা থেকে কাপড় সরালেন। রুমা সেটা দেখে বলল, 'এটা সিগারেটের ছ্যাকা। তাই না?'

রুপালী বললেন, 'ওই আর কী, লেগে গেছিল।'

রুমা বুকের কাপড় সরাল। ডান স্তনে গোল করে ছ্যাকার দাগ। রুপালী বড় বড় চোখ করে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। রুমা কাপড় ঠিক করে নিয়ে বসল। রুপালী বললেন, 'দেখে তো মনে হয় না!'

রুমা বলল, 'আপনার বরকে দেখেও মনে হয় না।'

রুপালী বললেন, 'কিছু ভেবেছ?'

রুমা বলল, 'একজন আছে। রোজ ফোন করি। একদিন ফোনে পাবো নিশ্চয়ই। সেদিনের অপেক্ষায় আছি।'

বলভদ্রের ডাক এল, 'ভাত বেড়ে দাও। দুটো বাজতে চলল।'

রুপালী শশব্যস্ত হয়ে বললেন, 'চল। দেরি করলে অন্য সমস্যা হবে।'

দিব্যেন্দু আর বলভদ্র টেবিলে বসেছে। রুপালী খাবার দিতে শুরু করলেন। বলভদ্র বললেন, 'তোমরা দুজনেই বসে যাও। আবার দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

রুমা বসল। বলভদ্র বললেন, 'দুই পরিবার মিলে কোথাও বেড়াতে যেতে হবে। কী বউমা, কোথায় যেতে ভালো লাগে তোমার? পাহাড় না সমুদ্র?'

রুমা থালায় আঁকিবুঁকি কাটছিল। বলভদ্রের প্রশ্ন শুনে বলল, 'সমুদ্র।'

বলভদ্র বললেন, 'বাঃ। খুব ভালো। বুঝলে দিব্যেন্দু, ছুটি ম্যানেজ কর। আমরা গোয়া ঘুরে আসব।'

দিব্যেন্দু বলল, 'সে তো অনেক খরচ দাদা।'

বলভদ্র বললেন, 'আরে সে লোক আছে আমার। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওসব নিয়ে ভেবো না। ডিসেম্বরেই ব্যবস্থা করছি। ওই সময়টা ওখানে কার্নিভাল হয়। পঁচিশে পৌঁছব, একবারে ইয়ার এন্ডিংটা কাটিয়ে ফেরা যাবে, কী বল?'

রুপালী ঠান্ডা গলায় বললেন, 'গোয়ায় শুনেছি পাবলিক প্লেসে স্মোক করলে খুব বড় অ্যামাউন্ট ফাইন করে। গোপাল ঠাকুরপোরা গেছিল, বলছিল।'

বলভদ্র বললেন, 'সে দেখা যাবে। হোটেলের রুমের ভেতর কে কী করছে, কে কী খাচ্ছে, সেটা তো আর দেখতে আসবে না। ওই মেটে কারিটা দাও তো।'

রুপালী মেটে কারি এগিয়ে দিলেন। বলভদ্র বললেন, 'আমার এই জিনিসটা দারুণ লাগে। আর ভালো লাগে মুরগির কচকচি। যেন ছেলেদের...' রুমার দিকে তাকিয়ে জিভ কাটলেন বলভদ্র।

দিব্যেন্দু চুপ করে খেয়ে যাচ্ছিল। বলভদ্র দিব্যেন্দুকে বললেন, 'মেটে কারিটা খাও ভাই, তোমার বউদি এটা খাসা রাঁধেন। খেয়ে বল।'

দিব্যেন্দু নিল।

খেতে আরও দশ মিনিট সময় লাগল। রুমাকে নিয়ে রুপালী ঘরে গেলেন। বলভদ্র সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'বুঝলে দিব্যেন্দু, একটা ইনসিউরেন্স এসেছে। ডেথ বেনিফিট প্রচুর টাকার। একবার দেখতে পারতে।'

দিব্যেন্দু বলভদ্রর কথা শেষ হবার আগেই বলল, 'হ্যাঁ, শুনছিলাম আপনি সেদিন কাউকে একটা বোঝাচ্ছিলেন। আমি যদি আমার বউয়ের নামে করি? ও তো চাকরি করে না।'

বলভদ্র বললেন, 'হ্যাঁ, করা যাবে। একটু কমপ্লিকেশন আছে। দেখেনি। করে নিও।'

দিব্যেন্দু বলল, 'আমার নামে তো পলিসি আছেই। ওর নামেও থাক।'

বলভদ্র খুশি মনে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। তুমি যে বউমার কথা এতো চিন্তা কর, সেটা খুবই ভালো।'

দিব্যেন্দু লাজুক হাসল।

৫

দুজনে বাড়ি ফেরার পর দিব্যেন্দু দরজা বন্ধ করে বেডরুমে গিয়ে রুমাকে ডাকল, 'এদিকে এসো।'

বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। আবহাওয়া বেশ ঠান্ডা হয়েছে। গরমের তেজটা নেই, ঘামটাও চলে গেছে।

রুমা দিব্যেন্দুর সামনে এসে দাঁড়াল।

দিব্যেন্দু বলল, 'গোয়া যাবে?'

রুমা বলল, 'তুমি গেলে যাব।'

দিব্যেন্দু বলল, 'কী বলছিল ওই মুটকিটা? বলভদ্রর বউকে কী বলেছ?'

রুমা বলল, 'বলিনি কিছু।'

দিব্যেন্দু রুমার ডান হাতটা ধরল। নিজের হাতের মধ্যে হাতটা নিয়ে খেলতে খেলতে বলল, 'গোয়া ভালো জায়গা। তোমাকে বিকিনি কিনে দেব। বিকিনি কিনে বিচে বসবে। সব লোক তোমার শরীর দেখবে। ভালো লাগবে, তাই না?'

রুমা বলল, 'তুমি না গেলে আমি যাব না।'

দিব্যেন্দু রুমার হাত মুচড়ে দিল, ‘যাবে না কেন? যাবে। ভালো লাগবে। রাতে বুড়োটাকে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দেব। আরও ভালো লাগবে।’

রুমা যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করল। কিন্তু কোনও শব্দ বেরোল না তার মুখ দিয়ে।

দিব্যেন্দু রুমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, ‘তোমার বাবা-মা আসবে কাল। ঘর-দোর পরিষ্কার রাখবে।’

রুমা কিছু বলল না।

দিব্যেন্দু জানলার পর্দা সরিয়ে বৃষ্টি দেখতে শুরু করল। ভালো লাগে বৃষ্টি দেখতে। মফস্‌সলে গাছপালা বেশি। অফিসে থাকলে বৃষ্টি দেখাও যায় না।

রুমা ঠাকুর ঘরে গেল। ফোনটা বের করে আবার নাম্বারটা ডায়াল করল। প্রত্যুষের ফোন যে সুইচড অফ, তিনটে ভাষায় শুনিয়ে দিল।

পায়ে যন্ত্রণা ছিল। দিব্যেন্দু হাত মুচড়ে দেওয়ার পর পায়ের যন্ত্রণাটা কম লাগছে। হাতের ব্যথাটা অনেক বেশি মনে হচ্ছে। পলা বলেছিল কাপড়ের উপর দিয়ে মারলে কম লাগে। হাত মুচড়ালে কাপড় দিয়ে কী হবে?

একটা ভিডিও দেখেছিল আফগানিস্তানের। বোরখার উপর দিয়ে মারছে। বোরখা পরে ছিল বলে কি মারটা কম লেগেছে? তা তো হবে না। ঠিকই লেগেছে। ভিডিওটা দিব্যেন্দুই পাঠিয়েছিল। পাঠিয়ে লিখেছিল ‘দেখো তুমি কত ভালো আছ। এসব জায়গায় মেয়েদের অনেক বেশি মারা হয়।’

একটা মেয়েকে পশ্চিমী পোশাক পরেছিল বলে গুলি করে মারা হয়েছিল। এগুলো পরা ঠিক না। দিব্যেন্দু বলেছিল অনেক ভালো রাখা হয় তাকে।

‘শোন।’

দিব্যেন্দু ডাকছে আবার।

তাড়াতাড়ি উঠল রুমা। বেশি দেরি করলে সমস্যা বাড়বে।

দিব্যেন্দু শুয়ে আছে।

সে ঘরে ঢুকতে বলল, ‘আমার চাকরিটা চলে যেতে পারে। সেরকম হলে তোমাকে রোজগার করতে হবে। কী পারবে? লোকের সঙ্গে শুতে পারবে? তাহলে তো দারুণ ব্যাপার হবে। আনন্দে আনন্দে টাকা আসবে।’

রুমা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই কথাটার মানে কী? তাকে পরীক্ষা করছে?

সে বলল, ‘চাকরি চলে যাবে কেন?’

দিব্যেন্দু বলল, ‘আছে অনেক ব্যাপার। কোম্পানির অবস্থা ভালো না। লোক ছাটাই চলছে। বিরাট কেচ্ছা।’

রুমা কিছু বলল না।

দিব্যেন্দু বলল, ‘সারাদিন ঘরে থাকব তখন। ভালো হবে। তাই না?’

রুমা মাথা নেড়ে ‘হু’ বলল।

দিব্যেন্দু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল, ‘হু? মানে খুশি হওনি তাই না? খুশি হওনি?’

রুমা বলল, ‘হয়েছি।’

দিব্যেন্দু খাট থেকে নেমে রুমার থুতনি ধরে বলল, ‘তাহলে হাসছ না কেন? হাসো। হাসো। হাসো বলছি।’

রুমা হাসার চেষ্টা করল।

দিব্যেন্দু বলল, ‘খুশি তো কম হবেই। আমি গেলেই তো সে ছেলেটা আসে।’

রুমা বলল, ‘আসে না। তুমি তো সিসিটিভি লাগিয়েছ। দেখতে পাও না?’

দিব্যেন্দু লাল চোখে বলল, 'ঠিক দেখতে পাই। আমার চোখে ফাঁকি দিয়ে অভিসারে যাওয়া তো? একদিন ঠিক ধরা পড়বে। তারপর পুঁতে রাখব। এই ঘরের মধ্যেই পুঁতে রাখব।'

রুমা আবার চুপ করে গেল।

দিব্যেন্দু রুমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'বাপকে জিগ্যেস কর কী খাবে, মাছ না মাংস।'

রুমা বলল, 'রাতে করব।'

দিব্যেন্দু বলল, 'করে রাখ। আমাকে কিনতে যেতে হবে তো।'

রুমার বলল, 'করছি।'

দিব্যেন্দু খাটে এসে শুল। কাল অফিসের ছাঁটাইয়ের লিস্ট বেরোনোর কথা। তার নাম থাকার সম্ভাবনা আছে।

সে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং রেখে পা দোলাতে শুরু করল।

৬

'ক'টাকা ভাই?'

সিম লাগছে নতুন ফোনে। বাপ্পার দোকান। বাপ্পার মেজাজ সবসময় তিরিক্ষি হয়ে থাকে।

পূর্ণ যে প্রশ্নটা জিগ্যেস করল, বাপ্পা কোনও উত্তরই দিল না। মন দিয়ে সিম লাগিয়ে স্ক্রিন মুছতে শুরু করে দিল।

পূর্ণ বলল, 'কী রে বাপ্পা? টাকা নিবি না?'

বাপ্পা হাই তুলল, 'সাত হাজার পাঁচশো। কিছুক্ষণ পর সিম চালু হবে। তখন ফোন করতে পারবে।'

পূর্ণ পকেট থেকে টাকা বের করে শো কেসের উপর নামিয়ে রেখে বলল, 'গুনে নে।'

বাপ্পা টাকা গুনছে। থুতু দিয়ে দিয়ে টাকা গুনছে। একবার গুনল।

এবার উল্টো করে গুনছে। পূর্ণ বলল, 'কতবার গুনবি রে?'

'ঠিক আছে ঠিক আছে। যাও এবার।'

পূর্ণ বলল, 'দেখাবি না, কী করে ফোন চালায়? আমি কি অত জানি?'

বাপ্পা বলল, 'ফোন ধরতে আর কাটতে জানো তো, তাহলেই হবে। এখন কেটে পড় তো। অনেক কাজ আছে আমার।'

পূর্ণ বলল, 'পানু লোড করলি ভাই?'

বাপ্পা বলল, 'পুলিশ ধরতে পারলে তোমায় হুড়কো দিয়ে দেবে। পানু ফানু নিষেধ এখন।'

পূর্ণ অবাক হল, 'বলিস কী? পানু দেখলে বুঝে যাবে?'

বাপ্পা বলল, 'হ্যাঁ। ফোন থেকে হাত বেরিয়ে কান ধরে থানায় নিয়ে যাবে।'

পূর্ণ একগাল হেসে বলল, 'যাহ্‌। ইয়ার্কি মারিস না।'

বাপ্পা বলল, 'ওই দেখো। ইয়ার্কি মারব কেন? সত্যি কথা।'

পূর্ণ বলল, 'এই ফোন থেকে হাত বেরিয়ে আসবে? কোথায়, হাত কোথায় আছে?'

বাপ্পা বলল, 'ও ঠিক আছে। তুমি এখন বুঝবে না, পানু দেখলেই বেরিয়ে আসবে। এটাই এখন স্লোগান। না পানু দেখুঙ্গা, না দেখনে দুঙ্গা।'

পূর্ণ মাথা চুলকিয়ে দোকান থেকে বেরোল। হাতে ব্যাগ। নতুন ঝাঁ চকচকে ফোন।

ফোন কেনার টাকা দিয়েছে বাপিদা। বাপিদার বাড়ি দেখভাল করতে হবে। বাপিদা জার্মানিতে থাকে। এর আগের কেয়ারটেকার পালানোর পরে পূর্ণকে রাখা হয়েছে। পূর্ণর একটাই কাজ। সারাদিন বাপিদার বাড়িতে থাকা। এই ফোনে ভিডিও কল করে বাপিদা আপডেট নেবে বলেছে। যখন ফোন করবে তখনই ধরতে হবে। নইলে চাকরি নট। আগের কেয়ারটেকার ছেলেটা একটা জিনিস ছিল। মাঝে মাঝেই রাতে বাড়িতে বাইরের ছেলেপিলে নিয়ে এসে মধুচক্রের আসর বসাত। পুলিশ রেইড হবার দিন ছেলেটা পালাল।

পাড়ার কেষ্টু-বিষ্টুদের ফোন করে বাপিদা পূর্ণকে রিক্রুট করেছে। বেশ বড় বাড়ি।

পূর্ণ বাড়ির ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরে ঢুকে সোফায় বসল। খুব বেশিদিন এই স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। বাপিদা বলে দিয়েছে, ঘরে বাইরে সিসিটিভি বসবে। সব জার্মানি থেকে দেখবে। পূর্ণ খি-খি করে হাসল। আগে ক্যামেরা লাগানো থাকলেই ভালো হতো। তাহলে ঘরে মধুচক্র চলত আর জার্মানি থেকে বাপিদা দেখত। ভারি মজা। যারা পানু বন্ধ করে দিয়েছে, তারা কি আর এটা বন্ধ করতে পারত? দিব্বি জমে যেত তাহলে।

ফোনটা বেজে উঠল। ইরিব্বাস, এখনও তো বাপিদাকে নাম্বার দেওয়া হয়নি, নাম্বার পেয়ে গেল নাকি? কী সর্বনাশ!

সে তাড়াতাড়ি ফোন ধরল, ‘হ্যালো...বাপিদা?’

ওপ্রান্ত থেকে মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল, ‘প্রত্যুষদা, আমি...উফ্, এতদিন পরে তুমি ফোন অন করেছ?’

পূর্ণ বলল, ‘জার্মানিতে ঠান্ডা কেমন গো?’ এই কথাটা জিগ্যেস করবে আগে থেকেই ভেবে নিয়েছিল পূর্ণ। এবারের শীতেই তার সব কিছু জমে গেছিল, জার্মানিতে নাকি হেবি শীত। ওখানে কী করে টিকে থাকছে বাঙালির ছেলে বাপিদা, এটাই তো লাখ টাকার প্রশ্ন।’

‘কে? প্রত্যুষদা? শুনতে পাচ্ছ? আমি রুমা।’

পূর্ণ অবাক চোখে ফোনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘রুমা? সেটা কে রে বাপ?’

‘প্রত্যুষদা, আমার ভারি বিপদ, আমায় বাঁচাও। যেভাবেই হোক, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। প্লিজ, আমি তোমার পায়ে পড়ি। আমার বর আমায় মেরে ফেলবে।’

পূর্ণ ভিরমি খেল। মেরে ফেলবে? বলে কী করে? বলল, ‘কে? কে বলছেন? আমি পুন্ন বলছি।’

‘একী! এটা তো প্রত্যুষদার নাম্বার? কে আপনি?’

‘ইল্লি আর কী? টাকা দিয়ে ফোন কিনলাম, টাকা দিয়ে সিম কিনলাম, উনি বলতে এয়েচেন এটা আমার ফোন না। তোর বাপের ফোন নাকি রে?’

‘আপনি প্রত্যুষদা না? নাকি ওর ফোন চুরি করেছেন?’

‘তোর বাপ চোর হারামজাদি। কারে কী বলিস তুই?’

‘আপনি প্রত্যুষদা নন?’

‘তোর বাপ প্রত্যুষ।’

ফোনটা কেটে গেল। পূর্ণ রাগী চোখে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকল। এ কী রে? প্রথম দিন থেকেই এসব ঝামেলা শুরু হয়ে গেল?

৭

শেয়ালদায় ট্রেন পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে দৌড় শুরু হয়ে যায়। সবাই দৌড়চ্ছে। সমগ্র ভিড়টার একটাই লক্ষ্য। যেভাবে হোক স্টেশন চত্বর থেকে দৌড়তে হবে। ট্রেন থেকে নেমে ব্যাগটা বুকে নিয়ে রোজের

মতোই দৌড় শুরু করল দিব্যেন্দু।

পার্থক্য একটাই। আজ বুক ধুকপুকুনি অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটা বেশি। চাকরিটা চলে যেতে পারে আজ।

এটা গেলে বিকল্প কিছু একটা করতে হবে। কী করতে হবে মাথায় এখনও আসেনি। আসবে নিশ্চয়ই। প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান আছে। এই সমস্যারও কিছু না কিছু সমাধান একটা থাকবেই। চাকরি গেলে অনেকের বড় সমস্যা হবে। পালদার যেমন। পালদার আর দশ বছর চাকরি আছে। বড় সংসার। সামনে আবার মেয়ের বিয়ে।

ভিড়টা বাজার পেরোচ্ছে। তাদের সঙ্গে দিব্যেন্দুও। রোদ উঠেছে। মেঘ কোথায় যেন উবে গেছে। এই সময় রোদ, মানে গরম অনেক বেশি লাগবে। দিব্যেন্দুর ঘাম বেশি হচ্ছে। সে জোর পায়ে রাস্তার কাছে এসে পার হল। এবার হাঁটা। রাস্তা ঘাট, দোকান বাজার সব পেরিয়ে সে জোর পায়ে হেঁটে অফিসে এলো।

থমথম করছে চারপাশ। পালদা জল খাচ্ছে। দিব্যেন্দু সিটে বসে বলল, 'লিস্ট বেরিয়েছে?'

পালদা বলল, 'ওই তো, দেখো না। মিটিঙে ঢুকেছে সব। আজকেই জানিয়ে দেবে। উফ। আমার শরীর খারাপ লাগছে।'

দিব্যেন্দু অন্যদিকে তাকাল। রঘু সামন্ত টেবিলে মাথা রেখে বসে আছে। অমর বাগদীর মুখ শুকনো।

মিটিং শেষ হয়ে গেছে। সাহেবরা সব নিজেদের চেম্বারে সেঁধিয়ে গেলেন।

'দিব্যেন্দু রায়। স্যার ডাকছেন।'

পিওন ডেকে গেল। দিব্যেন্দু দুরুদুরু বুকে সাহেবের চেম্বারে প্রবেশ করল।

'বোসো রায়।' সাহেব কম্পিউটার মনিটরের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন।

দিব্যেন্দু বসল। সাহেব তার দিকে তাকালেন, 'রায়।'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তোমাকে যদি বলা হয় একজন নন পারফর্মিং স্টাফকে বাদ দিতে, তুমি কাকে বাদ দেবে?'

দিব্যেন্দু সাহেবের দিকে তাকাল। সাহেব কেমন অন্যমনস্কভাবে প্রশ্নটা করলেন। উত্তরে কী বলবে সে? সাহেব কি তার নামই শুনতে চাইছেন?

সে গলা খাকড়িয়ে বলল, 'স্যার আপনি কি আমার মুখ থেকে আমারই...'

'যেটা প্রশ্ন করছি, শুধু সেটার উত্তর দেবে। নন পারফর্মিং স্টাফ। একজনের নাম বল।'

দিব্যেন্দু সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পালদা স্যার।'

'কেন?'

'ওর বয়স হয়েছে। চাপ নিতে পারছেন না, বোঝা যাচ্ছে।'

'গুড।'

সাহেব মাথা দোলালেন। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, 'ম্যানেজমেন্ট লোক কমাতে চায় রায়। আবার কয়েকজনকে প্রমোশনও দিতে চায়।'

দিব্যেন্দু বলল, 'আমাকে কি বাদ দিচ্ছেন স্যার?'

সাহেব বললেন, 'তোমার কি মনে হয় আমি এখানে বিগবসের ভোটাভুটি করতে এসেছি? তোমার থেকে একজনের নাম নেবো, আরেকজনের থেকে তোমার নাম নেবো, সারাদিন এই করে যাব?'

দিব্যেন্দু বলল, 'না মানে স্যার...সেটা ভাবিনি...'

সাহেব বললেন, 'অ্যাকচুয়ালি এটা ভেবে থাকলে ঠিকই ভেবেছ। আমি এভাবেই করতে চাই। দেখছিলাম বিগবসের ফরম্যাটটা। চমৎকার ফরম্যাট। লোক কমাতে বলছে, লোক কমানোর কাজ, একটা মজা করে তো কমানোই যায়, কী বল?'

দিব্যেন্দু মাথা নিচু করল। সাহেব বললেন, 'তোমার কি রাগ হচ্ছে?'
দিব্যেন্দু বলল, 'না স্যার। রাগ হচ্ছে না।'
সাহেব বললেন, 'তাহলে তোমার ভোট পালবাবুর দিকে। তাই তো?'
দিব্যেন্দু মাথা তুলল, 'হ্যাঁ স্যার।'
সাহেব পেপারওয়েট নিয়ে খেলতে খেলতে বললেন, 'স্কুল টিচারে অ্যাপ্লাই করনি?'
দিব্যেন্দু বলল, 'না।'
সাহেব বললেন, 'আমার শালা পেয়েছে। শালা বলে কথা, টাকা দিতেই হল। আমি দিয়েছিলাম। এখন বলছে চাকরি থাকবে না। তোমাদের মতোই ব্যাপার, তাই না?'
দিব্যেন্দু চুপ করে রইল।
সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি যাও। পালবাবুকে পাঠিয়ে দাও। দেখি কাকে ভোট দেন।'
দিব্যেন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে পালবাবুকে পাঠিয়ে দিল। এভাবে এক এক করে সবাইকেই ডাকলেন সাহেব।
দুপুর একটা নাগাদ দিব্যেন্দু জানতে পারল তাকে একজনও ভোট দেয়নি। তার চাকরিটা থাকবে।
পালবাবুর চাকরিটাই গেল। সব থেকে বেশি ভোট পেয়েছেন পালবাবু।
খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পালবাবু বুকে হাত দিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন।
দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়েছে।
পালবাবুর টেবিলটা সুন্দর। বেশ ভালো লাগে তার।
দিব্যেন্দু তার ব্যাগটা পালবাবুর টেবিলের উপর রাখল। এর পর থেকে এটায় বসবে সে।

৮

কাতলা, ভেটকি, ইলিশ, চিতল।
রুমার বাবা মাছ খেতে ভালোবাসেন বলে দিব্যেন্দু চার রকম মাছ নিয়ে এসেছিল।
রুমার মা সেটা দেখে বললেন, 'দেখেছ? জামাইটা এতো ভালো। এই জন্যই তো আমি সব সময় বলি, তোদের মধ্যে যদি কোনও ঝামেলা হয়, আমি সব সময় জামাইয়ের দিকে থাকব। কপাল করলে এমন ছেলে পাওয়া যায়।'
রুমা আলু কাটছিল। কিছু বলল না। রুমার বাবা টিভি দেখছেন।
রুমার মা বললেন, 'একবছর তো হল। জামাইয়ের বাড়ির লোকেরা কিছু বলে না? বাচ্চা কাচ্চা নেওয়ার ব্যাপারে?'
রুমা মাথা না তুলে বলল, 'চুপ করো না মা। তুমি বাবার সঙ্গে টিভি দেখো গিয়ে।'
রুমার মা বললেন, 'কেন রে? কী হয়েছে? ঠিক করে জামাইয়ের দেখাশোনা করিস তো? ঝগড়া করেছিস নাকি?'
রুমা কেঁদে ফেলল। মা ভীত গলায় বললেন, 'কী হয়েছে?'
রুমা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ও খুব মারে মা।'
মা সঙ্গে সঙ্গে রুমার কাছে এসে গলা নামিয়ে বললেন, 'আস্তে বল। বাবা শুনতে পাবে। পাঁচ হাজার টাকা পেনশন পায়। এখনও ছোটটার বিয়ে দেওয়া বাকি। তোর কথা শুনলে তোকে নিয়ে চলে যাবে।'
রুমা বলল, 'তাই নিয়ে যাও না। আমি না হয় কিছু একটা করে নেবো।'

মা রেগে গেলেন, 'কী করবি তুই? কী জানিস তুই? চাকরি করবি? চাকরি আছে? রাস্তায় নামিয়ে দেবে। আর ছেলেরা ওরকম সবাই গায়ে হাত তোলে। তুই কি ভাবিস তোর ওই দেবতুল্য বাবা কোনদিন গায়ে হাত তোলেনি? হুহ্, কতবার মেরেছে আমায়। ও সব প্রথম প্রথম হয়। পুরুষ মানুষ শুরুতে একটু গরম দেখাবে। তারপর দেখবি ধীরে ধীরে ঠান্ডা হবে। বউ ছাড়া চলবে না। তোর বাবাকে দেখিস না? আমাকে ছাড়া এখন কোথাও যাবে?'

রুমা আবার আলু কাটতে শুরু করল, 'জানতাম তুমি এটাই বলবে। যেদিন আমি মরে যাব, সেদিন তোমাদের বুক জুড়াবে।'

রুমার মা বললেন, 'কিচ্ছু হবে না। মেয়েদের বেড়ালের প্রাণ। ও দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। তোকেই তো মারে। তাও ঘরের ভেতরে। বাড়ির বাইরে গিয়ে কোনদিন লোকের সামনে বাজে ব্যবহার করেছে কি? করবে না। আমাদের জামাই সে ছেলেই না। কত সম্মান করে। এই তো, আমি তো শুনলাম অফিসে নাকি ওর ভালো অবস্থা না। তাও দেখ কত বাজার করে দিয়ে গেছে। সম্মান না করলে কি ওসব হয়?'

রুমা ঠান্ডা গলায় বলল, 'ও সব লোক দেখানো।'

রুমার মা রেগে গেলেন, 'ওরে মুখপুড়ি, তুই কারো পাল্লায় পড়েছিস নাকি বল তো? আমাদের মুখে চুনকালি দিবি নাকি? শোন রুমা, আমি কিন্তু ভালোর ভালো, খারাপের খারাপ। এত বড় বাড়িতে থাকিস। ছেলের বাবা-মা নেই। গোটা বাড়িতে শাসন করিস। এখন যদি আবার ওই ছোঁড়াটাকে এখানে জুটিয়ে এনে কোনও ঝামেলা করতে দেখেছি, তাহলে তোর কপালে অশেষ দুঃখ আছে।'

রুমা বলল, 'ঠিক আছে। তুমি টিভি দেখো। তোমাকে অত ভাবতে হবে না। আমার এই পা দেখেছ? হাতুড়ি দিয়ে মেরেছে।'

রুমার মা বললেন, 'হাতুড়ি দিয়ে মারেনি। অন্য কোনভাবে চোট পেয়েছিস। এখন আমার কাছে গল্প দিচ্ছিস। তোর ধান্দা তো আমি জানি। তোকে পেটে ধরেছি, আমি জানবো না তুই কী চাস? তুই ওই আগের রসটা ভুলতে পারিসনি। বাড়ি যাবি সব সর্বনাশ করে, তারপর ওই ছেলেটার সঙ্গে পালাবি, তাই না? এই তো তোর প্ল্যান? আমি তো জানি। শুরু থেকেই তুই এই প্ল্যান করেই চলছিস। আজকের তো গল্প না এটা। সেই কবেকার গল্প।'

রুমা ক্লান্তচোখে মা-র দিকে তাকিয়ে বলল, 'গল্প দিচ্ছি? এটা হাতুড়িতে মারা, বুঝতে পারছ না তুমি?'

রুমার মা বললেন, 'না। কোনভাবেই হাতুড়িতে মারা না। তুই মিথ্যে কথা বলছিস। সোনার টুকরো ছেলেটার নামে কলঙ্ক দিচ্ছিস। আমি তো সব জানি। স্কুলের পেছনের মাঠে সন্ধেবেলায় তোকে ওই হারামজাদাটার সঙ্গে আমিই তো ধরেছিলাম। তুই তার শোধ নিচ্ছিস।'

রুমা কিছু বলল না আর। চুপ করে রইল।

৯

বাড়ি-ঘর শখের জিনিস। সবার কি আর সে ভাগ্য হয়? কেউ অনেক টাকা রোজগার করে দামি বাড়ি বানিয়েও শান্তিতে থাকতে পারে না। কেউ কম টাকা রোজগার করে ভাড়ার ঝুপড়িতে থেকেও সুখী।

বাপিদা কোন ক্যাটাগরিতে পড়বে, সেটাই ভাবে পূর্ণ। জার্মানিতে তো ভালোই থাকে। আর হয়তো এ জন্মে এ দেশে ফিরবে না। একটা বিলিতি মেম বিয়ে করবে। সে মেম কাগজ দিয়ে পেছন মুছবে।

এমন লোক এ দেশে বাড়ি করে থাকতে তো পারবে না। তাহলে সুখটা কীসে? বাড়ি বানানোর সুখ? টাকা থাকলে মানুষ কত কিছু করতে পারে। বাথরুমে আবার কাচের ঘর আছে। সিনেমায় যেমন দেখায়।

কাচের ঘরের ভেতর ল্যাংটা হয়ে চান করবে পাবলিক। পূর্ণ প্রথম দিনই স্নান করে দেখে নিয়েছে। গরম ঠান্ডা জিনিসটা সড়গড় হয়নি বলে ঝামেলা হয়ে গেছে। প্রথমে ঠান্ডা জলে দিব্যি শাওয়ার ছেড়ে স্নান করছিল সে। কখন গরম জলের নল চালিয়ে দিয়েছিল। গা হাত পা যেন পুড়ে গেল। 'ওরে বাবা রে মারে' বলে বেরিয়ে এসেছে কোনও রকমে।

বড় লোকেদের এই সমস্যা নেই। তারা জানে কোন কল দিয়ে ঠান্ডা জল বেরোবে, কোনটা দিয়ে গরম বেরোবে। পূর্ণ তো আর জানে না। চিড়বিড়ে গরম আগুন জলে স্নান করার কোনও মানে হয়?

যাই হোক, পূর্ণর সারাদিনে তেমন কাজ নেই। বাপিদার বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখে। দোতলা বাড়ি। অনেক কায়দা করে করা। সব ঘর তালা দেওয়া। বসার ঘর বাদে। তালা চাবি তার কাছেই থাকে। সব ঘরেই তালা খুলে খুলে দেখে পূর্ণ। ফ্যান চালিয়ে নরম বিছানায় ছাদের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে। এত সুখ কি সইবে? সইবে না। তার পোড়া কপালে এত সুখ বেশিদিন সইবে না, পূর্ণ ঠিকই বোঝে।

বাপিদা পড়াশুনায় বিরাট কিছু ভালো ছিল না। হঠাৎ করেই চাকরি পেয়ে চলে গেল। তারপর এসব অশৈলী কাণ্ডকারখানা হল। এত বড় বাড়ি করল। পাড়ার সবাই দেখল। বাইরে গেলেই নাকি টাকা। এ পোড়া দেশে টাকা কোথায়? টাকার নামগন্ধ নেই। শুধু ঝামেলা। পূর্ণ ক'টা দিন টোটো চালিয়ে দেখেছে। অনেক ঝামেলা। লাইনে সবাই টোটো চালায়। এলাকায় চড়ার লোকের থেকে এখন চালানোর লোক বেশি। শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই হয় টোটো চালায়, নয় খাবার ডেলিভারি দেয়। তার থেকে বাপিদার চাকরিটাই ভালো। দিব্যি চাকরি। এক বছর এ বাড়িতে টিকে গেলে কি বাপিদা তাড়িয়ে দেবে? সামনে থাকলে তো পায়ে পড়ে যেত! নাহ, এসব নিয়ে বেশি ভাববে না সে।

তিনতলায় একটা ছোট ঠাকুর ঘর আছে। পূর্ণ ঠাকুরঘরের তালাও খুলল।

বড় লোকদের লক্ষ্মী ঠাকুর? এই ঠাকুর কি তার ঘরে থাকেন না? বাপিদাদের জন্য কি আলাদা ঠাকুর আছে? কে জানে!

ভারি মিষ্টি মুখখানা। পূর্ণ কিছুক্ষণ ঠাকুরের সামনে বসে থাকল। ভালো লাগে তার। তাও তো কারো সামনে ভক্তিভরে বসে থাকা যায়। বাপিদার কঠিন নির্দেশ আছে এ বাড়িতে কাউকে ঢোকানো যাবে না। একা থাকতে হবে তাকে। প্রণাম সেরে পূর্ণ উঠতে গিয়ে দেখল ঠাকুর আসনের পাশে স্টিলের আলমারি রাখা। কী আছে এতে? চাবির থোকা থেকে চাবি বের করে চেষ্টা শুরু করল। না। একটাতেও খুলছে না।

ঠাকুর ঘরের বাসনকোসনই থাকবে। ধুস, অত দেখার কী আছে? তারও আজকাল সব কিছুতে বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে।

চাবিগুলো আবার পকেটে নিয়ে ঠাকুরঘর থেকে বেরোতে গিয়ে চোখ পড়ল আসনের ড্রয়ার আছে। ঠিক তো। এটা চোখে পড়েনি।

সে বসল। ড্রয়ার ঘাঁটতে ড্রয়ারের ভেতরেই আরেকটা গোপন কুঠুরি খুঁজে পেল। অন্য কেউ হলে পেতো না। পূর্ণ পেল। কিছুদিন একটা ফার্নিচারের দোকানে কাজ করেছিল।

ওই কুঠুরি খুলতেই আলমারির চাবি পাওয়া গেল।

পূর্ণ থম মেরে কিছুক্ষণ বসে রইল। পরের বাড়ি তাকে দেখাশুনা করতে দিয়ে গেছে, বিশ্বাস করেই তো। এটা কি ধর্মে সইবে?

পরমুহূর্তে মনে হল, দেখতে কী হয়? দেখে শুনে আবার না হয় যেখানকার চাবি সেখানে রেখে দেবে?

দ্বিতীয় যুক্তিটা জিতে গেল। কিন্তু তাতেও বাধা এসে গেল। চাবিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে যেতেই ফোনটা আবার বাজতে শুরু করল।

'ধুত্তোর' বলে ফোন ধরল সে, 'হ্যালো।'

'হ্যালো, প্রত্যুষদা...হ্যালো...প্লিজ শোন। আমি জানি এটা তুমিই। আমাকে বাঁচাও। আমাকে মেরে ফেলবে। বিশ্বাস কর, আমি বাঁচব না। ও আমাকে মেরে ফেলবে। আমার মাকে তো তুমি চেনো বল। আমি মেয়ে তো, মেয়ে সন্তানদের বিন্দুমাত্র দাম নেই, শুনতে পাচ্ছো?'

'আরে আপনাকে বললাম না, এটা নতুন নাম্বার! কী আজে বাজে ফোন করে যাচ্ছেন বলুন তো?'

'আপনি ফোন চুরি করেছেন। তাই না? প্রত্যুষদার ফোনটা আপনি চুরি করেছেন।'

'তুই চোর। তোর বাপ চোর। তোর চোদ্দ গুষ্টি চোর।'

পূর্ণ চিৎকার করে উঠল।

'শুনুন না, আমার ভারি বিপদ, যার ফোন, তাকে একটু দেখুন না দেওয়া যায় নাকি?'

'কারো ফোন না। এটা আমার ফোন।'

'আপনার ফোন? তা কী করে হয়? এটা কোথায়?'

'এটা তোমার মুন্ডু।' রেগেমেগে ফোন কেটে চাবিটা আবার ড্রয়ারেই রেখে দিল পূর্ণ। কাজে যখন বাধা এসেছে, তখন সে কাজ না করাই ভালো।

১০

কামরায় উঠে দিব্যেন্দু দেখল তাপস মুখ চুন করে বসে আছে। কামরুল শাফল করছে।

দিব্যেন্দু বলল, 'কী হল তোমার? মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেউ পেছন ভিজিয়ে চলে গেছে।'

তাপস রেগে গিয়ে বলল, 'ওরে বাঙাল, আমার কী হয়েছে, সেটা বললে তুই বুঝবি? তোর সে বুদ্ধি আছে?'

দিব্যেন্দু বলল, 'বোলো না। কে বলতে বলেছে?'

কামরুল বলল, 'দাদার পকেটে পঞ্চাশটাকা ছিল। কে ভিড়ের মধ্যে তুলে নিয়েছে।'

দিব্যেন্দু বলল, 'চিনি কেনার টাকা নাকি? মাংসে দিতে?'

তাপস জ্বলন্ত চোখে দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিনি কতটা সায়েন্টিফিক জানিস? রান্নায় মাপমত দিলে চিনি অনেক কাজে দেয়।'

দিব্যেন্দু বলল, 'হাফ চামচটাকে মাপ মতো বলে। চার কাপকে না।'

তাপস বলল, 'কী রে বাঙাল, আজ এত বুলি ফুটছে কেন? সুখবর আছে নাকি? বউ কি বাচ্চা বিয়োবে?'

দিব্যেন্দু দাঁত বের করল, 'প্রমোশন হয়েছে।'

কামরুল বলল, 'মিষ্টি ছাড়া চলে এলে? খাওয়াবে না?'

তাপস বলল, 'সেই তো! বাঙালরা তো আমাদের মতো কিপটে হয় না। তুই মিষ্টি আনলি না?'

ট্রেন ছেড়েছে। অন্য সিটে যারা তাস খেলছিল, তারাও দিব্যেন্দুর খবরটা শুনে হই হই করে উঠল। শোনপাপড়ি উঠেছিল। তাই খাওয়াতে হল।

তাপস ফিসফিসিয়ে বলল, 'আজ যা ওয়েদার আছে, তার উপর এই সুখবর, বাঙাল আজ বাড়িতে কাঁটাতার পার করে দেবে।'

বিচ্ছিরিভাবে হাসল তাপস।

দিব্যেন্দু তাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যারা নিজেরা পারে না, তারা লোকের কাজকর্ম নিয়ে ফ্যান্টাসাইজ করে। চিনি খেয়ে খেয়ে তোমার শক্ত হয় না।'

তাপস রেগে গেল, 'বার বার চিনিকে অ্যাটাক করবি না।'

দিব্যেন্দু বলল, 'তুমি যখন অ্যাটাক কর, তখন কোনটা ছেড়ে দাও?'

তাপস সুর করে বলল, 'ওরে বাঙাল, বুঝেছি। প্রমোশনের গরম মাড়াচ্ছিস তাই না? কত মাইনে বেড়েছে তোর?'

দিব্যেন্দু গোটা রাস্তা ফিক ফিক করে হাসতে থাকল। অন্যান্যদিন তাপস গরম নেয়। আজ কিছুতেই আপার হ্যান্ড নিতে পারল না। স্টেশন নেমেই অবশ্য বেগ পেয়ে গেল। ঝড়ের গতিতে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি এসে শ্বশুরের সামনেই জামা প্যান্ট খুলে বাথরুমে ঢুকে গেল।

রুমা চা বসাল। রুমার মা ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'ছেলেটা এতটা রাস্তা তেতেপুড়ে এলো, কিছু খেতে দিবি না?'

রুমা ঠান্ডা গলায় বলল, 'মুড়ি দেব একটু পরে। ভেবো না। ও ঠিকই চেয়ে খেতে পারে।'

মা রেগে গেল, 'এই জন্যই তো এত ঝামেলা হয়। কখন কোনটা দরকার বুঝিস না? তোকেই তো দেখতে হবে।'

রুমা বলল, 'কেন? খিদমৎ খাটার জন্য বিয়ে দিয়েছো নাকি?'

মা বলল, 'শোন রুমা, যদি তুই এরকম চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলিস, আমি কিন্তু জামাইকে বলে দেব তুই মাঠে প্রত্যুষের সঙ্গে কী করছিলিস। বলব দেখবি?'

রুমা বলল, 'বলে দাও। গলা নামিয়ে কথা বলছ কেন? গলা তুলেই বল। তোমরা সবাই মিলে আমাকে একবারে ফ্যানের সঙ্গেই ঝুলিয়ে দাও না, তাহলেই তো বেঁচে যাই।'

মা রাগী চোখে তার দিকে তাকিয়ে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দিব্যেন্দু বাথরুম থেকে স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে বেরিয়ে ঘরে গিয়ে রুমাকে ডাকল। 'এদিকে এসো।'

রুমা ভাবলেশহীন মুখে বেডরুমে ঢুকল।

দিব্যেন্দু বলল, 'দরজা বন্ধ কর।'

রুমা বলল, 'বাবা-মা আছে। এখন বন্ধ করলে খারাপ দেখাবে।'

দিব্যেন্দু বলল, 'খারাপ দেখাবে কেন? খাট কিনে দিয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ি, ওরা জানে না মেয়ে-জামাই কী করবে?'

রুমা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার পা কাঁপছে।

দিব্যেন্দু বলল, 'দরজা বন্ধ না করলে এখানেই শাড়ি খুলে দেব। ভালো লাগবে সেটা?'

রুমা সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিল।

দিব্যেন্দু বলল, 'কাছে এসো।'

রুমা কাছে গেল।

দিব্যেন্দু অফিসের ব্যাগ থেকে একটা ছোট গয়নার বাক্স বের করে বলল, 'কানের দুল। পরে নাও।'

রুমা অবাক হয়ে দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে রইল।

১১

'যাও। বাবা-মাকে দেখিয়ে এসো।'

রুমা কানের দুল পরে চুপ করে বসে আছে। দিব্যেন্দুর কথা শুনে উঠে দাঁড়াল।

দিব্যেন্দু ডাকল, 'শোনো।'

রুমা দাঁড়িয়ে পড়ল।

দিব্যেন্দু বলল, 'এবার একটা বাচ্চা নিতে হবে। লোকে জিগ্যেস করছে। এক বছর তো হল।'

রুমা কিছু বলল না।

দিব্যেন্দু বলল, 'কীরে? কথা বলছিস না কেন? অন্য প্ল্যান আছে নাকি? ছেলেটাকে ডাকব? ল্যাঙটো হয়ে ওর সঙ্গে শুয়ে থাকবি?'

রুমা দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একা একা বাচ্চা নেওয়া যায় কি?'

দিব্যেন্দু স্থিরচোখে রুমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চেষ্টা করছি। দেখছি কী করা যায়। ডাক্তার দেখাব। তুই তাই বলে অন্য লোকের সঙ্গে শোয়ার তাল করবি?'

রুমা বলল, 'মাকে দেখিয়ে আসি।'

দিব্যেন্দু রুমার চুল ধরে তাকে কাছে আনল। রুমা শব্দ করল না। দিব্যেন্দু বলল, 'মা বাবাকে বলেছিস আমি পারি না?'

রুমা মাথা নাড়ল। দিব্যেন্দু বলল, 'বললে এখানেই পুঁতে রেখে দেব।'

চুল ছেড়ে দিল সে। রুমা ঘর থেকে বেরোল। মা-বাবা টিভি দেখছিল। রুমা মাকে বলল, 'এই যে, ও দিয়েছে।'

মা সেটা দেখে খুশি হয়ে বলল, 'কী ভালো। আমি বলি না। আমাদের জামাই সোনার টুকরো।'

দিব্যেন্দু ঢুকল। মাটিতে শুয়ে পড়ে শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করল। রুমার মা আপ্লুত হয়ে গেল, 'এ কী বাবা! থাক থাক। এরকম করলে খুব লজ্জা লাগে।'

দিব্যেন্দু প্রণাম সেরে মাটিতে বসে বলল, 'মা-বাবা ভগবানের রূপ। প্রণাম তো করতেই হবে। আমার নিজের বাবা-মা নেই। আপনারাই আমার বাবা-মা। কেমন আছেন আপনারা?'

রুমার মা বলল, 'ভালো আছি বাবা।'

রুমার বাবা বলল, 'অফিসে সব ঠিক ঠাক তো?'

দিব্যেন্দু বলল, 'হ্যাঁ। এই তো, আজ প্রমোশন পেলাম। কঠিন পরীক্ষা ছিল। আমি চেষ্টা করেছিলাম। অনেক পড়াশুনা করতে হয়েছিল। ভেবেছিলাম পেয়ে যাব। তাই হয়েছে। মাইনে বাড়ল। এখন অনেক দায়িত্ব এসে পড়েছে। আচ্ছা, আমি রুমাকে টাকা দিয়ে যাচ্ছি। আপনারা কাল বাজারে গিয়ে পুজোর বাজার করে নেবেন। আমিই নিয়ে আসতাম। কিন্তু তাহলে আপনারা পছন্দ করে কিনতে পারবেন না।'

রুমার মা লজ্জায় পড়ে গেল, 'এমা বাবা, আবার এসব কেন?'

দিব্যেন্দু বলল, 'আবার আমাকে আপনি এরকম বলছেন? আমার বাবা-মা থাকলে কি এরকম বলতো? এগুলো তো আমার কর্তব্য।'

রুমার মা বলল, 'আমি সবাইকে বলি। আমার জামাইকে দেখে শেখা উচিত। এত ভালো একটা ছেলে।'

দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়াল, 'আপনারা টিভি দেখুন। আমি ও ঘরে...'

রুমার মা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কিছু খাবে বাবা? করে দেব?'

দিব্যেন্দু বলল, 'আপনার সেই ঝিঙে দিয়ে রুই মাছের ঝোলটা খেতে ইচ্ছে করছে মা। সময় পেলে একটু করে খাওয়াবেন?'

রুমার মা বলল, 'নিশ্চয়ই। এ আবার কী কথা? আমি এখনই করে দিচ্ছি।'

দিব্যেন্দু ঘর থেকে বেরোতেই রুমার মা বলল, 'দেখেছিস? এরকম ছেলে পাবি আজকালকার দিনে? তোর তাতেও মন ভরে না। আর কী করতে হবে ওকে? ঠিক আর কী করলে তোর মন পাওয়া যাবে বলতে পারিস?'

রুমার বাবা ভ্রু কুঁচকে বলল, 'কেন? কী হয়েছে?'

রুমার মা বলল, 'ও কিছু না। তুমি টিভি দেখো। এই, তুই রান্না ঘরে আয়।'

রুমার মা রুমাকে নিয়ে রান্নাঘরে গেল। বলল, ‘শোন, আমি তোকে ভালো করে বোঝাই। মেয়েরা হচ্ছে ঘরের লক্ষ্মী। পুরুষ মানুষ বাইরে থেকে কাজ করে আসে। তেতেপুড়ে কত কষ্ট করে রোজগার করে। ঘরে এসে সব সময় তাদের মাথা ঠান্ডা নাও থাকতে পারে। তার জন্য তুই যেভাবে জামাইয়ের নামে মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছিস, সেটা কি ঠিক? এমন সোনার টুকরো ছেলে পাবি আজকালকার দিনে?’

রুমা মা’র দিকে তাকিয়ে রইল।

মা বলল, ‘দেরি করবি না। একটা বাচ্চা নিয়ে নে। দেখবি সব ঝামেলা ঠিক হয়ে যাবে। সব সংসারেই এরকম সমস্যা শুরুর দিকে হয়। একটা বাচ্চা এলে তখন দেখবি ধীরে ধীরে আর ঝামেলা হবে না। তুই হবার আগে তোর বাবা আমাকে কম মেরেছে? আমার এই হাতের কালো দাগটা দেখ। মেরে কালশিটে ফেলে দিয়েছিল। তাতে কি আমি ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে গেছিলাম? তোদের সহ্যশক্তি এত কম, উফ!’

রুমা ক্লান্ত গলায় বলল, ‘ঠিক আছে। বুঝেছি। বার বার এক কথা বলতে হবে না।’

দিব্যেন্দুর গলা ভেসে এলো, ‘রুমা একবার শোনো।’

মা ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘যা যা। জামাই ডেকেছে।’

রুমা ঘরে গেল।

দিব্যেন্দু দরজা বন্ধ করে রুমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘এস, চেষ্টা করি। একটা ওষুধ খেয়েছি।’

রুমা দাঁড়িয়ে পড়ল।

দিব্যেন্দু রুমার শরীর খাবলাতে শুরু করল।

১২

পাশের বাড়িতে পিউদিকে পড়াতে আসত প্রত্যুষদা। সেভাবে দেখেনি কোনও দিন। ক্রিসমাসের মেলা বসেছিল বড় মাঠে। সেখানেই হঠাৎ করে দুজনে মুখোমুখি হয়ে গেছিল।

রুমা চোখ সরায়নি। কেমন যেন ভালো লেগে গিয়েছিল প্রত্যুষদাকে। সে কথা বলেছিল নিজে থেকেই, ‘আমি একা চলে এসেছি। বাড়িতে বলিনি।’

প্রত্যুষদা বলেছিল, ‘সে কী? তোমার বাড়ি থেকে চিন্তা করবে না?’

রুমা বলল, ‘সন্ধে সাতটার আগে ফিরলে করবে না।’

প্রত্যুষদা বলেছিল, ‘চল। আমি তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসি।’

সেই শুরু। রাস্তা দিয়ে সে আগে যাচ্ছে। একটু দূরত্বে প্রত্যুষদা। কী অদ্ভুত একটা অনুভূতি।

বাড়ি ফেরার পর রাতে অনেকক্ষণ জেগে ছিল।

পরের দিন প্রত্যুষদার সাইকেলটা দেখে গুটি গুটি পায়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে বসেছিল। পড়িয়ে বেরনোর সময় প্রত্যুষদা একটু হাসল। রুমা সেটুকুতেই একবারে ক্লিন বোল্ড। ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে একটু একটু করে জমাট বাঁধতে শুরু করল তাদের গল্পটা।

মেলা শেষের মাস খানেক পরে ওই মাঠেই দেখা করেছিল তারা। প্রত্যুষ জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। সেই প্রথম।

পাড়ার ভজা তাদের ফলো করেছিল। সেই মাকে নিয়ে এসেছিল...

দিব্যেন্দু মোবাইল ঘাঁটছে। রুমা চুপ করে শুয়ে আছে। দিব্যেন্দু আলো নিভিয়ে রুমাকে বলল, 'মা-বাবা জানে তোমার কেসটা?'

রুমা উত্তর দিল না।

দিব্যেন্দু জোরে রুমার পিঠে চিমটি কাটল।

রুমা বলল, 'না।'

দিব্যেন্দু বলল, 'বলা উচিত। বাড়ির মেয়ে বাইরে প্রেম করে বেড়িয়েছে, বাবা-মার জানা উচিত না?'

রুমা বলল, 'তুমি জানো তো। তাহলেই হবে।'

দিব্যেন্দু বলল, 'আমি জানি? কোথায় আর জানি? একদিন সামনা-সামনি কথা বলব। দেখব কেমন তোমার হিরো।'

রুমা চুপ করে রইল।

দিব্যেন্দু বলল, 'কী কী করেছ? কতটা? যেরকম পানুতে দেখায়, সব?'

রুমা ক্লান্ত গলায় বলল, 'তোমাকে বলেছি তো ওসব হয়নি।'

দিব্যেন্দু বলল, 'হলেও বলবে নাকি? তুমি খুব চালাক। হলেও বলবে না।'

রুমা বলল, 'বলব না কেন? তুমি কম মেরেছ আমায়? মার না খাওয়ার জন্য হলেও কিছু করলে বলে দিতাম।'

দিব্যেন্দু বলল, 'তোমার গরম লাগছে না?'

রুমা বলল, 'না।'

দিব্যেন্দু বলল, 'আমার লাগছে। কাপড়-চোপড় খুলে শোও।'

রুমা বলল, 'তোমার লাগছে যখন তুমি খুলে শোও।'

দিব্যেন্দু বলল, 'আমি বলছি তো। আমরা চেষ্টা করতে পারি। সবাই বলছে বাচ্চা হওয়া দরকার।'

রুমা বলল, 'তুমি ডাক্তার দেখাও।'

দিব্যেন্দু বলল, 'তোমার ইচ্ছা করে খুব, তাই না? আমি যখন বাড়ি থাকি না, কার সঙ্গে ইচ্ছে মেটাও?'

রুমা বলল, 'তুমি তো সিসিটিভি বসিয়েছ। কেন জিগ্যেস করছ? কেন বার বার একই কথা বলছ?'

দিব্যেন্দু উঠে বসল। রুমার পিঠে খুব জোরে একটা কিল মেরে বলল, 'বেশ করেছি। আমি জানি তুই কী করে বেড়াস। বাড়ি থেকে কী করে এসেছিস, আমি ডেকে তুলব তোর বাপকে? গিয়ে বলব?'

রুমার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। সে উঠে বসে শ্বাস নিতে চেষ্টা করল। দিব্যেন্দু বলল, 'নাটক শুরু করে দিয়েছিস? তোর জন্য কানের দুল আনলাম আর তুই নাটক করছিস এখন?'

রুমা কোনমতে বলল, 'আমি কি আনতে বলেছিলাম তোমায়?'

দিব্যেন্দু হঠাৎ ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করল। রুমা বুঝল বাজে কোনও কথা বলবে। দিবেন্দু তাইই বলল, 'শোন না। তোর বাবা-মা ওই ঘরে কী করছে এখন?'

রুমা বলল, 'জানি না।'

দিব্যেন্দু বলল, 'আমি তো চাইলেই জানতে পারব। দেখবি?'

রুমার গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। সে বলল, 'কী করে?'

দিব্যেন্দু ফোন বের করে দেখাল। ফিসফিস করে বলল, 'ওই ঘরে স্পাই ক্যামেরা আছে দেখ। এই দেখ তোর বাবার গায়ে তোর মা পা তুলে দিয়েছে।'

রুমার বমি পাচ্ছিল। শরীর জুড়ে প্রবল অস্বস্তি শুরু হল। চিৎকার করে কাঁদতে পারলে ভালো হতো হয়তো এখন...

১৩

গলিটার উল্টোদিকের চায়ের দোকানে চুপ করে বসে ছিল সুখেন। দুটো ছেলে কথা বলছে। সুখেন সেটাই শুনছে। একটা ছেলে বলল, 'তুই ঠিক জানিস?'

অপরজন উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ। আমি ঠিক জানি। ওই পায়েলের সুগার ড্যাডি আছে। আমি ওকে গাড়ি থেকে নামাতে দেখেছি।'

বলে দুজনেই খিক খিক করে হাসল। প্রথমজন বলল, 'ওই বুড়োটা পারে?'

'পায়েলকে জিগ্যেস করব।'

কিছুক্ষণ হেসে দুজনেই চুপ করে গেল। চা শেষ করে প্রথমজন বলল, 'এ ভাই। আজকের দিনটা ছেড়ে দে। এখানে শুনেছি গুন্ডা থাকে।'

দ্বিতীয়জন অভয় দিল, 'আমি আছি তো। তুই আমার সঙ্গে থাকবি।'

সুখেন এবার ঘাড় ঘুরিয়ে দুজনের দিকে তাকাল। দুজনে তার ঘাড় ঘোরানো দেখে খানিকটা চমকাল।

সুখেন বলল, 'বাজেট?'

দুজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। দ্বিতীয়জন বলল, 'হাজার।'

সুখেন বলল, 'আসুন।'

প্রথম জন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'আজ থাক। আমি বাড়ি যাব।'

সুখেন বলল, 'দেখুন, আমি থাকলে আপনাদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। তাছাড়া গ্রাম থেকে নতুন প্রোডাক্ট এসেছে। খারাপ লাগবে না। চলুন।'

দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। রাস্তা পার হয়ে সুখেন অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে পাপিয়ার ঘরে গিয়ে নক করল।

দরজা খুলে গেল। পাপিয়া বেরিয়ে এসেছে। সুখেন ছেলে দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যান। দরকার হলে আমার নাম্বার রেখে দিন। সমস্যা হলে ফোন করবেন।'

দ্বিতীয় ছেলেটা সুখেনের নাম্বার নিয়ে প্রথমজনকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। পাপিয়া ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল, 'ফুলি, দেখ তো।'

ফুলি এলে পাপিয়া সুখেনের দিকে ঘুরে বলল, 'দুশো নিস না। দুশো বড় বেশি। এত কমিশন নিস তুই!'

সুখেন বলল, 'চলে এই টাকায়? তুই বল।'

পাপিয়া ব্লাউজের ভেতর থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে সুখেনের হাতে দিয়ে বলল, 'ভুল কিছু বলিসনি। ঠিকই। এই টাকায় চলে না।'

সুখেন বিড়ি ধরিয়ে বলল, 'লকডাউনের পর থেকে ব্যবসা খুব মন্দা যাচ্ছে। লোকে নাকি কী সব পুতুল বের করেছে। সেসব দিয়েই কাজ হয়ে যাবে।'

পাপিয়া ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'আমিও শুনেছি। মোবাইলে দেখলাম। হ্যাঁরে, এর পরে আমাদের কী হবে রে?'

সুখেন বিষণ্ণ গলায় বলল, 'জানি না। মাঝে মাঝে মনে হয় বাসের তলায় মাথা দিয়ে দি। এভাবে দালালি করে চলে না। লটারি বেচবো ঠিক করলাম, ছেলেগুলো এমন তাড়া দিল, হল না। বাবা কত করে বলল পড়াশুনাটা ছাড়িস না। তখন শুনলাম না। এখন এই দশা।'

পাপিয়া বলল, 'এসব বলা পাপ। বলিস না। তুই না থাকলে আমাদের কী হবে?'

সুখেন শ্বাস ছাড়ল। গলির বাইরে সাহেবের গাড়ি দাঁড়িয়েছে। পাপিয়া বলল, 'কদিন ধরে সাহেব আসছে, লক্ষ্য করেছিস?'

সুখেন বলল, 'হ্যাঁ। দেখেছি। নতুন মেয়ে আনবে শুনছিলাম তো।'

পাপিয়া গলা নামিয়ে বলল, 'তেরো বছরের দুটো মেয়ে নিয়ে এসেছিল। কার থেকে এনেছিল কে জানে। সারাদিন কাঁদছে।'

সুখেন বলল, 'গরীবের মেয়ে। বিক্রি করে দিয়েছে। সাহেবের আসার অন্য কারণ আছে। আমি শুনেছি, সাহেব নাকি বলেছে মাসোহারা বাড়াতে হবে। এত কম টাকায় তোদের সিকিউরিটি দেওয়া যাচ্ছে না।'

পাপিয়া হতাশ চোখে বলল, 'আমিও শুনেছি সে কথা। সব কিছুর দাম বাড়ছে। আমাদেরই বাড়ছে না।'

একটা লোক গলিতে ঢুকল। সুখেন সচকিত হল, 'দাঁড়া তো, এ লোকটা অনেক দিন পরে এসেছে। দেখি কী করে।'

পাপিয়া কিছু বলার আগেই সুখেন হাঁটতে শুরু করল। লোকটা ফোন করছে, সুখেন সেটাই শুনতে চেষ্টা করল। লোকটা বলছে, 'হ্যাঁ, কাল সিসিটিভি লাগবে। লোক যাবে। আমি বলে দিয়েছি। তুমি সব ঘরে ক্যামেরা লাগানোর কথা বলে দেবে। হ্যাঁ, ও আমি বুঝে নেবো। টাকা পাঠিয়ে দেব। কী? জার্মানি থেকে টাকা পাঠানো সমস্যা? ও আমি বুঝব। টাকা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, রাখছি...না, দেশে ফেরার চান্স নেই এখন...ঠিক আছে। ঠিক আছে।'

লোকটা গলা নামিয়ে কথা বললেও সুখেন ঠিকই সব শুনতে পেল। কাকে আবার ঢপ মেরেছে মালটা, দেশের বাইরে থাকে নাকি! কী যা তা!

লোকটার পেছনে এসে ফিসফিস করে বলল সে, 'স্যার, কলেজ গার্ল?'

লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ে রুমাল দিয়ে কপাল মুছে বলল, 'একটা ঘর পাচ্ছি না। দালাল তো? শমিতার ঘরে নিয়ে চল তো। পাঁচশো দেব ঠিক ঘরে নিয়ে গেলে। আমার সঙ্গে চালাকি কোরো না, পুরোনো লোক, তুলে নিয়ে এমন গুঁতবো বাপের নাম ভুলে যাবে। চল দেখি।'

১৪

ঘরে ঘরে ক্যামেরা লাগছে। পূর্ণ তদারকি করছে।

বাপিদা ছেলে পাঠিয়েছে। টাকা দিয়ে দিয়েছে। তার কাজ দেখে নেওয়া।

কিন্তু কাজ পুরো হল না। মইয়ে চড়ে যে ছেলেটা ক্যামেরা লাগাচ্ছিল, আচমকা মই ভেঙে পড়ে গেল। মই যে ভাঙতে পারে, পূর্ণ ভাবতে পারেনি। কোনমতে ধরে তুলে পাড়ার লোক ডেকে ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল।

বাপিদাকে ফোনে জানাতে বাপিদা বলল, 'কী করছিলে তুমি? দেখোনি?'

পূর্ণ বলল, 'আমি কী করব? আমি তো কাজ দেখছিলাম। মই ভেঙে পড়ে যাবে, তুমি কখনও দেখেছ?'

বাপিদা বলল, 'পাড়ার লোককেও বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়েছ?'

পূর্ণ বলল, 'হ্যাঁ। কী করব? না ঢুকলে অত বড় চেহারার ছেলেটাকে কী করে নিয়ে আসতাম?'

বাপিদা বলল, 'তাও ঠিক। তুমি বাড়ি যাও। আমি ছেলেটার কোম্পানিতে ফোন করে দিচ্ছি। ওরা সামলে নেবে।'

পূর্ণ বলল, 'ঠিক আছে। তাই হবে।'

হাসপাতালে ছেলেটাকে রেখে আবার ফিরে এল পূর্ণ।

তার কপালেই এসব হয়। কত ছেলে এসি লাগাচ্ছে, কতজন ফ্যান লাগাচ্ছে, বড় বড় বিল্ডিংয়ে উঠে কতজন আবার রঙ করছে ঝুলে ঝুলে, তাদের কিছু হল না, এ বাড়িতেই এসব হতে হল। মানে অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। একেই বলে কপাল।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। বাপিদা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবে। আবার কিছু না কিছু করে ক্যামেরা লাগবে। লেগে যাক বাবা। যদি এত করে ক্যামেরা লাগাতে চায়, তার কী যায় আসে। যার মাছ, সে যেদিক দিয়ে খুশি কাটুক।

আবার সেই নাম্বার থেকে ফোন আসছে। পূর্ণ ধরল, 'আবার আপনি ফোন করেছেন?'

'শুনুন না। আপনি সত্যি বলছেন আপনি এই সিমটা তুলেছেন?'

'হ্যাঁ। মিথ্যা বলব কেন? আমি মিথ্যা বলি না। মিথ্যা বলার দরকার পড়ে না।'

'আপনি একটু দোকানে জিগ্যেস করে দেখবেন কার সিম দিয়েছে?'

'দোকানে? হ্যাঁ জিগ্যেস করেছিলাম তো।'

'কী বলল?'

'বলেছে অনেকে এরকম সিম রাখে। রিচারজ না করলে সে সিম আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। কোম্পানি সেই নাম্বার আরেকজনকে দিয়ে দেয়। আপনি যাকে খুঁজছেন, তিনি সেই নাম্বার আর রিচারজ করেননি বলেই আমার কাছে এসেছে এই সিমটা।'

'ও। তাহলে কী হবে?'

'কী হবে? আপনি কাকে চাইছিলেন বলুন। আমি যোগাযোগ করে দেখব?'

'কুমুদপুরে। প্রত্যুষ হালদার। কিন্তু প্রত্যুষদা আর কুমুদপুরে থাকে না।'

'কোথায় থাকে?'

'আমাদের এলাকা থেকে ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

'কেন? চোর-ডাকাত ছিল নাকি?'

'না। তা ছিল না।'

'তবে?'

'আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।'

'ও তাই বলুন। তাকেই আর পাচ্ছেন না, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'কেন খুঁজছেন তাকে?'

'আমার বর আমাকে খুব মারে। আমার বাড়ির লোকও আমার বরের সঙ্গে আছে। আমি প্রত্যুষদাকে খুঁজছি। ওকে খুঁজে পেলে পালাবো। আমি আর পারছি না বিশ্বাস করুন। রোজ মারে আমাকে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে আছি।'

'আপনি পুলিশকে জানান।'

'কী হবে? পুলিশ আমার কী করবে? সেই তো একটা হোমে দেবে। আমি কী করব সেখানে? আমার বাবা-মা বেঁচে আছে। তারা আমার কথা বিশ্বাস করছে না। অন্য লোকে কেন করবে?'

'দেখুন আমি বোকা সোকা মানুষ। তার উপর অন্য লোকের বাড়িতে থাকি। আমি কী করে বুঝব বলুন তো?'

'আমি আর পারছি না।'

ওপাশ থেকে মেয়েটা কাঁদতে শুরু করল। পূর্ণ চুপ করে শুনল। তার খারাপ লাগছে। কিন্তু সে কী করবে? সে নিজেই তো অন্য লোকের ভরসায় থাকে। তার অত বুদ্ধিও নেই।

বাপিদা আবার ফোন করছে। সে ধরল, ‘বল।’

‘ফোন বিজি কেন তোমার? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?’

‘আরে আর বল কেন? একটা মেয়েকে ওর বর খুব মারে। আমাকে ফোন করে নালিশ করছিল।’

দাঁত বের করল পূর্ণ।

বাপিদা বলল, ‘তাই? দাও তো আমাকে নাম্বারটা!’

১৫

ফোনটা নিয়ে ঠাকুরঘরে চুপচাপ বসে আছে রুমা। ঠাকুরঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছে। মাকে বলেছে পাঁচালি পড়বে।

দিব্যেন্দু অফিসে গেছে।

বুকটা কেমন ঢিব ঢিব করছে।

কয়েক মিনিট আগে একটা নাম্বার থেকে ফোন এসেছিল। সে ধরতে ও পাশ থেকে একজনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ‘আমি শুনলাম আপনার বর আপনাকে মারে?’

রুমা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ‘কে বলছেন আপনি?’

‘আমি কে, তা জানার দরকার নেই। আপনি আমাকে শুধু বলুন, আপনার জীবন কি খুব খারাপ হয়ে গেছে?’

রুমা সতর্ক হল। দিব্যেন্দুই কাউকে দিয়ে ফোন করাতে পারে। সে বলল, 'রঙ নাম্বার।'

'শুনুন, শুনুন। কাটবেন না। আমার কথা শুনুন। আপনি একজনকে ফোন করেছিলেন তো? আপনি কাউকে একটা খুঁজছিলেন। সিম নিয়েছে নতুন? তাই তো?'

রুমা এবার নিশ্চিত হল। বলল, 'আপনি কে বলছেন?'

'আমি কে বলছি তা জানার দরকার নেই। এটা বলতে পারি যে, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনি কি বাড়ি ছেড়ে পালাতে চান? একটা নিশ্চিন্ত জীবন পেতে চান?'

রুমা ফোন কেটে দিল। লোকটার কথাগুলো কেমন টেলি কলারের মতো শোনাচ্ছে।

লোকটা আবার ফোন করছে। রুমা ধরল না। লোকটা হাল ছাড়েনি। চেষ্টা করেই যাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে ধরল রুমা, 'আপনাকে আমি চিনি না। আপনি আমাকে বার বার ফোন করবেন না।'

'শুনুন ম্যাম, আপনাকে আমি হেল্প করতে পারি। আপনি জীবন থেকে কী চান? একটু শান্তি তো? আমি দেব।'

'মানে? কেন দিতে যাবেন অজানা অচেনা কাউকে?'

'কারণ আপনি একজন মানুষ। আমাদের কাছে একজন মানুষও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ব্যাপারটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা লোক জড়ো করছি। আমরা খুঁজছি, কারা আমাদের সঙ্গে জুড়তে পারে। সবাই তো আর সব কিছু ছেড়ে চলে আসার পরিস্থিতিতে থাকে না। কেউ সন্তান থাকার কারণে সব কিছু ছেড়ে আসতে পারে না। পড়ে পড়ে মার খায়। আপনার তো কেউ নেই? আছে?'

রুমা বলল, 'না। আমার বাবা-মা থেকেও নেই। আমি শুধু মার খাই। দুবেলা ভাত খাবার জন্য আমাকে মার খেতে হয়।'

'আপনি আপনার লোকেশনটা পাঠান। আমরা আপনাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব।'

'উদ্ধার করে কোথায় নিয়ে যাবেন?'

ও প্রান্ত থেকে হাসির শব্দ এল। লোকটা হেসে বলল, 'ভালো থাকবেন, কেউ মার খাবে না, এটুকু নিশ্চিত করতে পারি। তারপরেরটা না-হয় তার পরে দেখা যাবে?'

রুমা ফোন কেটে অফ করে রেখে দিল।

মা বাইরে ঘুর ঘুর করছে। তাকে দেখে বলল, 'শোন, একজন ভালো ডাক্তার পাওয়া গেছে। তোর এই যে বাচ্চা হচ্ছে না, সেটার ব্যাপারে কথা বলা যাবে। ডাক্তারবাবুকে দেখা। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রুমা অবাক গলায় বলল, 'আমার বাচ্চা হচ্ছে না কে বলল তোমায়?'

মা বলল, 'জামাইই তো বলল। তোর নাকি কী সব সমস্যা আছে?'

রুমা স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'আমার সমস্যা আছে? এ কথা বলল?'

মা বলল, 'হ্যাঁ। তুই ভাবিস না। আমি কথা বলে রেখেছি। রবিবার তোকে দেখিয়ে আনবো। অনেক রকম উপায় আছে এখন।'

রুমা ঘরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসল। মা তার পিছন পিছন এসে বলল, 'ছেলেটা এত ভালো। তোর জন্য সব সময় ভেবে যাচ্ছে।'

রুমা অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'হু।'

মা বলল, 'কানেরটা দেখেছিস? অনেকটা সোনা দিয়ে করা। কত ভালোবাসে। আর তুই কোথাকার একটা জঞ্জালের সঙ্গে পালাবি ভেবে বসেছিলিস। ছি-ছি। কী হতো বলত? কোনও একটা বস্তিতে ঘুটে কুড়ানির কাজ করতে হতো। ভাবতেও লজ্জা লাগে। আমি তো তোর বাবাকে বলি, তোর বোনের জন্য জামাইয়ের মতো একটা ছেলে খুঁজতে হবে।'

রুমা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। হাসি পেয়ে গেল হঠাৎ করে। খিলখিল করে হেসে উঠল।

মা বলল, 'তুই খোলা চুলে বাইরে গেছিলি না? আমি আগে থেকেই জানি, তোর উপর কিছু একটা ভর করেছে। তোকে ঝাড়াতে হবে ভালো করে। তার ব্যবস্থাও করছি।'

রুমা আরও জোরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে গেল একেবারে...

১৬

শমিতার ঘরটা ভেতরের দিকে। লোকটাকে সুখেন ছেড়ে দিয়ে এল দরজার সামনে। লোকটা নক করল দরজায়। শমিতা লোকটাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল।

এইসব জায়গায় কাজ করতে হলে চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। সুখেনের তা বরাবর প্রখর। লোকটা শমিতার কাছে কেন এলো, তা জানার কৌতূহল হচ্ছিল তার।

বাইরে থেকে যে মেয়েগুলো আসে, তারা প্রথমে কয়েকদিন এসে শমিতার কাছে থাকে। শমিতা তাদের ট্রেনিং দেয়, কী করে খদ্দেরের সামনে দাঁড়াতে হয়, কথা বলতে হয়। এত লোক থাকতে এই লোকটা শমিতার কাছে এসেছে বলেই সুখেনের অস্বস্তি হচ্ছিল। বীথিকার ঘরটা শমিতার ঘরের কাছেই। সুখেন বীথিকার ঘরের সামনে বসল। বীথিকা তাকে দেখে বলল, 'কী হল? এখানে কী করছিস তুই?'

সুখেন বিড়ি ধরিয়ে বলল, 'কিছু না। লোকজন কম আসছে বলে ব্যবসা ভালো নেই।'

বীথিকা বলল, 'ভালো হবে কী করে? কচি কচি সব ধরে আনছে কোত্থেকে। এবার আর আমাদের কেউ নেবে? আর তো কোনও কাজও জানি না ছাই।'

সুখেন বিড়িতে টান দিল। বলল, 'অনেক লোকই আছে তোদের মতো বুড়ি পছন্দ করে। নিয়ে আসব। ভাবিস না।'

বীথিকা সুখেনকে কনুই দিয়ে ঠ্যালা দিল, 'এই হারামজাদা। আমি বুড়ি? আমার তিরিশও হয়নি।'

সুখেন বলল, 'তাই নাকি? জানতাম না তো?'

লোকটা বেরোল শমিতার ঘর থেকে। সুখেন বলল, 'এই বীথিকা, দেখ তো, এ লোকটাকে চিনিস?'

বীথিকা আগেই দেখেছিল। বলল, 'অনেক দিন আগে দেখেছিলাম। আজ এলো আবার। আমি তো ডেকেওছিলাম, শমিতা তো আমার থেকেও বুড়ি, ওর কাছে গেছিল কেন কে জানে!'

সুখেন দাঁড়াল, বলল, 'সেই।'

লোকটা এগোচ্ছে। গলি দিয়ে সিধে হেঁটে চলেছে। সুখেন একটু দূরত্ব রেখে লোকটার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। বড় রাস্তার কাছে এসে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, 'বল ভাই, কিছু জানতে চাও?'

সুখেন থতমত খেয়ে বলল, 'না তো। আমি তো এইদিকেই আসছিলাম, খদ্দের ধরার জন্য।'

লোকটা পকেট থেকে একটা লম্বা সিগারেট বের করে ধরিয়ে বলল, 'খদ্দের? তাই নাকি?'

সুখেনের পাড়ায় এসে সুখেনকে গরম নিচ্ছে লোকটা। কিন্তু সুখেন তাও কিছু করতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে এ লোকটার বড় কোনও জাহাজে দড়ি বাঁধা আছে। নাকি লোকটাই একটা জাহাজ? কে জানে।

সুখেন বলল, 'হ্যাঁ। শমিতার সঙ্গে কাজ মিটেছে?'

লোকটা তার মুখে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'তা জেনে তোমার কী হবে? যত কম জানবে, তত ভালো থাকবে। বুঝেছ?'

সুখেন ভালো ছেলের মতো মাথা নাড়ল। লোকটা চলে গেলে সুখেন শমিতার ঘরে ঢুকল। শমিতা তাকে দেখে বলল, 'কীরে? কাউকে নিয়ে এসেছিস, না তোরই লাগবে আজ?'

সুখেন বলল, 'এই লোকটা যে এসেছিল, কে রে?'

শমিতার মুখটা একমুহূর্তের জন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছিল। সে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, 'কোন লোকটা? সারাদিন কত লোক আসছে!'

সুখেন চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'তুই জানিস কোন লোকটার কথা বলছি। কে লোকটা? পার্টির নাকি পুলিশের?'

শমিতা রেগে গেল, 'যেই হোক, তোর কী তাতে? ফোট এখান থেকে।'

সুখেন বলল, 'রোজ রাতে তোর ঘরে চার পাঁচটা মেয়ে আসছে। এরা কোথাকার? সবক'টাকে বাঙালি বলে মনেও হচ্ছে না।'

শমিতা বলল, 'গায়ে খুব জ্বালা ধরে তোদের না রে? আমি রোজগার করছি, তোদের জ্বলছে। বেশি বাড়িস না সুখেন, আমি কিন্তু বুঝে নেব তোকে। বেরো এখান থেকে।'

সুখেন বেরিয়ে গেল। সমিতির অফিসে শম্পা একা বসে ছিল। সুখেনকে দেখে বলল, 'কী রে? কী হয়েছে?'

সুখেন বলল, 'শমিতার ঘরে অনেক মেয়ে আসছে। খবর পেয়েছ?'

শম্পা অবাক হল, 'না তো। কেউ বলেনি কিছু। কোত্থেকে আসছে মেয়েগুলো?'

সুখেন বলল, 'বাইরে থেকে। রেজিস্ট্রেশন বা হেলথ চেক আপ করায়নি কারো?'

শম্পা ঠোঁট ওল্টালো, 'আমি জানি না। মাইনর ধরে ধরে আনছে নাকি?'

সুখেন বলল, 'তাই তো মনে হয়। খোঁজ নাও।'

শম্পা বলল, 'আমি নিতে পারব না। আমার অত আগ্রহ নেই ভাই। কারা কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে, তার দায় কি আমার নাকি? শমিতার ঘরে অনেকেই আসে। সব জানার দরকার নেই আমার। আর তোকেও বলি, এত কিছু জানার ইচ্ছা ভালো না। কম জানলে ভালো থাকবি।'

সুখেন ছোট ছোট চোখ করে শম্পার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবল। কিন্তু কিছু বলল না।

১৭

'বাড়ি যাবি এখন?'

অফিস থেকে বেরোতেই সুদেব পিছু ডাকল। দিব্যেন্দু বলল, 'হ্যাঁ।'

সুদেব বলল, 'প্রমোশন পেয়েছিস, সেলিব্রেট করবি না?'

দিব্যেন্দু জানে, সুদেব একটু এদিক সেদিক যায়। তবু প্রথমে বুঝতে পারল না সুদেব কী বলতে চাইছে। সে বলল, 'সেরকম কিছু করার কথা ভাবিনি।'

সুদেব এসে ফিসফিস করে বলল, 'এরিয়া টুয়েন্টিতে চল। নতুন ফ্রেশ স্টক এসেছে। ভালো লাগবে।'

দিব্যেন্দু ঘড়ি দেখল। সুদেবের ভাট বকা শুনলে চলবে না। সে বলল, 'পরে যাব। এখন তাড়া আছে।'

সুদেব মুখে বিরক্তি নিয়ে বলল, 'আরে ভাই, কতদিন আর বাচ্চা ছেলে থাকবি, বড় হ।'

দিব্যেন্দু দাঁড়াল না। সুদেব এর আগেও বলেছে। অফিস থেকে ওই পাড়াতেই চলে যায় ও।

সে স্টেশনে এসে শেষ মুহূর্তে ট্রেন ধরল। তাপস বলল, 'অ। বাঙাল এসে গেছে? আমি তো ভেবেছিলাম আসবে না।'

দিব্যেন্দুর জন্য রুমাল দিয়ে জায়গা রাখা ছিল। সে বসে তাস হাতে নিয়ে বলল, 'এক কলিগ ধরেছিল। তোর জন্মস্থানে নিয়ে যাবে বলে। গেলাম না।'

তাপস বলল, 'আমার জন্মস্থান মানে?'

দিব্যেন্দু বলল, 'ওই যে, যেখানে সব লাইন দিয়ে দাঁড়ায়।'

তাপসের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। বাকি রাস্তাটা তাপস যখনই খাপ খুলতে গেল, দিব্যেন্দু প্রতিবারই বাক্যাঘাতে তাকে তছনছ করে দিল। কামরুল পর্যন্ত বলে ফেলল, 'বিরাট উন্নতি তো? প্রমোশনের জন্য নাকি?'

দিব্যেন্দু কাউকেই পাত্তা দিল না। তাপসকে পরপর দু'দিন কোণঠাসা করে দেওয়া গেছে। বিরাট ব্যাপার।

ট্রেন দাঁড়াতে সাইকেল নিতে দৌড়ল সে। মফস্‌সলে সন্ধ্যা নেমেছে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে বোধহয়। রাস্তাঘাট ভেজা। হলদে আলোয় পিচের রাস্তায় সাইকেল চালাচ্ছে দিব্যেন্দু। মনে একটা আনন্দ হচ্ছে। শ্বশুর শাশুড়ি আছে। ওরা থাকলে রুমা আর কাউকে ফোন করতে পারবে না! ভাবতেই ঠোঁটের কোণে হাসি চলে আসছে তার। আজ বেগ আসেনি। চপের দোকানের সামনে সাইকেল দাঁড় করাল সে। গরম গরম বেগুনি ভাজছে। জলপাইয়ের চপ। ভেজিটেবল চপ। ডিমের চপও আছে। একটা আস্ত ডিম দেয় এ দোকানে। সে প্রত্যেকের জন্য দুটো করে ভেজিটেবল চপ আর ডিমের চপ নিল। দোকানদার বিটনুন ছড়িয়ে দিচ্ছে চপের উপরে। শসা পেঁয়াজ কুঁচো করে কাটা। সেটাও দিয়ে দিল। হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে সাইকেলটা চালিয়ে খানিকটা যাবার পর হঠাৎ করে একটা কুকুর এসে পড়ল চাকায়। দিব্যেন্দু সাইকেল থেকে পড়ে গেল। রাস্তার কাঁদায় চপ মাখামাখি খাচ্ছে। চারপাশে কেউ নেই। ব্যথা করছে পায়ে। দাঁতে দাঁত চেপে দিব্যেন্দু সাইকেল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। কুকুরটা দূর থেকে তাকে করুণ চোখে দেখছে। জামা ঠিক করে আবার সাইকেলে উঠল সে। ধীরে ধীরে সাইকেল নিয়ে বাড়িতে এল। সামনের ঘরে শ্বশুর বসে আছে। দিব্যেন্দু শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে হেসে বাথরুমে ঢুকে গেল। স্নান সেরে বেরোতে রুমা বলল, 'মুড়ি দেব?'

দিব্যেন্দু ঘরে যেতে যেতে বলল, 'একবার এসো।'

রুমা তার পেছন পেছন ঘরে ঢুকল। দিব্যেন্দু রুমার চুলের মুঠি ধরে চাপা গলায় বলল, 'রাস্তায় কুকুর চলে এসেছিল। তোর পোষা?'

রুমার কাছে রাস্তার কয়েকটা কুকুর এসে খায়। উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো রুমা খাওয়ায়। দিব্যেন্দুর হঠাৎ নেমে আসা আক্রমণে সে হতচকিত হয়ে বলল, 'আমি জানি না।'

দিব্যেন্দু রুমার গলা টিপে ধরে বলল, 'তুইই পাঠিয়েছিলিস। আমি জানি।'

রুমা দিব্যেন্দুর হাত ধরল। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। দিব্যেন্দু রুমার গলা ছেড়ে দিল। রুমা কাশতে কাশতে বলল, 'ওভাবে কুকুর পাঠানো যায় নাকি?'

দিব্যেন্দু বলল, 'সব যায়। তুই সব পারিস। যা বাজার থেকে চপ নিয়ে আয়। আটটা ভেজিটেবিল, আটটা ডিম।'

রুমা ঘাড় নেড়ে বলল, 'টাকা দাও।'

দিব্যেন্দু বলল, 'টাকা নেই। তুই কীভাবে আনবি, তুই জানিস।'

রুমা কিছুক্ষণ বিহ্বল চোখে দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

১৮

অন্যান্য দিন রাত একটার পর আর তার বিশেষ কাজ থাকে না। নিজের ঝুপড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সুখেন। খাওয়া বলতে চাল ডাল ফুটিয়ে নেওয়া। কিছুদিন আগে পেটের সমস্যা হয়েছিল। হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়েছিল গিয়ে। ডাক্তারবাবু স্পষ্ট বলে দিয়েছেন তেল খেলে মরতে হবে। তারপর থেকে সুখেন নিজেই রান্না করে, যত রাত হোক।

এ দিন সুখেন একটার পর পাপিয়ার ঘরে বেল বাজাল। পাপিয়া বেরিয়ে এসে বিরক্ত গলায় বলল, 'কাস্টোমার নেই। ঘুমাব ভাবলাম। তোর কী হল? কাউকে এনেছিস?'

সুখেন ইতস্তত করে বলল, 'একটু চা খাওয়াবি?'

পাপিয়া অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে তোর? এত রাতে চা খাবি?'

সুখেন দাঁত বের করল, 'কী করব বল? ভালো লাগছে না। কেমন গলা ব্যথা করছে।'

পাপিয়া বলল, 'আয়।'

ছোট একটা ঘুপসি ঘর। এত কিছুর মধ্যেও পাপিয়া ঘরটা কেমন সাজিয়ে রেখেছে। ঘরের মধ্যে আবার এক কোণে ঠাকুরও আছে। এই ঘরেই বাইরের লোক আসে। পাপিয়া স্টোভে চা বসিয়েছে। বলল, 'আদা দিলে ভালো হতো। যা দাম। কী যে করিস? ওষুধ খাবি?'

সুখেনের হঠাৎ করে কেমন কান্না পেয়ে গেল। মা-র কথা মনে পড়ে গেল। এই জায়গাতেও ওরা নিজের পৃথিবী তৈরি করে নিয়েছে। এটাই তাদের জীবন। এভাবেই তারা সারাজীবন কাটিয়ে দেবে। অথচ এই জায়গাতেও মেয়েটা তার গলা ব্যথার জন্য আদা দেওয়ার কথা ভাবল। গলা ধরে এল হঠাৎ করেই। পাপিয়া যাতে সেটা বুঝতে না পারে, তাড়াতাড়ি একটু কেশে নিয়ে বলল, 'সকালে একটা লোক এসে শমিতার ঘরে গেছিল। শমিতা আমাকে কিছুই বলতে চাইল না। কিন্তু জানিস তো, আমার মনে হচ্ছে ডাল মে কুছ কালা হয়। কত কমবয়সি মেয়ে এ পাড়ায় ঢুকে যাচ্ছে।'

পাপিয়া বলল, 'তুই বেশি ভাবিস না বাবা। ওদের অনেক ক্ষমতা। কী দরকার আছে এসব নিয়ে বেশি ভাবার? কাউকে কিছু বলেছিস নাকি?'

সুখেন মাথা নাড়ল, 'না। বলিনি। কিন্তু ওই মেয়েগুলোকে দেখলে মায়া হয়। কাদের কাদের সব নিয়ে আসছে। শমিতা মোটা টাকা পাচ্ছে।'

পাপিয়া বলল, 'পাক। তোকে ভাবতে হবে না। ভাবিস না। বোকামি করিস না। ওরা একবার কিছু বুঝে গেলে তোর বিপদ আছে। এ জায়গা ছাড়তে হবে।'

সুখেন বলল, 'কী করব বল এ জায়গায় থেকে? কী লাভ হয়? কী করছি আমি? কীভাবে পেট ভরছি। সবাই দালাল বলে ডাকে।'

চা হয়ে গেছিল। পাপিয়া চায়ের কাপ এনে তার হাতে দিয়ে বলল, 'বেশ করেছিস দালালি করেছিস। তুই দালালি না করলে আমরা কী করে খেতাম? আমরাও তো তোর জন্যই বেঁচে আছি। কে কী বলল, তা শোনার দরকার নেই।'

বড় গাড়িটা এসে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে সেটা দেখে সুখেন বলল, 'ওই দেখ। কতগুলো মেয়ে ঢুকছে। দেখছিস?'

পাপিয়া বলল, 'তোকে না বলেছি এগুলো নিয়ে ভাববি না?'

সুখেন চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'কিছুই ভাবছি না। আমার আর ভাবতে ভালোও লাগছে না। সেই লোকটাকে ঠিক লাগল না বলেই মনে কেমন খটকা লাগছে।'

পাপিয়া বলল, 'তার জন্য পুলিশ আছে। দেশে আইন-কানুন আছে। তোকে সেসব নিয়ে ভাবতে হবে না। তুই তোর কাজ করে যা।'

সেই লোকটাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল, 'ওই দেখ। ওই লোকটাও এসে গেছে। বড় কোনও ব্যাপার আছে বলে মনে হচ্ছে।'

পাপিয়া কড়া গলায় বলল, 'তুই কোথাও যাবি না। চা খা বসে বসে।'

সুখেন বলল, 'তুই একবার গিয়ে দেখে আয় না মেয়েগুলোকে নিয়ে কার ঘরে ঢোকাচ্ছে? শমিতার ওখানে তো এত জায়গা নেই।'

পাপিয়া তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। শ্বাস ছেড়ে বলল, 'বড় জ্বালাতন করিস তুই। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। আমি যতক্ষণ না ফিরছি, তুই কিন্তু এখান থেকে নড়বি না। তুই এ ঘরের বাইরে গেলে ওরা কেন, আমিই তোর বারোটা বাজিয়ে দেব।'

সুখেন হাসল, 'ঠিক আছে। তুই গিয়ে খোঁজ নিয়ে আয়।'

পাপিয়া বাইরেটা দেখে সন্তর্পণে বেরোল। কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, 'হ্যাঁ। তুই ঠিকই বলেছিলিস। শমিতার ঘরেই গেছে। আরেকটা ব্যাপার হল, আর কয়েকটা মেয়ে শমিতার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বাজারের গলিটা দিয়ে ওদের নিয়ে গেল।'

সুখেন বলল, 'তার মানে দেওয়া-নেওয়া চলছে। কী ব্যাপার বল তো?'

পাপিয়া কড়া গলায় বলল, 'তোর চা খাওয়া হয়েছে?'

সুখেন বলল, 'হ্যাঁ। হয়েছে।'

পাপিয়া বলল, 'নিজের ঝুপড়িতে গিয়ে ঘুমো। আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর রাখতে হবে না। যা।

সুখেন হাসল, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি রে বাবা যাচ্ছি।'

১৯

একটা সময় তো তাদের কাছেই টাকা চাইতে যেত। কিন্তু এত বড় হয়ে কি আর টাকা চাওয়া যায়? রুমা টাকা চাইতে পারেনি। প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছিল মাথায়। ছোট্ট একটা ব্যাগে একশো টাকা রাখা ছিল। কবে যেন টাকাটা রেখেছিল সে। আপদকালীন টাকা।

পালানোর জন্য রাখা। দিব্যেন্দু তাকে একটা টাকাও দেয় না। রুমা কোনওদিন দিব্যেন্দুর পকেট থেকে টাকা নেয়নি। সন্ধে নেমেছে। রুমা যেন ঘোরের মধ্যে চপের দোকানে গেল। চপ নিয়ে ফিরে এসে দিব্যেন্দুকে দিল।

প্যাকেটটা দেখেই দিব্যেন্দু বলল, 'দেখলি? ঠ্যাকায় পড়লে সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। যা কুচো কুচো করে শশা কাট। পেঁয়াজ কাট। মুড়ি দিয়ে চপ দিয়ে দে।'

রুমা রান্নাঘরে গিয়ে শশা কাটতে শুরু করল। আগে চোখ থেকে জল বেরোত। এখন সেটাও বেরোচ্ছে না। সুন্দর করে মুড়ি মেখে দিব্যেন্দুকে দিল। দিব্যেন্দু রাগ দেখাল, 'আগে বাবা-মাকে দে।'

রুমা তাই দিল। সব কিছু দিয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে ফোন অন করল। লোকটার নাম্বারে ফোন করল। রিং হতেই ধরল লোকটা, 'হ্যাঁ, ডিসিশন হল?'

রুমা বলল, 'আমি কোথায় থাকি, কী করে বুঝবেন?'

'আমাকে হোয়াটস অ্যাপে লোকেশন পাঠান। হোয়াটস অ্যাপে গিয়ে...'

'পারি। কিন্তু আমার নেট নেই।'

'ভরিয়ে দিচ্ছি। লোকেশন পাঠান। বাকিটা দেখছি।'

ফোন কেটে গেল। রুমার ঘাম হচ্ছিল। দিব্যেন্দু জানতে পারলে সত্যি সত্যি তাকে পুঁতে দেবে। কিন্তু আর না। আর পারা যাচ্ছে না। অনেক হয়েছে। এবার এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

নেট প্যাকের এসএমএস এল।

রুমা সঙ্গে সঙ্গে হোয়াটস অ্যাপ খুলে লোকটাকে লোকেশন পাঠিয়ে দিল। ফোন ভাইব্রেট করে উঠল, ফোন ধরতেই লোকটা বলল, 'দু'ঘণ্টা লাগবে। রাত এগারোটার পর বাড়ির বাইরে একটা কালো গাড়ি দাঁড়াবে। উঠে চলে আসুন।'

রুমা বলল, 'শুনুন শুনুন।'

'আপনি চলে আসুন। না আসতে চাইলে আসবেন না। গাড়িটা দশ মিনিট দাঁড়াবে। দেখুন কী করবেন।'

ফোন কেটে গেল। রুমা ফোন সাইলেন্ট করে রেখে দিল।

'কী হল? কোথায় গেলে?'

দিব্যেন্দু চিৎকার করছে। রুমা ঘরে ঢুকল, 'বল।'

দিব্যেন্দু বলল, 'রাতে কী রান্না আছে?'

রুমা বলল, 'রুটি মাংস।'

দিব্যেন্দু বলল, 'মাংস কে আনল?'

রুমা বলল, 'বাবা।'

দিব্যেন্দু খুশি হল, 'গুড। আয়, কোলে আয়।'

রুমা দরজার দিকে তাকাল।

দিব্যেন্দু বলল, 'কী হয়েছে? এসো সোনা। আমাদের বাড়িতে তো আমরা যা খুশি করতেই পারি।'

রুমা আরেকবার দরজার দিকে তাকিয়ে দিব্যেন্দুর কাছে গেল।

দিব্যেন্দু কানে কানে বলল, 'ডাক্তার দেখাবি। তোর মাকে বলে দিয়েছি। বাচ্চা চাই আমার।'

রুমা ঘাড় নাড়ল।

দিব্যেন্দু হাতে চিমটি কাটল। ঘাড়ে চিমটি কাটল। রুমা কিছু বলল না। চুপ করে বসে রইল। ঘরের মধ্যে হঠাৎ রুমার মা ঢুকল। তাদের দেখামাত্র জিভ বের করে বাইরে বেরিয়ে গেল। রুমা ছিটকে গিয়ে বলল, 'এবাবা।'

দিব্যেন্দু শক্ত করে রুমার হাত ধরে বলল, 'আমার বাড়ি। আমি যা খুশি করব। এখানে বোস।'

রুমা মাটিতে মিশে যেতে যেতে বসল।

দিব্যেন্দু বলল, 'মা-বাবা কাল চলে যাবে। তারপর আবার শুরু করবি তুই?'

রুমা বলল, 'আমি কিছু করি না।'

দিব্যেন্দু রুমার পেট খামচে ধরল, 'আবার মিথ্যে কথা?'

রুমার ব্যথা লাগছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল। দিব্যেন্দু হঠাৎ পেট থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, 'যা। রুটি কর।'

রুমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মা রান্নাঘরে ছিল। তাকে দেখে বলল, 'কী লজ্জার ব্যাপার হয়ে গেল? আমারই দোষ। জামাই আবার কী মনে করবে?'

রুমা মা'র দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে আটার প্যাকেট বের করল।

রুমার মা বলল, 'ডাক্তারটা কাল আমরা যাওয়ার আগে দেখিয়ে নে। দেখা যাক কী বলে?'

রুমা কিছু বলল না। চুপ করে রান্না করল। সবাইকে খেতে দিল।

রাত হল। দিব্যেন্দু ঘুমিয়ে পড়ল। বাকিরাও ঘুমিয়েছে। সে পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে দেখল একটা কালো গাড়ি সত্যি সত্যিই এসে দাঁড়িয়ে আছে।

রুমা দ্বিতীয় কোনও কথা ভাবল না। হাঁটতে হাঁটতে এক বস্ত্রে গাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা খুলে গেল।

সে গাড়িতে উঠে বসতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

'বিখ্যাত হতে চাওয়ার শর্টকাট আছে। কেউ কেউ বিখ্যাত হতে গিয়ে খানকি...'

কথাটা মুখে চলে এসেছিল। বলার আগে চুপ করে গেল অরিত্র। আরেকটু হলে বলে ফেলছিল।

এণাক্ষী রেগে গেল, 'কী? কী বলতে চাইছ তুমি?'

অরিত্র বলল, 'কিছু না। তুমি যদি ওই পার্টিতে যেতে চাও, তাহলে যাও। আমাকে বলছ কেন?'

এণাক্ষী বলল, 'তোমাকে বলব না? ঠিক তো? তুমি চাও আমি যাব না। সরাসরি বলে দিলেই পারো!'

অরিত্র বলল, 'আমার তো তোমার চালচলন কোনটাই ভালো লাগে না। কোনটা কোনটা বলতে হবে? আমি যদি বলি তুমি এই ছোটখাটো রোলের জন্য এসব জায়গায় যেও না, তুমি যাওয়া বন্ধ করবে?'

এণাক্ষী বলল, 'তোমাকে তো বলেছি। এগুলো পি-আরের জন্য ভীষণই দরকারি। আমি কি কারো সঙ্গে শুতে যাচ্ছি?'

অরিত্র এণাক্ষীর দিকে তাকাল। এণাক্ষী ভীষণ রেগে গেছে। নাকের নীচে ঘাম জমেছে। সে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইছি না এখন। আমার মিটিং আছে। প্রিপারেশন দরকার। তুমি যেখানে যেতে চাও, যেতে পারো।'

এণাক্ষী বলল, 'মানে? তুমি আমাকে বললে আমার চালচলন তোমার ভালো লাগে না। তারপর কী শুনতে চাইছ? আমি চুপ করে বসে থাকব? শান্তি চুক্তি করব?'

অরিত্র এণাক্ষীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখো, তুমি বলেছিলে অভিমন্যু তোমাকে দিয়ে ওর সিনেমায় একটা ছোট পার্ট করাতে চায়। ফাইন। আমি তখন অত ভাবিনি। রাজি হয়ে গেছিলাম। তারপর বললে তোমার পারফরম্যান্স দেখে ওরা একটা সিরিয়ালে নেবে। তাও মেনে নিলাম। ওদের সাকসেস পার্টিতে মাঝরাতে মাতাল হয়ে প্রোডিউসারকে জড়িয়ে ধরে ছবি তুলেছ, তাও বুঝলাম। কিন্তু আমি না, আর পারছি না। আমার সমস্যা হচ্ছে।'

এণাক্ষী চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওহ্, তোমার জ্বলছে, তাই তো? আনন্দ দেশাই আমাকে প্রমিসিং বলেছে বলে জ্বলছে?'

অরিত্র বলল, 'ওরকম প্রমিসিং বলে হোটেলের ঘরে নিয়ে যাওয়ার পরে এরাই আর তোমার মধ্যে প্রমিসিং কিছু খুঁজে পাবে না। মাইরি বলছি। মিলিয়ে নিও।'

এণাক্ষী কানে আঙুল দিল, 'ছি ছি ছি। ছিঃ। আমি তো তোমাকে অন্যরকম ভাবতাম। ভাবতাম তুমি উদার। শেষে তুমিও বাকিদের মতো? বউকে বেঁধে রাখতে চাও?'

অরিত্র বলল, 'ভালোবাসি বলে বললাম। চোখের সামনে আমার বউকে কেউ লাইনে নামিয়ে দেবে, দেখতে পারব? আমি তো দেখতে পাচ্ছি দিন দিন তুমি কী হয়ে যাচ্ছ? বলব না?'

এণাক্ষী অরিত্রর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, 'এনাফ। এই কথাগুলোর পরে আমার আর এ বাড়িতে থাকার তো কোনও মানেই হয় না। আমি আজই চলে যাব। ইন ফ্যাক্ট, এখনই চলে যাব।'

অরিত্র কিছু বলল না। ট্যাবে চোখ রাখল।

এণাক্ষী চিৎকার করল, 'কী হল? তোমার কিছু যায় আসে না?'

অরিত্র বলল, 'তুমি তোমার পথ বেছে নিয়েছ। আশা করি ভবিষ্যতে ভালো থাকবে। যদি এভাবেই চালাতে চাও, আমার সঙ্গে থাকবে, আবার কাজ পাওয়ার জন্য এর ওর তার সঙ্গে আজেবাজে জায়গায় পার্টি করবে, তাহলে আমি আপত্তি করব। চোখের সামনে তোমার ইয়ে মারা যাবে, সেটা আমি দেখতে পারব না। তুমি যেতে চাইলে যেতে পারো।'

এণাক্ষী রাগী চোখে কিছুক্ষণ অরিত্রর দিকে তাকিয়ে ব্যাগ নিয়ে এলো। আলমারি খুলে তার শাড়ি, গয়না ব্যাগে তুলতে শুরু করল। 'তুমি আজকে আমায় যা অপমান করলে, এটা আমার মনে থাকবে।'

অরিত্র বলল, 'থাকবে না। তুমি যা শুরু করেছ, তাতে এসব ছোটখাটো ব্যাপার মনে থাকবে না। উদার হওয়া এক ব্যাপার। চোখের সামনে সব কিছু দেখে চুপ থাকা আরেক। আমি পারলাম না উদার হতে। কী করব?'

এণাক্ষীর চোখ থেকে জল পড়ছিল। সে ব্যাগে সব জিনিস ভরে ঠিক করে ব্যাগ গোছাতে পারছিল না। অরিত্র বলল, 'তুমি এখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে চলে যাও। ঠিকানা দিও কার বাড়িতে উঠেছ। তার বাড়িতে ব্যাগ পাঠিয়ে দেব? ফাইন?'

এণাক্ষী মেঝেয় বসে পড়ল। বলল, 'এরকম করে বলছ কেন?'

অরিত্র এণাক্ষীর দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না।

২১

ইদানীং বেশ গরম পড়েছে। ঘাম হয়। দিব্যেন্দুর অবশ্য সে কারণে ঘুমে কোনও অসুবিধা হয় না। ঘুমের ঘোরেই সে মাঝরাতে উঠে বাথরুমে যায়। এসে আবার শুয়ে পড়ে।

গরমটা বেশিই পড়েছিল। বেশি ঘাম হলে রুমাকে হাত পাখা দিয়ে হাওয়া করতে বলে। সিলিং ফ্যান চলবে, অন্যদিকে রুমা তাকে হাত পাখা দিয়ে সারারাত হাওয়া দিয়ে যাবে। রাতে রুমার আগেকার দিনের পাঙ্খাবরদারদের মতো কাজ থাকে।

ঘুমের ঘোরেই দিব্যেন্দু ডাকল, 'হাওয়া দে।'

সাধারণত অন্যান্য দিন এটুকু বললেই হাওয়া দেওয়া শুরু হয়ে যায়। হাওয়া না পেয়ে দিব্যেন্দু বিরক্তিসহকারে হাত দিয়ে রুমাকে ঠেলতে গেল, 'কীরে মাগী, হাওয়া দে...'

কিন্তু লাভ হল না। তার হাত হাওয়ায় ধাক্কা মারল।

দিব্যেন্দুর মাথায় রক্ত উঠে গেল, 'কীরে, তোকে ডাকছি তুই সাড়া দিচ্ছিস না যে?' বলে উঠে বসে দেখল তার পাশে রুমা নেই।

দিব্যেন্দু খাট থেকে নেমে বাথরুমে গেল। দরজা খুলে দেখল রুমা নেই। অবাক হল সে। তাহলে কি ঠাকুরঘরে? এত রাতে?

ঠাকুরঘরের দরজা ঠেলে দেখল, নাহ্। রুমা নেই।

সে চিৎকার শুরু করল, 'রুমা! অ্যাই রুমা!'

রুমার বাবা-মার ঘুম ভেঙে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল তারা। রুমার মা ভীত গলায় বলল, 'কী হল বাবা?'

দিব্যেন্দু বলল, 'রুমা কোথায়? আপনাদের ঘরে?'

রুমার মা বলল, 'না তো! আমাদের ঘরে নেই তো!'

দিব্যেন্দু চোখ ছোট ছোট করে বলল, 'সত্যি করে বলুন। যদি আপনাদের ঘরে খুঁজে পাই, তাহলে কিন্তু কপালে দুঃখ আছে।'

রুমার মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'তুমিই দেখে এসো বাবা।'

দিব্যেন্দু কঠিন চোখে রুমার বাবা-মার দিকে তাকিয়ে ওদের ঘরে গেল। না রুমা নেই।

বসার ঘরেও নেই। এবার দিব্যেন্দু দৌড়ে বাইরের ঘরের দরজার কাছে গেল। দরজা খোলা...রাস্তায় টিউবের আলো জ্বলছে।

দিব্যেন্দু কোমরে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। রুমার মা-বাবা বাইরের ঘরে এলো। রুমার মা ভয়ার্ত গলায় বলল, 'কী হল বাবা?' দিব্যেন্দু নিজের দু'গালে চড় মারতে শুরু করল, 'কী হল? কী হবে? আমি যা

ভাবছিলাম তাই হয়েছে! মেয়ে পালিয়েছে! পালিয়েছে আপনাদের মেয়ে! আমি জানতাম, আমি ঠিক জানতাম, কারো না কারো সঙ্গে কিছু একটা চলছে। বলছি না...আমি ঠিক জানতাম। দেখেছেন? আমি যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই হয়েছে। আপনাদের মেয়ে পালিয়েছে। আমার সোনার কানের দুল, আট হাজার টাকা দাম, শালা ওটাও নিয়ে গেছে।'

রুমার মা কেঁদে উঠল। রুমার বাবা বলল, 'তুমি কী জানো? মানে কারো সঙ্গে কিছু ছিল নাকি?'

দিব্যেন্দু দুজনের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বলল, 'জানবো? আমি জেনে কী করব? ঘুমিয়ে পড়ুন। আবার কী? ঘুমিয়ে পড়ুন...না। ঘুমিয়ে কী করবেন? আপনার মেয়ের বিয়ে হয়েছিল এ বাড়িতে। সেই পালিয়েছে। এ বাড়িতে তো আপনাদের জায়গা হবে না। বেরিয়ে যান।'

রুমার মা কাঁদতে-কাঁদতেই হাঁ করে জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেরিয়ে যাব?'

দিব্যেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, ব্যাগ কোথায় আপনাদের? দাঁড়ান, এখনই ব্যাগ দিচ্ছি।'

দাপাতে দাপাতে দিব্যেন্দু ঘরের ভেতরে গেল। রুমার বাবা মা-র ব্যাগ টানতে টানতে বাড়ির বাইরে এনে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলল, 'এই তো, এই যে ব্যাগ। যান, ফুটে যান। এখন ক'টা বাজে? রাত দুটো তো? রাতে রাস্তায় থাকুন, সকালে বেরিয়ে যাবেন।'

রুমার মা বলল, 'বাবা, মাথাটা ঠান্ডা কর। তোমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। তুমি জল খাও।'

দিব্যেন্দু চেঁচিয়ে উঠল, 'এই খানকি মাগী, আমি কী খাব তুই শিখিয়ে দিবি? তুই শেখাবি? তুই খানকি, তোর চোদ্দগুষ্টি খানকি, বেরো, ফোট এখান থেকে।'

দিব্যেন্দুর চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা বেরিয়ে এল।

রুমার বাবা খালি গায়ে লুঙ্গি পরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। দিব্যেন্দু ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল।

২২

'তুমুল ঝগড়া পছন্দ কর না তুমি? করো, আমার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করো। তুমি কী চাও সেটা বলো।'

এণাক্ষী বলল।

তার মাথা দপ দপ করছে। শরীর খারাপ লাগছে।

অরিত্র তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফালতু ঝগড়া করে সময় নষ্ট করার থেকে ভালো আমরা কথাই আর বললাম না। তুমি যেটা করতে চাও, যেভাবে করতে চাও, সেটা করো।'

এণাক্ষী বলল, 'আমি চলে গেলে তুমি বাধা দেবে না?'

অরিত্র মাথা নাড়ল, 'না। একদিন না একদিন তুমি যেতেই। আমি জানতাম।'

এণাক্ষী রেগে গেল, 'তুমি জানতে? তোমার জন্য আমার এত স্যাক্রিফাইস, এত সব কিছু, সব মিনিংলেস হয়ে গেল? তুমি নিজে তো জীবনে কিছু করতে পারলে না, আমি করছি, সুযোগ পাচ্ছি দেখে তুমি রেগে যাচ্ছ? হিংসে করছ? এত ইগো তোমার?'

অরিত্র বলল, 'তুমি তাই মনে করলে তাই। তুমি যেটা ভাববে, ঠিক তাই। শুধু এটুকু বলে রাখি, তোমার সঙ্গে কথা বলার, তোমার সঙ্গে দিন-রাত ঝগড়া করার, আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।'

এণাক্ষী বলল, 'ও। আমাকে ঘেন্না করছ, তাই তো?'

অরিত্র হাসল, 'এখন করছি না। কিন্তু যে পথে এগোচ্ছ, খুব শিগগিরি ঘেন্না করার মতো জায়গায় যেতে হবে।'

এণাক্ষী কপাল চেপে কিছুক্ষণ বসে রইল। ফ্যানটা চলছে একঘেয়ে সুরে। জানলা দিয়ে রাস্তার গাড়ির শব্দ আসছে।

সে এবার উঠে যতটা সম্ভব ঠান্ডা মাথায় তার ব্যাগ গুছিয়ে নিল। ক্যাব পাওয়া যাচ্ছে এখনও। বুক করে নিল। অরিত্র টিভি চালিয়েছে। তার দিকে তাকাচ্ছেও না। এণাক্ষী আলমারির চাবিগুলো টেবিলের ওপর রেখে ব্যাগ ঠেলতে ঠেলতে বেরোল।

বেরোনোর মুখে অরিত্র বলল, ‘প্রোটেকশন ইউজ করে নিও। যার তার সঙ্গে শুয়ে পড়াই যায়, তবে আজেবাজে অনেক রোগ হতে পারে। সেটা দেখে নিও।’

এণাক্ষী দাঁড়িয়ে পড়ল, ‘তোমারটা তো ছোট। ওইটুকু জিনিস নিয়ে বড় বড় কথা বোলো না। মানায় না।’

অরিত্র বলল, ‘হ্যাঁ। এখন বড় পাবে। তার সন্ধানেই তো যাচ্ছ। মুখে পেছনে কানে নাকে, যেখানে যেখানে আছে, সবখানে গুঁজে বসে থেকো।’

এণাক্ষীর কান মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। সে আর দাঁড়াল না। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে লিফটে এল। দীপ্যমানকে ফোন করতে হবে। এক রাতের জন্য অন্তত একটা ঘর লাগবে। তার বাড়ি শিলিগুড়িতে। এত রাতে কী করে যাবে? আরেকটা কাজ করলেও হয়। সে তো ঘর থেকে বেরিয়েই এসেছে।

অরিত্র যে পার্টিতে যেতে বারণ করেছিল, সেখানে গেলেই হয়। সেটাই ভালো।

ক্যাব এসে গেছিল। সে পার্টির হোটেলটা ড্রপ লোকেশন দিল।

ক্যাবে উঠে বসে তার ব্যালকনিটা দেখল একবার। ওই তো, তার নিজের যত্ন করে লাগানো টবগুলো, দিব্যি দেখা যাচ্ছে। অরিত্র তো একবার ব্যালকনিতে আসতে পারত!

ঘরের বাইরে রাতের কলকাতা অন্যরকম। ঘরের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার বাইরে একটা শহর, যেখানে সবাই তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে। সবাই তাকে ছিঁড়ে খেতে চায়। অরিত্র তো ওই পার্টিগুলোতে ছিল। ওর থাকা আর না থাকায় অনেকখানি তফাত। এখন অরিত্র নেই। সে একা যাচ্ছে। কী করবে সে?

হোটেলের বাইরে তাকে নামিয়ে ক্যাব চলে গেল। এণাক্ষী ব্যাগটা নিয়েই হোটেলের ভেতর ঢুকল।

সুবীর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। এণাক্ষীকে দেখে বলল, ‘একী ম্যাডাম? আপনি ব্যাগ নিয়ে? কোন জায়গা থেকে এলেন?’

এণাক্ষী হাসার চেষ্টা করল, ‘একটু বাইরে গেছিলাম। ব্যাগটা কোথায় রাখা যায়?’

সুবীর বলল, ‘আমাকে দিন। আমি রাখছি। আপনি এন্ট্রি নিয়ে নিন।’

এণাক্ষীর হাত থেকে ব্যাগ নিল সুবীর। এণাক্ষী পার্টিতে ঢুকল। ঢিমে মিউজিক চলছে। একদিকে কয়েকজন মাতাল গল্প করছে। সবার এতক্ষণে দল বানানো হয়েই গেছে। সে কোন দলে গিয়ে বসবে? কাউকেই চিনতে পারছে না সে। সুবীরও বা কোথায় গেল?

ঢোকার পর থেকেই এণাক্ষীর একটা অস্বস্তি শুরু হল। মনে হচ্ছিল একজোড়া চোখ যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। লোকটা তার দিকেই এগিয়ে এল, ‘ম্যাম, ব্যাগ নিয়ে হোটেলে এলেন দেখলাম। দাম্পত্য কলহ?’

এণাক্ষী লোকটার দিকে তাকাল। চিনতে পারল না। দামি স্যুট। দামি চশমা। খুবই হ্যান্ডসাম, যেন চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী একজন লোক। সে বলল, ‘আপনি...’

‘যোগেন্দ্র শর্মা।’ লোকটা হাত এগোল।

এণাক্ষী লোকটার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল।

যোগেন্দ্র বলল, ‘নতুন ইনভেস্টর। ডুবে যাওয়া ইন্ডাস্ট্রি বাঁচাতে এসেছি বলতে পারেন। আপনি বললেন না, ব্যাগ নিয়ে এসেছেন কেন? বসুন না।’

যোগেন্দ্র সোফায় বসাল তাকে যত্ন করে। ড্রিঙ্ক দিল।

এণাক্ষী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ‘ওই, বুঝতেই পারছেন, মিডল ক্লাস ফ্যামিলি ক্রাইসিস। কী আর বলব।’ একবারে সে হাতের গ্লাসটা শেষ করে দিল।

যোগেন্দ্র জিভে চুকচুক শব্দ করে বলল, ‘এটাই তো প্রবলেম ম্যাডাম। বাঙালির মিডল এজ মেন্টালিটি। সব জায়গায় একই রকম।’

এণাক্ষী চারদিকে তাকাল, বলল, ‘আচ্ছা, আমি এখানে কাউকেই চিনতে পারছি না কেন?’

যোগেন্দ্র বলল, ‘আপনি বোধহয় ভুল রুমে ঢুকেছেন। এটা আরেকটা পার্টি।’ এণাক্ষী অবাক হয়ে যোগেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মানে? এ বাবা। তাহলে আমি...’

উঠতে গেল সে। মাথাটা ঘুরে গেল।

যোগেন্দ্র ধরে নিল তাকে।

এণাক্ষীর চারপাশটা কেমন ঝাপসা হয়ে গেল।

২৩

অরিত্রর সমস্যা হল, সে বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না। ভীষণ রাগ করবে, তুমুল চিৎকার করবে, ঝগড়া করবে, বিলো দ্য বেল্ট আঘাত করবে, তারপর এক সময় তার রাগ কমে আসবে। তখন লজ্জা লাগবে।

রাত এগারোটা নাগাদ তার মনে হল এণাক্ষীকে একা ছাড়া ঠিক হয়নি। মেয়েটা একা একা চলে গেল। খারাপ লাগছিল। ফোন করল। ফোন অফ বলছে। অরিত্র তৈরি হয়ে নিল। এণাক্ষী কোন হোটেলে আছে সে জানে। পার্কিং-এ এসে গাড়ি স্টার্ট দিল সে।

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে মাথায়। এটুকু সে নিজেও জানে এণাক্ষী খারাপ কিছু করার মেয়ে না। কিন্তু কথা বলার সময় কখন যে সবরকম সভ্যতা ভদ্রতা ভুলে যায়, নিজেও জানে না। যখন বুঝতে পারে, তখন দেরি হয়ে যায়।

এণাক্ষী এত দিন তার সঙ্গে ছিল, এটাই অনেক। অন্য কেউ হলে তাও থাকতো না। সবাই তার মতো অসভ্য মানুষকে সহ্য করে না।

রাস্তা ফাঁকাই আছে। গাড়ি হোটেলের পার্কিং-এ রেখে অরিত্র রিসেপশনে ঢুকে দেখল সুবীর পায়চারি করছে। অরিত্র সুবীরের দিকে এগিয়ে গিয়ে অপ্রস্তুত গলায় বলল, ‘এণাক্ষীকে ডেকে দেবে? ফোনে পাচ্ছি না।’

সুবীর বিহ্বল কণ্ঠে বলল, ‘আরে, কী বলি তোমায়, এখানে আসার সময় একটা বড় ব্যাগ নিয়ে এসেছিল। আমাকে বলল রেখে দিতে। আমি ব্যাগ রেখে আসার পর থেকে ওকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমিও ফোন করেছি, ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না।’

অরিত্র অবাক হল, ‘মানে? পাওয়া যাচ্ছে না মানে কী?’

সুবীর বলল, ‘চল। তুমি ভেতরে গিয়ে দেখো।’

অরিত্রকে নিয়ে সুবীর ব্যাঙ্কোয়েটে গেল। ঠিকই। কোথাও এণাক্ষী নেই।

অরিত্র কয়েক সেকেন্ড মাথা নিচু করে সুবীরকে বলল, ‘হোটেলে কোনও রুমে যায়নি তো?’

সুবীর বলল, ‘এসব কী বলছ তুমি? ও তোমার ওয়াইফ। ওর নামে এসব বলছ?’

অরিত্র লজ্জিত হয়ে বলল, ‘আমি বলছি না। আমি বোঝার চেষ্টা করছি ও অন্য কোথাও গেছে নাকি।’

সুবীর বলল, 'আরে, তা বলে এরকম বোল না। এণাক্ষী খুবই ডিসেন্ট মেয়ে। তুমি তো ওর সঙ্গে অনেক পার্টিতে গেছ, কখনও মনে হয়েছে ও এরকম কিছু করতে পারে।'

অরিত্র সুবীরের হাত ধরে বলল, 'প্লিজ কিছু মনে কোরো না। আমি কী করব বুঝতে না পেরে তোমাকে এভাবে বলে ফেলেছি। একটু দেখো না ও কোথায় গেছে।'

সুবীর বলল, 'লনে দেখি, পুলে, গেমস কর্নারে, সবক'টা জায়গাতেই খুঁজি চল।'

তারা সবখানেই খুঁজল। এণাক্ষীকে কোথাও পাওয়া গেল না।

সুবীর চিন্তিত গলায় বলল, 'আরেকটা ব্যাপার হতে পারে। পাশের হলে আরেকটা পার্টি ছিল। ওটায় ঢুকে যেতে পারে।'

অরিত্র বলল, 'চল। তাই চল।'

দুজনে বেরিয়ে হোটেলের অন্য পার্টি রুমের এন্ট্রান্সে গেল। দুজন বাউন্সার দাঁড়িয়ে ছিল। সুবীর বলল, 'এক্সকিউজ মি, আমাদের এক পরিচিত সম্ভবত আপনাদের পার্টিতে ভুল করে ঢুকে গেছে। একটু দেখবেন? বা আমরা কি ভেতরে ঢুকতে পারি?'

একজন বলল, 'দেখছি।'

ভেতরে ঢুকে গেল সে। কিছুক্ষণ পর বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, 'না। এখানে আপনি যে নাম বলেছেন, সে নামে কেউ নেই।'

সুবীর বলল, 'আমাদের একবার ঢুকতে দেওয়া যাবে?'

দুজনেই মাথা নাড়ল, 'না। এটা হাই প্রোফাইল জোন। আন অথরাইজড কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

অরিত্র চিৎকার করে উঠল, 'কী বলছেন আপনি? একজনকে খুঁজে পাচ্ছি না আর আপনি আন অথরাইজড মাড়াচ্ছেন?'

সুবীর অরিত্রর হাত ধরল, 'প্লিজ প্লিজ। শোন অরিত্র। রাগারাগি কোরো না। আমার সঙ্গে এসো। আমি কথা বলছি। সিসিটিভি ফুটেজ আছে। সেখান থেকেই দেখে নেওয়া যাবে।'

অরিত্র বলল, 'সেটা তুমি এতক্ষণ দেখোনি কেন?'

সুবীর বলল, 'আরে, আমার এত গেস্টকে সামলাতে হচ্ছে। মাথাতেই আসেনি।'

অরিত্র বলল, 'চলো। ব্যবস্থা করো। নইলে পুলিশকে ডাকতে হবে। একীরে বাবা, তোমাদের কোনও দায়িত্ব নেই? ফোনটা অবধি অফ।'

সুবীর দাঁড়িয়ে পড়ল, 'তোমার ওয়াইফ তো মাইনর না অরিত্র, তাই না? তাছাড়া সে ব্যাগ নিয়ে কেন এসেছিল, সেটাও তো জানি না। আমাকে সময় দাও। আমি ফুটেজ দেখার ব্যবস্থা করছি।'

অরিত্র রাগী চোখে সুবীরের দিকে তাকিয়ে রইল।

২৪

'পালাতে পারলেন তাহলে?'

লোকটা গাড়ি চালাচ্ছে। রুমা পেছনের সিটে বসেছে।

লোকটার মুখ ঠিক করে দেখা যাচ্ছে না। কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা।

রুমা বলল, 'হ্যাঁ। পেরেছি। বাড়িতে খুব অশান্তি হবে।'

'তা তো হবেই। তারপরে ভুলেও যাবে।'

রুমা মাথা নিচু করল। ঠিকই তো। তাকে মনে রাখবে কেন? সে কী ছিল? একটা চাকর ছাড়া?

'আমি কোথায় যাচ্ছি?' সে জিগ্যেস করল।

লোকটা বলল, 'আপনি যেমন বললেন, আপনাকে যা জ্বালাতন করেছে, তাতে সাত-আট দিন একটা নিরাপদ আস্তানায় বিশ্রাম করুন। তারপর না হয় দেখা যাবে।'

রুমা বলল, 'এমনি এমনি বিশ্রাম করব?'

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ। এমনি এমনি। কিচ্ছু করতে হবে না। খাবেন, আর ঘুমোবেন।'

'তারপর? তারপর আমায় কী করতে হবে?'

লোকটা বলল, 'তারপর দেখব আপনাকে দিয়ে কোনও কাজ করানো যায়। আসলে ব্যাপারটা কী বলুন তো, আমাদের কাজে মানুষের প্রয়োজন। এই যে ভারতবর্ষ, এই দেশটার সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ কী জানেন? মানুষ। অথচ আমরা এই অ্যাডভান্টেজটাই নিতে পারছি না। উল্টে সেটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয়ে গেল। কত ছোট দেশ, যার জনসংখ্যা আমাদের সিকিভাগেরও কম, আমাদের শাসন করে চলে গেল। আমরা গোলামি ছাড়া কিছু শিখলাম না। এটা কি ঠিক হল? আচ্ছা, আপনার কি ভয় লাগছে?'

লোকটার কথা বলার ক্ষমতা আকর্ষণীয়। রুমার একটুও ভয় লাগছে না। আনন্দ লাগছে। স্কুল ছুটি হবার পর ছোটবেলায় যেমন আনন্দ লাগত, তেমন আনন্দ লাগছে।

সেটাই বলল সে, 'না, ভয় লাগছে না।'

লোকটা বলল, 'দুর্ভাগ্যজনক। একটা অদ্ভুত ব্যাপার শুনুন। আমি যতজনকে এভাবে নিয়ে এসেছি আমাদের কাছে, তাদের নব্বই শতাংশ মহিলাই এই উত্তর দিয়েছেন। তাদের ভয় লাগছে না। মানুষ কতটা যন্ত্রণায় থাকলে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনের সঙ্গে ঘর ছাড়ার পরেও ভয় পায় না।'

রুমা বলল, 'আমাকে আপনি প্রত্যুষদার কাছে নিয়ে যেতে পারবেন?'

লোকটা বলল, 'আমি খোঁজ নিয়েছি। টেলিকম কোম্পানিতে দেওয়া কাগজপত্র থেকেই খোঁজ নিয়েছি। আপনি যাকে খুঁজছেন, তার কোনও হদিশ এখনও পাওয়া যায়নি। পেলেই আপনাকে জানাব।

রুমা কিছু বলল না। লোকটা বলল, 'আপনার সিটের পাশে কেক রাখা আছে। খেতে পারেন। ভালো লাগবে। এত ভালো কেক আমি অনেকদিন খাইনি।'

রুমা বলল, 'কেক খাব না। আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারবেন?'

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, আমার সিটের পেছনের পকেটে একটা ছোট জলের বোতল আছে।'

রুমা বোতলটা নিয়ে অনেকটা জল খেয়ে নিল।

রাতের রাস্তায় কেমন মসৃণভাবে গাড়িটা চলছে। কত দাম হবে গাড়িটার কে জানে।

লোকটা গান চালিয়েছে। ভারি সুন্দর একটা ইংরেজি গান। গানটা বুঝছে না সে। অথচ শুনতে ভালো লাগছে। লোকটাও সুর দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

দিব্যেন্দু গান শুনত না। কেমন অদ্ভুত টাইপের বেরসিক একটা লোক ছিল। গান ভালোবাসে না যারা তারা মানুষ খুন করতে পারে। সে গান গাইত। দিব্যেন্দু শুনে নাক কুঁচকে বলেছিল, ওসব পোষায় না। কী অদ্ভুত তাচ্ছিল্য। কোথাও কোনও অনুষ্ঠানে কেউ গান গাইলে দিব্যেন্দু কথা বলে যেত। এরকম অনেকে আছে। কেউ গান গাইলে কথা বলে। রুমার প্রথম প্রথম খারাপ লাগত। তারপর সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়গুলিও এমনভাবে যুক্ত হতে শুরু করল, যে আর অন্য কোনও অনুভূতিও আসত না। দেখা গেল সে গান শুনছে, দিব্যেন্দু কানে কানে বলে দিল, 'কী রে খানকি মাগী, ভালো লাগছে, না? মনে মনে ভাবছিস লোকটার সঙ্গে শুলে কেমন হয়? তাই না?'

লজ্জায় লাল হয়ে যেত সে। চারদিকে ভয়ে ভয়ে তাকাত, কেউ কিছু শুনছে না তো? মাটিতে মিশে গেছে কতবার। বেঁচে থাকাটাকেই শাস্তি ভেবে গেছে।

গাড়িতে গানটা কী অদ্ভুত ঘুমপাড়ানি। কতদিন পর এত আরাম লাগছে!

কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল, নিজেই জানে না...

২৫

'রুমা নেই। অফিস যেতে হবে। অফিস না গিয়ে কি ঘরে বসে বসে ছিঁড়ব নাকি?'

বিড়বিড় করতে লাগল দিব্যেন্দু। ঘুম থেকে উঠলে রুমা চা করে দেয়। রুমার বাবা-মাকে বের করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। অন্য কেউ হলে ঘুম আসত না। দিব্যেন্দু অন্য ধাতুতে গড়া। তার কিছু যায় আসে না।

ঘুম ভাঙার পর চিৎকার করল, 'রুমা।'

কেউ সাড়া দিল না। উঠে বিড়বিড় করতে শুরু করল।

বাইরে বেরিয়ে দেখল পাড়ার লোকজন দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। সে বিশেষ পাত্তা দিল না। রুমার বাবা-মা নিশ্চয়ই কাউকে নালিশ করেনি। ফার্স্ট ট্রেনে ফিরে গেছে। ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজল সে। বাথরুমে গিয়ে তৈরি হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আলমারি খুলে জামা-প্যান্ট বের করল।

রুমা গুছিয়ে রাখে বলে সব জামাকাপড় মেঝেতে ফেলল দিব্যেন্দু। ফিরলে রুমাকে সব গোছাতে হবে। রান্নাঘরে গিয়ে বাসন কোসন মেঝেতে ফেলে দিল। বসার ঘরে রুমা সোফার উপর কাপড় রেখেছিল। সব সরিয়ে দিয়ে ঘরের দিকে হিংস্রপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, 'আয় এবার। সব তোকে দিয়ে পরিষ্কার করাব। এলেই বুঝবি কেমন লাগে। বাঁচিয়ে রাখব না তোকে, কুপিয়ে মারব। আয় একবার।'

তৈরি হতে সময় লাগল। মোজা খুঁজে পাচ্ছিল না। আগের দিনের ফেলে রাখা মোজা পরেই বেরোতে হল। অন্যান্য দিন আটটা পঁচিশে বেরোয়। সাইকেলে উঠে ঝড়ের গতিতে স্টেশনের দিকে যেতে থাকে। এদিন একইভাবে বেরিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর তার মনে পড়ল তালা দিতে হবে। বাড়িতে কেউ নেই। আবার ফিরে তালা দিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেখল রুমার বাবা-মা দাঁড়িয়ে আছে। ওহ্। এরা তাহলে ফার্স্ট ট্রেনে ফিরে যায়নি। কোথায় গেছিল তাহলে? দিব্যেন্দু বেশি ভাবতে গেল না। তাকে দেখে দুজনেই সিঁটিয়ে গেল। দিব্যেন্দু জোর পায়ে ওদের কাছে গিয়ে বলল, 'কোথাকার কোন বেশ্যাকে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলি। নিশ্চয়ই বাবু পেয়ে গেছে একটা। ফ্যামিলিতে সবাই কী এরকমই?'

রুমার মা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কী আর বলবো বাবা তোমায়, তুমি সোনার টুকরো ছেলে। আমার মেয়েটাই খারাপ। কোথায় কী করে এসেছে আমি জানি না। যদি কোনও খোঁজ পাই, তোমায় জানাবো।'

ট্রেন ঢুকছিল। দিব্যেন্দু দুজনকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ট্রেনের দিকে দৌড়ল। রুমার বাবা-মা বিহ্বল চোখে দেখল দিব্যেন্দু ট্রেনে উঠে পড়েছে।

তাপসও একই সঙ্গে উঠল। বসার পরে বলল, 'শ্বশুর-শাশুড়ি না তোর? স্টেশনে ছাড়তে এসেছে নাকি। মাইরি বলছি, বাঙালদের জামাই আদরের তুলনা নেই।'

দিব্যেন্দু শান্ত গলায় বলল, 'আমার বউ পালিয়েছে।'

তাপস আর কামরুল তার দিকে হাঁ করে তাকাল।

দিব্যেন্দু হড়বড় করে বলে চলল, 'প্রেম ছিল কোথাও একটা। প্রেম করত মনে হয়। সকালে পালিয়ে গেছে। শ্বশুর-শাশুড়ি এসেছিল। ওদের রাতে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তারপর থেকে কোথায় গেছিল জানি না। স্টেশনে এসে দেখি, এখানেই বসে আছে।'

কামরুল বলল, 'ধুস, ইয়ার্কি মারছ।'

দিব্যেন্দু বলল, 'তাস দাও। ইয়ার্কি মারার কিছু নেই এখানে। বউ পালিয়ে গেছে বলে ইয়ার্কি মারব নাকি? এটা কি ঘটিদের মাংস রান্না? অকারণে চিনি দিয়ে দেব?'

তাপস রাগল না। বলল, 'এ ভাই, তুই অফিস যাচ্ছিস? থানায় কমপ্লেইন করিসনি?'

ট্রেন চলছে বনবাদাড় পেরিয়ে। একটা ছোট খাল পেরোল। কামরায় প্রবল ভিড়ের মধ্যে এক আমলকি বিক্রেতা উঠেছে। বিভিন্ন গলার স্বরে আমলকির গুণাগুণ বোঝাচ্ছে।

দিব্যেন্দু বলল, 'বউ পালিয়েছে, তাতে কমপ্লেইন করার কী হল? তোমার বউ পালায়নি কখনও?'

তাপস বলল, 'ওরে, এভাবে পালালে মেয়েরা আর ফেরে না।'

দিব্যেন্দু রাগী চোখে তাপসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক ফিরবে। চিন্তার কিছু নেই।'

তাপস বলল, 'ছি ছি ছি...কী লজ্জার। তুই বুঝতে পারছিস কী লজ্জার?'

দিব্যেন্দু তাপসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লজ্জার না? লজ্জার? দেখাচ্ছি।'

তাসগুলো শাফল করছিল কামরুল। তার হাত থেকে সব তাস নিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিল দিব্যেন্দু। উঠে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করতে লাগল, 'লজ্জার? শালা লজ্জার? লজ্জার কী আছে?'

লোকজনকে ঠেলতে শুরু করে একটু একটু করে এগোতে শুরু করল সে। তাপস ডাকল, 'এই দিব্যেন্দু, কী করছিস? কোথায় যাচ্ছিস?'

চলন্ত ট্রেনে দিব্যেন্দু সবাইকে ঠেলে ঠুলে দরজার কাছে গিয়ে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল। তাপস আর কামরুল শক্ত করে ধরে ফেলল। দিব্যেন্দু একই কথা বিড় বিড় করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল, 'লজ্জার? লজ্জার কী আছে? লজ্জার কিছু নেই। বউ পালিয়েছে তো কী হয়েছে? পালাতেই পারে। লজ্জার কিছু নেই। কিছু নেই লজ্জার...'

২৬

কেমন শান্ত একটা বিছানা। এসি চলছে একবারে কম তাপমাত্রায়।

ঠান্ডা হয়ে আছে চারদিক।

কতদিন পরে এত ভালো ঘুম হল। কত যুগ সে ঘুমোয়নি। রাতে এমনিতেও ঘুম হতো না। কোনও রাতে তাকে দিব্যেন্দুর পাঞ্চাপুলার হতে হয়েছে। কোনও রাতে একটু ঘুমিয়েছে হয়তো, পিঠে লাথি খেয়ে উঠে পড়তে হয়েছে।

তীব্র ব্যথা থাকত সারা শরীরে।

তার পরিবর্তে এত সুন্দর ঘুম, ভাবাই যায় না। বেশ কয়েকবার উঠতে গিয়েও ওঠেনি সে। অনেকক্ষণ পরে যখন উঠে বসল, কাচের কাছে গিয়ে দেখল, জানলার বাইরে একটা সুন্দর শহর দেখা যাচ্ছে। কোন শহর এটা? কলকাতা?

রুমের ফোন বাজছে। রুমা ফোন ধরল, 'হ্যালো।'

'ঘুম হল? নাকি আরেকটু ঘুমোবেন?'

রুমা হাসল, 'জানি না। অনেক দিন পরে ভালো ঘুমোলাম।'

'খুব ভালো। খিদে পেয়েছে?'

খিদের কথায় টের পেল, সে বুঝতে পারেনি এতক্ষণ। পেটটা সত্যিই খালি লাগছে। বলল, 'হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন। খিদে পেয়েছে।'

'আপনি প্রায় চোদ্দো ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন। খিদে তো পাবেই। দরজা খুলে বেরিয়ে আসুন। করিডোরটা যেখানে শেষ হবে, সেখানেই খাবার ব্যবস্থা আছে।'

ফোন রেখে রুমা ঘর থেকে বেরোল। একটা লম্বা করিডোর। হাঁটতে শুরু করল সে। লোকটা ঠিকই বলেছে। একটা ঘরে চারটে টেবিল পাতা। একটা টেবিলে একজন মেয়ে বসে আছে। রুমা ঘরে ঢুকতে

মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা কোন জায়গা?'

রুমা বলল, 'জানি না তো। আপনি জানেন?'

মেয়েটা মাথা নাড়ল, 'না। জানি না। ঘুম ভাঙার পর আমাকে এখানে খেতে আসতে বলা হল।'

মেয়েটা হাত তুলে ব্যুফে টেবল দেখাল। বিভিন্ন রকম খাবার সাজানো আছে। ভাত, মাংস, মাছ। রুমা সেদিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'আপনি খাবেন না?'

মেয়েটা বিমর্ষকণ্ঠে বলল, 'আমার বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে। খুব ঝগড়া করে বেরিয়েছি। তবু...'

রুমা বলল, 'কী নাম আপনার?'

মেয়েটা বলল, 'এণাক্ষী।'

রুমা বলল, 'খেয়ে নিন। আপনি বলুন, কী কী আনবো, নিয়ে আসছি।'

এণাক্ষী বিহ্বল চোখে রুমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

রুমা একটা প্লেটে ভাত, ডাল, একটু পনির নিয়ে এসে এণাক্ষীর সামনে রেখে বলল, 'খেয়ে নিন। খালি পেটে থাকা ঠিক না। আমারও খুব খিদে পেয়েছে। বাড়িতে থাকলে এত খিদে পেত না। কিন্তু এখানে খুব খিদে পেয়েছে। আমার মনে হচ্ছে আমি কোথাও বেড়াতে এসেছি। খুব মজা লাগছে।'

এণাক্ষী অবাক চোখে রুমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার ভয় লাগছে না? এরা তো আমাদের আইসিসের কাছে বেচে দিতে পারে? আরও ভয়ংকর কত কিছু করতে পারে। তাও ভয় লাগছে না?'

রুমা ভাত ডাল নিয়ে এসে এণাক্ষীর সামনে বসে খেতে শুরু করল, 'না। লাগছে না। আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখান থেকে বেরোলে সব নরকই ভালো লাগে।'

এণাক্ষী মাথা নিচু করল, 'আমার বর হঠাৎ পাল্টে গেল। আমাকে যা ইচ্ছে বলতে শুরু করল। কিন্তু কোনওদিন আমার গায়ে হাত তোলেনি। কত কিছু কিনে দিত!'

ডালটা ভারি সুন্দর হয়েছে। রুমা আরও ভাত আর ডাল নিয়ে এসে বসল, 'তাহলে আপনি ওদের কথায় রাজি হয়ে চলে এলেন কেন?'

এণাক্ষী বলল, 'আমি রাজি হইনি কিছুতেই। কোন এক পার্টিতে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি এদের ছাড়ব না। আমি বাড়ি যাব। তখন কত চিৎকার করলাম, কিছুতেই শুনল না। শুধু বলে গেল খেয়ে নিন। খালি পেটে থাকবেন না। আশ্চর্য!'

রুমা খেতে খেতে বলল, 'আমার বর আমাকে গল্প করত। ইসলামিক স্টেটে মেয়েরা কী ভয়াবহ অবস্থায় থাকে। তার তুলনায় নাকি আমি ভালো আছি। আমার এখন কোনও ভয়ই লাগছে না। বিশ্বাস করুন।'

এণাক্ষী বলল, 'আপনার বরের জন্য মন খারাপ লাগছে না?'

রুমা হাসি মুখে বলল, 'একেবারে না।'

এণাক্ষী মনমরা হয়ে বলল, 'আমার লাগছে। লোকটা কেমন পাল্টে গেল।'

রুমা বলল, 'খেয়ে নিন না। তারপর মন খারাপ করবেন না হয়।'

এণাক্ষী খেল না। চুপ করে বসে রইল।

২৭

একা একা দিন কাটানো বড়ই বিরক্তিকর। বাপিদার কড়া নির্দেশ আছে, বাড়ির ভেতরে কাউকে ঢোকানো যাবে না। এদিকে পূর্ণর দিন কাটতে চায় না। টিভিতে কী আর দেখবে? চ্যানেল বেশিবার পাল্টাতে গেলেও ভয় লাগে, পাছে রিমোট খারাপ হয়ে যায়। তখন আবার বাপিদা বকা ঝকা করবে।

সিসিটিভির ছেলেগুলো এখনও আসেনি। বাপিদা বলেছে এবার অন্য জায়গা থেকে ছেলেপিলে আসবে।

ছাদে বসে কিছুক্ষণ পাড়ার লোকজনকে দেখল পূর্ণ। এখন গরম কাল। শীতের মতো কেউ আর নরম রোদে বসে থাকে না। সবাই গরমে ফ্যান বা এসি চালিয়ে ঘরে বসে থাকে। পূর্ণর গরম লাগে না। এসিও লাগে না। গরিবের এসি না চালানোই ভালো। যখন কাজ থাকবে না, তখন বড় কষ্ট হবে। বদ অভ্যাসগুলো মানুষকে শেষ করে দেয়।

ওই নাম্বারটা বাপিদাকে দেওয়ার পর থেকে আর ফোন বাজেনি। পূর্ণর ইচ্ছে হল একবার ওই মহিলার সঙ্গে কথা বলবে। বাপিদা নাম্বার নিয়ে কী করল, জানতে হবে। ফোন করল সে।

ফোন সুইচড অফ বলছে। ধুস।

পূর্ণর হঠাৎ ঠাকুরঘরের কথা মনে পড়ল। প্রথমে জিভ কাটল সে। ছি-ছি। লোকের বাড়িতে আবার উঁকি ঝুঁকি মারবে?

পরক্ষণে মনে হল, কী আছে? একবার দেখে আসাই যায়। দেখে আসার মধ্যে তো কোনও পাপ নেই। বাপিদার বাড়ির সব কিছুই সে দেখেছে। ঠাকুরঘরের আলমারিটা দেখলে কী হয়েছে?

পূর্ণ কিছুক্ষণ ছাদে পায়চারি করে ঠাকুরঘরে গেল। ড্রয়ার থেকে লুকনো চাবিটা বের করে আলমারি খুলল। বাপরে! এগুলো কী? কতগুলো ছোট ছোট বাক্স। কোনদিন দেখেওনি সে। আজব! বের করতে গিয়ে একবারে নীচের খোপে চোখ গেল। ওরে বাবা, কতগুলো টাকার বান্ডিল। এত টাকা রেখে গেছে? টাকাগুলো হাতে নিয়ে দেখল। ও হরি! এ তো দু'হাজার টাকার নোট। এগুলো তো সব বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। সেদিনই পানের দোকানে দাঁড়িয়ে খবর দেখছিল। বাপিদা জানে না? এ তো বলাও যাবে না। বললে জেনে যাবে সে আলমারি খুলেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে পূর্ণ একটা বান্ডিল বের করে রেখে দিল। এত সমুদ্র! এর থেকে একটা বান্ডিল না পাওয়া গেলে কী আর হবে? সুন্দর করে আলমারিটা বন্ধ করে চাবিটা আগের জায়গায় রেখে দিল সে।

দু'হাজার টাকার নোট! বাপরে! কতগুলো আছে এখানে? গুনতে শুরু করল পূর্ণ। একশোটা। একশোটা দু'হাজার টাকার নোট মানে? ওরে বাবা রে! দু'লাখ টাকা? এত টাকা কোনদিন সে একসঙ্গে দেখেনি। অথচ কেমন অবলীলায় বাপিদা রেখে দিয়েছে। এরাই হল বড়লোক। আর তার মতো লোকেরা সব ছোটলোক। এরা মালিকপক্ষ হবে না তো কে হবে?

ফোন বাজছিল। পূর্ণ দেখল, বাপিদা। সঙ্গে সঙ্গে ধরল, বাপিদা বিরক্ত গলায় বলল, 'তুমি আবার ওই নাম্বারে ফোন করছ কেন?'

পূর্ণ বলল, 'কোন নাম্বারে?'

বাপিদা বলল, 'ওই যে মেয়ের নাম্বারটা আমায় দিয়েছিলে?'

পূর্ণ অবাক গলায় বলল, 'সে কী? তুমি সেটা কী করে জানলে?'

বাপিদা বলল, 'ও জানা যায়। জার্মানিতে অনেকরকম ব্যবস্থা আছে। আমি জেনে যেতে পারি। তুমি অকারণ ওই নাম্বারটায় ফোন করছ।'

পূর্ণ ভয় পেল। বাপিদা বেশ রেগে গেছে। সে বলল, 'ঠিক আছে। আমি ফোন করব না আর। হাত পড়ে গেছিল।'

বাপিদা বলল, 'সে হাত পড়েছে না পা পড়েছে, আমার জানার দরকার নেই। তুমি আর ফোন করবে না।'

পূর্ণ বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা। আমি আর ফোন করব না।'

বাপিদা বলল, 'তুমি কোন ঘরে এখন?'

পূর্ণ বলল, 'ছাদে। আচ্ছা...'

টাকার কথাটা বলতে গিয়ে চেপে গেল পূর্ণ।

এণাক্ষী খুব কম খেল।

রুমা তার উল্টোটা। কতদিন পরে দিব্যেন্দুর চিন্তা না করে খেতে পারছে!

খাওয়া শেষ হবার পরে হলের কোণের বেসিনে মুখ ধুতে না ধুতেই শাড়ি পরিহিত এক মহিলা প্রবেশ করল।

এণাক্ষী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, 'আপনি আমাকে নিয়ে এসেছেন?'

মহিলাটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন, 'না। আমি আপনাকে নিয়ে আসিনি। আমি স্নিগ্ধা। আপনাদের মেন্টর বলতে পারেন।'

এণাক্ষী নাক মুখ কুঁচকে বলল, 'মেন্টর? এখানে কি কোনও গেম চলছে নাকি?'

স্নিগ্ধা হাসল, 'আপনারা দুজনেই খুব কঠিন একটা ফেজে ছিলেন। আপনাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে নিশ্চয়ই আপনারা বসে বসে খেতে চাইবেন না? আমাদের লক্ষ্য আপনাদের স্বনির্ভর করে তোলা। আপনারা রোজগার করতে পারবেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন। সেজন্যই আমি এখানে এসেছি।'

রুমা স্নিগ্ধার কথা কিছুই বুঝছিল না। এণাক্ষীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

এণাক্ষী বলল, 'না। কী করতে হবে আমাকে?'

স্নিগ্ধা হাসল, 'বিভিন্ন রকম কাজ আছে। আমরা কয়েকটা পরীক্ষা করব, সাইকোমেট্রিক টেস্ট হবে। এগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা সিদ্ধান্ত নেবো, আপনাদের কোন কাজে লাগানো হবে।'

এণাক্ষী রেগে গেল, 'আমি কারো কেনা গোলাম না। আমাকে অজ্ঞান করে, আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে আনা হয়েছে। আমাকে আটকে রাখলে ফল ভালো হবে না।'

স্নিগ্ধা ট্যাব বের করে কয়েক সেকেন্ড সেটা নাড়াচাড়া করে বলল, 'আপনার হাজব্যান্ড আপনাকে কাজ করতে দিতে চান না। আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। খুব ভালো করে জানেন আপনার বাড়ি থেকে আপনার ফিরে যাওয়াটা মেনে নেবে না। তাহলে আপনি এই সময়ে কী করতেন?'

এণাক্ষী বলল, 'দ্যাটস নান অফ ইয়োর বিজনেস। আমাকে ফেরানোর ব্যবস্থা করুন।'

স্নিগ্ধা কয়েক সেকেন্ড এণাক্ষীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে আপনি ট্রেনিং নিতে, আমাদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী নন?'

এণাক্ষী মাথা নাড়ল, 'না।'

স্নিগ্ধা বলল, 'বেশ। আপনি আপনার ঘরে চলে যান। আপনাকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

এণাক্ষী বলল, 'আমার একটা ফোন লাগবে।'

স্নিগ্ধা বলল, 'রুমে আপনার খাটের ওপরেই ফোন রাখা হয়েছে। আপনি ফোন করতে পারেন।'

এণাক্ষী 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্নিগ্ধা রুমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনিও কি ফিরতে চান?'

রুমা মাথা নাড়ল, 'একেবারেই না। আমি ফিরে যেতে আসিনি। কী করতে হবে আমাকে?'

স্নিগ্ধা বলল, 'আপনার মধ্যে বেশ কয়েকটা ন্যাচারাল ট্যালেন্ট আছে। আপনি কী করতে পারেন, আপনি নিজেই জানেন না।'

রুমা অবাক হল, 'কী করতে পারি?'

স্নিগ্ধা বলল, 'আপনি পুনর্জন্ম পেয়েছেন রুমা। কিন্তু আপনি কি আমরা যা বলবো, সেগুলো মেনে নিতে পারবেন?'

রুমা বলল, 'আমি তো জানি না কী করে বাকি জীবনটা চলবে। যিনি ফোন করেছিলেন, তার ভরসাতেই বাড়ি ছেড়ে এসেছিলাম। কী করতে চান বলুন।'

স্নিগ্ধা রুমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার পায়ে এখনও ক্ষত আছে। আপনি এখনও ঠিক করে হাঁটতে পারছেন না। আপনাকে কয়েকটা ওষুধ দেওয়া হয়েছে। আপনার রুমে রাখা হয়েছে। আপনি প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধগুলো খেতে পারবেন?'

রুমা বলল, 'হ্যাঁ।'

স্নিগ্ধা বলল, 'আপনি চাইলে আপনাকে সময়মতো মনে করিয়ে দেওয়া হবে।'

রুমা মুগ্ধ হল। এত যত্ন? ভাবা যাচ্ছে না! সে বলল, 'আমাকে একটু বলুন না আমাকে কী করতে হবে? খারাপ কোনও কাজ না তো?'

স্নিগ্ধা বলল, 'খারাপ কাজ বলতে কী বোঝেন?'

রুমা একটু না ভেবে বলল, 'শরীর বিক্রির ব্যবসা। আমি এই ভয়টাই পাচ্ছি। আপনারা কি এরকম কিছু করাবেন?'

স্নিগ্ধা হাসল, 'পৃথিবী এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে রুমা। শুধু মাত্র ওই আদিম ব্যবসাটা ছাড়াও অনেক কাজ আছে।'

রুমা বলল, 'কীরকম?'

স্নিগ্ধা বলল, 'সব একদিনে শিখে নেবেন?'

রুমা বলল, 'আমার টেনশনটা তো দূর করুন।'

স্নিগ্ধা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। এণাক্ষী এসে চিৎকার করে বলল, 'ফোন যাচ্ছে না। কী ফোন দিয়েছেন?'

২৯

সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে।

দিব্যেন্দু সাহেবের চেম্বারে গিয়ে নক করল।

'কাম ইন।'

দিব্যেন্দু ঘরে ঢুকতে সাহেব বলল, 'কী হয়েছে তোমার? শুনলাম ফ্যামিলি প্রবলেম?'

দিব্যেন্দু বলল, 'একটা প্রবলেম হয়েছে। আমার বউকে পাচ্ছি না। মনে হয় পালিয়ে গেছে।'

সাহেব চোখ কপালে তুলে বলল, 'পাচ্ছ না? কী করে করলে? আমি তো রোজ দেখতে চাই ঘুম থেকে উঠে যে আমার বউ নেই। কিন্তু পারছি কই?'

দিব্যেন্দু বুঝল না সাহেব ইয়ার্কি মারছে।

সে বলল, 'এমন কিছু কঠিন ব্যাপার না। মাঝে মাঝে মারবেন। ধরুন একদিন পায়ে হাতুড়ি মারলেন, একদিন গরম ইস্ত্রি হাতে লাগিয়ে দিলেন, মাঝে মাঝেই চড়-থাপ্পড় মারলেন...'

সাহেব হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'উফ্, তুমি নিজের দুঃসময়েও এরকম মজার কথা বলতে পারো, আই মাস্ট অ্যাডমিট, ইউ আর এ গুড স্পোর্ট।'

দিব্যেন্দু অবাক হয়ে সাহেবের দিকে তাকাল।

সাহেব বলল, ‘তুমি একটা কাজ কর, আজকের দিনটা অফিস করতে হবে না। আমি তোমাকে ফুল পেইড ছুটি দিচ্ছি। ঘুরে আস কোনও জায়গা থেকে। নাকি বাইরে ঘুরতে যাবে? আমি ব্যবস্থা করে দেব?’

দিব্যেন্দু বলল, ‘না স্যার। তার কোনও দরকার নেই।’

সাহেব বলল, ‘আলবাত দরকার আছে। একজন ইয়ং ম্যান এত ভেঙে পড়লে কী করে হবে? যাও, যাও। তোমায় ছুটি দিলাম। ঘুরে এসো। যেদিন খুশি জয়েন কর। আমি কিছু বলব না।’

সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে দিব্যেন্দু নিজের টেবিলে এল। সুদেব এসে পিঠ চাপড়ে দিল, ‘এ ভাই। কী হয়েছে?’

দিব্যেন্দু ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল, ‘কিছু না। একটু বেরোতে হবে।’

সুদেব বলল, ‘ডাউন লাগছে তোকে। একটা জায়গায় যাবি?’

দিব্যেন্দু সুদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুই তো জানিস আমার বউ...’

সুদেব বলল, ‘বউ? ক’টা বউ চাস?’

দিব্যেন্দু বলল, ‘কোথায়?’

সুদেব বলল, ‘আমার একজন আছে। চলে যা। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নাম্বার নে।’

দিব্যেন্দু নাম্বার নিয়ে বেরোল। অফিসের বাইরেই হলদে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। তার বলা ঠিকানা শুনে ট্যাক্সিওয়ালা ভিউয়িং মিরর দিয়ে তাকে দেখে নিল।

দিব্যেন্দু পাত্তা দিল না। মাথা কাজ করছে না। কেন যে সে সুইসাইড করতে গেছিল!

এ বছর বর্ষা নেই। ঘোর গ্রীষ্ম শহরটাকে রোদ যেন পুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে ঘাম। অফিসে এসির মধ্যে থাকলেই ভালো হতো।

ট্যাক্সিওয়ালা নামিয়ে দিয়ে গেল রাস্তার মোড়ে। দিব্যেন্দু সুদেবের দেওয়া নাম্বারে ফোন করল। ফোন রিং হয়ে গেল। কেউ ধরল না।

সুখেন চায়ের দোকানে বসে ছিল। দিব্যেন্দুকে ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থায় দেখে এগিয়ে এল, ‘কোথাও যাবেন নাকি স্যার?’

দিব্যেন্দু সুখেনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমায় অফিসের একজন বলল একজনের কাছে যেতে। সেখানে একটা কাজ ছিল আর কী।’

সুখেন চোখ ছোট করল, ‘কার কাছে বলুন তো? কী নাম?’

দিব্যেন্দু বলল, ‘শমিতা।’

সুখেন অবাক চোখে দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনারও ওখানে কাজ?’

দিব্যেন্দু বলল, ‘কেন? আর কার কার আছে ওখানে কাজ?’

সুখেন সামলে নিয়ে বলল, ‘আমার সঙ্গে আসুন। আপনি কি আমাকে টাকা দেবেন বাকিদের মতো?’

দিব্যেন্দু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ‘আমার টাকা বেশি নেই।’

সুখেন বলল, ‘ঠিক আছে। আসুন।’

সুখেন হাঁটতে শুরু করল। তার পেছন পেছন দিব্যেন্দু। কিছুটা যাবার পর একটা ঘরের দরজা দেখিয়ে বলল, ‘যান।’

দিব্যেন্দু বলল, ‘থ্যাংকস।’

সুখেন বলল, ‘লোকে পাঁচশো দেয়। আপনি পঞ্চাশ টাকা তো দিন।’

দিব্যেন্দু পকেট হাতড়ে একটা পাঁচ টাকার কয়েন বের করল। সুখেন সেটা নিয়ে বলল, ‘তাই দিন। চা খাওয়া যাবে একটা। কতরকম লোক আসছে আজকাল।’

সুখেন গেল না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

দিব্যেন্দু কলিং বেল টিপল। দরজা খুলল।

শমিতা দিব্যেন্দুকে দেখে বলল, ‘কী চাই?’

দিব্যেন্দু বলল, ‘আপনি কি শমিতা? সুদেব নাম্বার দিয়েছে। ফোন করেছিলাম। ধরছিলেন না।’

শমিতা দরজা ছেড়ে দিল, ‘আসুন।’

দিব্যেন্দু ঢুকে গেল। শমিতা সুখেনকে দেখে মুখ ঝামটা দিল, ‘কীরে? দাঁড়িয়ে আছিস কেন?’

সুখেন বলল, ‘আমি নিয়ে এলাম তো। কাট দিবি।’

শমিতা বলল, ‘ফোট। আমার লোক আছে। সেই পাঠিয়েছে।’

সুখেন হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

শমিতা দরজা বন্ধ করে দিল।

দিব্যেন্দু চারদিক দেখছে। কেমন তেল চিটচিটে জায়গাটা। তার ঘরের মতো না। শমিতা বলল, ‘কত টাকা?’

দিব্যেন্দু বলল, ‘পাঁচশো। বউ পাওয়া যাবে?’

শমিতা খিল খিল করে হেসে বলল, ‘এখানে সবাই বউ। যা, ওই ঘরটায় যা।’

একটা ঘর দেখিয়ে দিল শমিতা।

দিব্যেন্দু চারদিক দেখতে দেখতে ঘরটায় ঢুকল।

রুমার বয়সি একটা মেয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে সাজছে। তাকে দেখে বলল, ‘সকাল সকাল ইচ্ছে হল? হেবি রস তো তোর?’

দিব্যেন্দু পকেট থেকে হাতুড়িটা বের করে হাতে নিল।

এই মেয়েটা কি রুমার মতো হবে?

৩০

রাত দুটো।

নিউজ চ্যানেল চলছে। রেকর্ডেড প্রোগ্রাম দেখাচ্ছে।

টিভিতে ডিপার্টমেন্টের বদনাম হচ্ছে। তিলজলা থানার ওসি নীল বাগচী চা খাচ্ছিল। একজন বেশ চিৎকার করছেন। নীলের খারাপ লাগে না। সে মজা পায়। ভালো কথা শুনলেই বরং অবাক লাগে।

দরজা ঠেলে অরিত্র ঢুকল, ‘আমি বেশ কিছুক্ষণ বাইরে বসে আছি। একটু আর্জেন্ট ছিল।’

নীল বলল, ‘ওহ, হ্যাঁ, আমাকে বলেছিল। এক্সট্রিমলি সরি। বসুন প্লিজ।’

অরিত্রকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। সে বলল, ‘আমি একটা বিপদে পড়ে এসেছি স্যার। আমার ওয়াইফকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্লু বেঙ্গল হোটেলে পার্টি ছিল। ওখানে যাবার পর থেকে ফোনে পাইনি। হোটেলে পৌঁছনোর পর দেখা গেল যে পার্টিতে যাওয়ার কথা ছিল, সেটায় যায়নি। সিসিটিভি দেখতে চাওয়ায় জানা গেল ক্যামেরা খারাপ আছে। আমি কী করব?’

নীল বলল, ‘মিসিং ডায়েরি করুন। ডিটেলস দিয়ে যান। আমি দেখছি কী করা যায়।’

অরিত্র বলল, ‘হোটেল বলছে সিসিটিভি খারাপ। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। একটা কিছু করে জানা যায় না? জোর করে? ওরা মিথ্যে বলতে পারে তো?’

নীল জলের গ্লাস এগিয়ে দিল, ‘আপনি বসুন। জল খান। একটু শান্ত হন। আমি দেখছি।’

অরিত্র বলল, ‘বসতে পারছি না। শান্ত হব কী করে বলুন তো? কাদের না কাদের পাল্লায় পড়েছে, কেউ যদি কিছু করে ফেলে?’

নীল বলল, ‘প্লিজ বসুন।’

অরিত্র বসল। একবারে গ্লাসের পুরো জল শেষ করে বলল, ‘কতগুলো ইরেসপন্সিবল লোক। আমি বার বার বলেছিলাম যেও না। কে শুনবে কথা? এবার কী হবে?’

নীল বলল, ‘শুরু থেকে বলুন। আপনার ওয়াইফের নাম কী?’

অরিত্র বলল, ‘এণাক্ষী। মায়ের শপথ সিরিয়ালে ছিল। সিরিয়াল দেখলে অনেকেই চিনতে পারবে। আমার সঙ্গে কয়েকদিন ধরে মনোমালিন্য চলছে। আমি একরকম রাগ করেই ওকে বলেছিলাম সংসার থেকে চলে গেলে আমার কোনও সমস্যা নেই। ও ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে হোটেলে গেছিল পার্টিতে জয়েন করতে। আমার পরে অনুতাপ হয়। আমি ওকে খুঁজতে হোটেলে গিয়ে দেখি একজন অরগানাইজারকে ও ওর ব্যাগটা দিয়ে দেয়। তারপর ওর পার্টিতে ঢোকার কথা ছিল। কিন্তু আর ঢোকেনি বা ওকে কেউ দেখেনি। আমি যখন হোটেলে গিয়ে বললাম আমাকে সিসিটিভি দেখাতে, বলছে ক্যামেরা খারাপ।’

নীল বলল, ‘ছবি দেখান।’

অরিত্র ফোন বের করে নীলকে ছবি দেখাল। নীল ছবি দেখেই বলল, ‘এইতো, এনাকে তো আমি চিনি। আমার স্ত্রী সিরিয়াল দেখেন। ও যখন দেখে আমিও দেখেছি। ইনি নিখোঁজ?’

অরিত্র বলল, ‘হ্যাঁ।’

নীল বেল বাজাল। কনস্টেবল আলম এল। অরিত্র বলল, ‘ওর কাছ থেকে ডিটেলস নিয়ে একটা মিসিং ডায়েরি করান।’

অরিত্র বলল, ‘আর কিছু করার নেই?’

নীল বলল, ‘আপনি ছবিটা আমাকে হোয়াটস অ্যাপ করুন।’

অরিত্র বলল, ‘আর হোটেল?’

নীল চিন্তিত মুখে বলল, ‘সেটা ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা আগে ডায়েরিটা করুন। তারপর যাব।’

অরিত্র বলল, ‘ঠিক আছে।’

নীল ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলে দিল।

মিসিং ডায়েরি করার পরে নীল অরিত্রকে বলল, ‘চলুন। যাওয়া যাক।’

রাতের কলকাতা। রাস্তা একবারে ফাঁকা। নীল বলল, ‘আপনি ফোন করতে পারতেন। এতটা এলেন কেন?’

অরিত্র বলল, ‘আমার মাথা কাজ করছে না। আমি কী করব কিছু বুঝতে পারছি না। এত রাতে...বুঝতে পারছেন তো?’

নীল বলল, ‘পার্টি কি এখনও চলছে?’

অরিত্র বলল, ‘না মনে হয়। তখনই অনেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সুবীরের থাকার কথা। বলেছিল দেখছে।’

হোটেলের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল। সুবীর বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। অরিত্র ডাকল, ‘সুবীর।’

সুবীর এগিয়ে এল। চিন্তিতমুখে বলল, ‘কোনও খবর পেলে?’

অরিত্র মাথা নাড়ল, ‘না। কিচ্ছু পাইনি।’

নীল বলল, ‘আপনার কাছে ব্যাগ দিয়ে গেছিলেন?’

সুবীর বলল, ‘হ্যাঁ।’

নীল বলল, ‘চলুন দেখি।’

রিসেপশনে পৌঁছে নীল রিসেপশনিস্টকে বলল, ‘সিসিটিভি কবে থেকে খারাপ?’

রিসেপশনিস্ট অরিত্রর দিকে তাকিয়ে বুঝল অরিত্র নীলকে নিয়ে এসেছে। বলল, 'দু-দিন হয়ে গেল। আমরা টেকনিশিয়ানকে খবর দিয়েছি। কাল অ্যাটেন্ড করবে বলেছে।'

নীল বলল, 'ব্যাপারটার কিন্তু ইনভেস্টিগেশন হবে। আপনি জড়িত থাকলে ফাঁসবেন। আপনি ঠিক বলছেন তো?'

রিসেপশনিস্ট বলল, 'হ্যাঁ স্যার। আমাদের সিস্টেম লগে সব লেখা থাকে।'

নীল বলল, 'লগ দেখান।'

রিসেপশনিস্ট বলল, 'আপনি এপারে চলে আসুন স্যার। সিস্টেমেই আপডেট হয়েছে দেখাচ্ছি। লগ দেখলেই বুঝতে পারবেন এখানে কোনওরকম ম্যানিপুলেশন করা অসম্ভব।'

নীল বলল, 'আরেকটা পার্টি হচ্ছিল কাদের?'

রিসেপশনিস্ট বলল, 'প্রাইভেট পার্টি।'

নীল বলল, 'ডিটেলস দিন।'

অরিত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে। তার হঠাৎ করে খুব অসুস্থ লাগতে শুরু করেছে...

৩১

মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল সুখেন। দুপুর দেড়টা বাজে।

চা খেতে ইচ্ছে করছিল। এই সময় ভাত খাবার কথা। দিনের বেলায় চা খেয়েই কাটিয়ে দেয় সে।

চা খেলে খিদে চাপা দেওয়া যায়। নইলে কে আবার দুপুরে ঝুপড়িতে গিয়ে রান্না চাপাতে যাবে?

বিল্লু জোর পায়ে দোকানের দিকে আসছে। রাস্তার ওপার থেকেই ডাক ছাড়ল, 'এই সুখেন, এদিকে আয়।'

সুখেন বলল, 'কী হয়েছে?'

বিল্লু বলল, 'আয় না।'

সুখেন দু'দিক দেখে রাস্তা পেরোল। বিল্লু বলল, 'শমিতা ডাকছে।'

সুখেন বলল, 'কেন? কী হয়েছে?'

বিল্লু মুখ টিপে হাসল, 'চল দেখতে পাবি কী হয়েছে।'

সুখেন বিরক্ত হল, 'দূর, কী হয়েছে বলবি তো। এখানে রাখঢাকের কী আছে? আমি কি তোর কুটুম নাকি?'

বিল্লু বলল, 'তুই একটা লোক নিয়ে এসেছিলি না?'

সুখেন বলল, 'আমি নিয়ে যাইনি। লোকটা শমিতার খোঁজ করছিল।'

বিল্লু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ বে। সে মাল কী করেছে জানিস?'

সুখেন দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কী করেছে?'

বিল্লু বলল, 'পারুলের পায়ে হাতুড়ি মেরে দিয়েছে।'

সুখেন স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'সে কি? চল চল।'

দৌড়তে শুরু করল সুখেন। বর্ষার সময় বর্ষা না হয়ে রোদ থাকলে বিচ্ছিরি গরম পড়ে যায়। দৌড়তে-দৌড়তেই সুখেন বুঝতে পারছিল কাহিল হয়ে গেছে। শমিতার ঘরের সামনে গিয়ে সে কাশতে শুরু করল। দরজা খোলাই ছিল।

বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখল দিব্যেন্দুকে বারান্দায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। দিব্যেন্দু গম্ভীর মুখে মেঝেয় বসে আছে। পারুল চিৎকার করছে, 'ওরে বাবা রে, মারে, মরে যাব!'

শমিতা তাকে দেখে ছুটে এল, 'কীরে, ইচ্ছে করে এই পয়মালটাকে নিয়ে এসেছিলি নাকি?'

সুখেন দেখল দিব্যেন্দু টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে। সে দিব্যেন্দুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'এটা কী হল দাদা?'

দিব্যেন্দু বলল, 'আমি মেয়েটার মধ্যে আমার বউকে খুঁজছিলাম। আমার বউ পালিয়েছে রাতে। ওকে হাতুড়ি দিয়ে মারতাম, একেও মেরেছি।'

শমিতার হাতে ঝাঁটা ছিল। সে মনে হয় এর আগেও দিব্যেন্দুকে দু-চার বাড়ি দিয়েছে। এ কথাটা শুনে ঝাঁটা পেটা শুরু করে দিল। দিব্যেন্দু নির্বিকারভাবে বসে বসে মার খেতে লাগল।

সুখেন হাত তুলল, 'মারতে হবে না। আমার মনে হয় একে পার্টির ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। লোকটা পাগল। ছিট আছে।'

দিব্যেন্দু জ্বলে উঠল, 'তোর বাবার ছিট আছে শুয়োরের বাচ্চা।'

শমিতা আঙুল তুলল দিব্যেন্দুর দিকে, 'শোন, আমি এখনও কাউকে বলিনি। যদি বলি না, তোর কপালে দুঃখ আছে। আমাদের মেয়েটাকে মেরেছিস তুই। এখানকার লোক জানতে পারলে তোর কপালে বিরাট দুঃখ আছে। ডাকবো দেখবি?'

দিব্যেন্দু বলল, 'ডাকো। আমার আর কী? বউ পালিয়েছে। মারলে মারবে।'

শমিতা কাঁদো কাঁদো মুখে সুখেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী করব?'

সুখেন বলল, 'আমার মনে হয় বউ পালিয়ে গেছে বলে লোকটার কোনও সমস্যা হয়েছে। বসিয়ে রাখ এখন। না না, তা না, এটাকে ঘরে আটকে রাখা যাক। এই চল তো।' দিব্যেন্দুর হাত ধরে টানল সুখেন। দিব্যেন্দু বাধা দিল না। সুখেনের সঙ্গে হাঁটতে থাকল। একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দিব্যেন্দুকে বাইরে থেকে আটকে দিল সে।

শমিতা কপালে হাত দিয়ে বলল, 'এক একটা এসে জোটেও। পারুলকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

সুখেন বলল, 'আমিই নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একে কী করবি?'

শমিতা বলল, 'টাকা পয়সা কী আছে দেখি। থাকলে ছেড়ে দেব। নইলে পার্টির লোকেদের হাতে দিয়ে দেব। জেলের হাওয়া খেয়ে আসুক।'

সুখেন বলল, 'এসেই মেরে দিল?'

শমিতা বলল, 'হ্যাঁ। আমি ঢোকালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি পারুল চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। আমি ভাবলাম গাঁতিয়ে লাগাচ্ছে। পারুলের চিৎকার দেখি থামেই না। তারপর দরজা খুলে পারুল বেরিয়ে এল।'

সুখেন বলল, 'বাকি মেয়েগুলো কোথায়?'

শমিতা হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'ওরা বেরিয়েছে।'

সুখেন অবাক হয়ে বলল, 'সবাই?'

শমিতা বলল, 'হ্যাঁ।'

সুখেন পারুলের দিকে তাকালো, 'চল রে। তোকে নেয়নি কেউ, তোর কপালই খারাপ যা দেখছি।'

শমিতা হাত তুলল, 'থাক। তোকে যেতে হবে না। আমি দেখছি কী করা যায়।'

৩২

'আপনাকে একটা ভিডিও দেখাব রুমা। দেখবেন?'

খেয়ে ওঠার পর কখন যে ঘুম চলে এসেছিল, বুঝতে পারেনি রুমা। ঘুম ভেঙে দেখল সে একটা সোফায় বসে আছে। তার সামনে একজন ভদ্রলোক পায়চারি করছেন।

সে বলল, 'আপনি কে?'

লোকটা হাসল, 'ভুলে গেলেন? আমিই আপনাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলাম তো।'

রুমা বলল, 'ওহ্। আপনি? আপনাকেই আমি ফোন করেছিলাম? আপনিই নিয়ে এসেছিলেন?'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। আমিই এনেছিলাম।'

রুমা বলল, 'আচ্ছা আমার সঙ্গে যাকে এনেছিলেন, তার কী হল? সে বাড়ি যেতে চাইছিল যে?'

লোকটা হাসিমুখেই বলল, 'আমরা দেখছি ব্যাপারটা। কী করা যায়, ঠিক করা হবে।'

রুমা অবাক হয়ে বলল, 'মানে? কী করা হবে?'

লোকটা বলল, 'সেটা পরে আপনি জানতে পারবেন। তার আগে যেটা বলছিলাম, ভিডিও দেখবেন? অলমোস্ট রিসেন্ট ভিডিও।'

রুমা বলল, 'দেখান।'

লোকটা একটা ট্যাব তার দিকে এগিয়ে দিল। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে দিব্যেন্দু একটা ঘরে ঢুকে আচমকা একটা মেয়ের পায়ে হাতুড়ি মেরে দিয়েছে। রুমা শিউরে উঠল। আরেকটু হলেই তার হাত থেকে ট্যাবটা পড়ে যাচ্ছিল। সে কোনও মতে বলল, 'এটা কোথায়?'

লোকটা বলল, 'রেড লাইট এরিয়ায়। ইনিই আপনার হাজব্যান্ড তো?'

রুমা দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে ছিল। কোনমতে বলল, 'হ্যাঁ।'

লোকটা বলল, 'বুঝতে পারছি কোন নরক থেকে আপনাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। এবার বাকি জীবনটা আপনি কী চান, তা আপনাকেই ঠিক করতে হবে।'

রুমা বলল, 'কী চাই মানে?'

লোকটা বলল, 'আমাদের জীবন এক একটা সময় এমন একটা জায়গায় চলে যায়, যেখান থেকে আমরা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারি না। আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি না, বেঁচে থেকে আমাদের কী লাভ।'

রুমা মাথা নিচু করল, 'হ্যাঁ, আমার সব সময় মনে হতো, মরে গেলেই ভালো হতো।'

লোকটা বলল, 'আপনি কিন্তু মরে যাননি। আপনি বেঁচে আছেন। আপনি একটা নতুন জীবন পেয়েছেন। প্রতিদিনের নরক যন্ত্রণার হাত থেকে বেঁচে গেছেন। আপনি নিশ্চয়ই সেই জীবনে আর ফিরে যেতে চান না?'

রুমা মাথা নাড়ল, 'চাই না।'

লোকটা বলল, 'আপনি আপনার বাবার বাড়ি ফিরতে চান?'

রুমা বলল, 'আমার সে রাস্তা বন্ধ। ওরা কিছুতেই আর আমাকে ফেরত নেবে না। আমার থেকে ভালো কেউ জানে না সেটা।'

লোকটা বলল, 'আমি আপনাকে একটা অফার দেব রুমা। আপনি যদি চান, কাজটা করবেন না, আমি জোর করব না। কিন্তু আপনার মতো মেয়েরা, যারা জীবনে এতটা সহ্য করে এসেছে, তারা অনেক কাজ করতে পারে। এমন কাজ করতে পারে, যেটা কেউ ভাবতেও পারবে না।'

রুমা বিহ্বল চোখে তাকাল, 'আমি যে কিছু জানি না। আমি কী করে কোনও কাজ করব?'

লোকটা বলল, 'জানবেন। একদিনে কিছু হবে না। তার জন্য সময় লাগবে। আমরা আপনাকে তৈরি করব।'

রুমা বলল, 'কী কাজ?'

লোকটা তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, 'সেটা এখনই বলব না। আপনার ট্রেনিং শুরু হবে কাল থেকে। দেখুন, আপনি কীভাবে সেটা গ্রহণ করেন। তারপর আমরা আরেকবার কথা বলব না হয়। ঠিক আছে?'

রুমা বলল, 'ট্রেনিং হবে? আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমাকে কি আমার শরীর বেচতে হবে?'

লোকটা বলল, 'শরীর? শরীর কী? এতদিন তুমি কী করেছ শরীর দিয়ে?'

লোকটার যেন একটা অদ্ভুত সম্মোহিনী ক্ষমতা আছে। লোকটা যেন তার মাথায় ঢুকে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তার মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলছে যেন। আপনি থেকে তুমিতে চলে গেছে, রুমা বুঝতেও পারল না।

রুমা লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা বলে...'

লোকটা বলল, 'তোমার কাছে যা আছে, তা সবার কাছে থাকে না। তুমি নিজেই জানো না, তুমি কী করতে পারো। আমরা কেউই জানি না। তুমি আমার কথা শুনে চলো, শুনে দেখ আমি যা বলছি। শুনবে?'

রুমা মাথা নাড়ল, 'শুনব। আমার তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমার আর কিছু করারও নেই।'

লোকটা এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত দিল, 'আমি জানি তুমি পারবে। তোমাকে পারতেই হবে।'

রুমা বলল, 'আমাকে মেরে ফেলবে না তো কেউ?'

লোকটা হাসল, 'আমরা সবাই একদিন মরে যাই রুমা। তার আগে বেঁচে থাকার মতো বাঁচা দরকার। তাই না?'

৩৩

'টাকা ভালো না খারাপ?'

'জানি না। ভালোই হবে। টাকা ছাড়া তো কিছু হয় না।'

'আর অতিরিক্ত টাকা?'

'সেটা একটা কথা। আমাদের পাড়ায় একটা বাড়ি ছিল। রোজ সকালে উঠে সে বাড়িতে খেলতে যেতাম। চার-পাঁচটা ভাই। একটা উনুন ছিল। রান্না হচ্ছে। সকালে ডাল আর রুটি করত। আমাকেও দিত। দেখতাম সবাই মিলে খাচ্ছে। সাদামাটা খাবার, তাই কী ভালো লাগত খেতে। দিনে দিনে সবাই দাঁড়িয়ে গেল। রান্নাঘর আলাদা হয়ে গেল। সবাই আলাদা থাকে। সবার টাকা আছে। ভালো আছে কি তারা?'

দুটো লোক কথা বলছে নুরুলের চায়ের দোকানে। পূর্ণ চুপ করে বসে আছে। তার পকেটে এক তাড়া দু'হাজার টাকার নোট। এত টাকা সে কোনও কালে একসঙ্গে দেখেনি। কী করবে এই টাকাটা নিয়ে বুঝতে পারছে না।

আকাশ কালো করেই আছে। একটু আগে ঝির ঝির বৃষ্টি হয়েছে। এখন বন্ধ আছে। আবার শুরু হবে হয়তো।

টাকাটা পাবার পর থেকে বাপিদার ফোনের ভয়টাও কমেছে তার। টাকার জন্যই তো বাপিদার বাড়িতে থাকতে গেছিল সে। সেই টাকাটাই পেয়ে গেলে আর চিন্তার কী আছে?

উদাস মুখে বিড়ি ধরাল সে। লোক দুটো চলে গেলে নুরুল বলল, 'কীরে পুন্ন, টাকা দিবি না? তোর অনেক বাকি হয়ে আছে রে।'

পূর্ণ বলল, 'কত বাকি? হিসেব করেছিস?'

নুরুল ডায়েরি বের করল। চোখ ছোট ছোট করে সেদিকে দেখে বলল, 'দেড়শো টাকা।'

নুরুল ভালো মানুষ। কোনও দিন টাকার জন্য চা দেওয়া বন্ধ করেনি। পূর্ণ বলল, 'আজকেই দিয়ে দেব বন্ধু। তুই ভালো বন্ধু। আমার দুঃখের দিনে আমাকে খাইয়েছিস। কত দিন না খেয়ে ছিলাম, তুই ডিম টোস্ট করে খাইয়েছিস। তোকে টাকা না দিয়ে কোথায় যাব রে ভাই?'

নুরুল খুশি হল, 'কী হয়েছে রে তোর? এত ভালো ভালো কথা বলছিস কেন?'

পূর্ণ উঠে নুরুলের কাছে গিয়ে বলল, 'টাকা পেয়েছি ভাই। কোত্থেকে পেয়েছি, জিগ্যেস করিস না। তবে পেয়েছি। সমস্যা হল, টাকাগুলো দু'হাজারের নোটে আছে। পালটাবো কী করে?'

নুরুল চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'বাপির বাড়িতে?'

পূর্ণ মাথা উপর নিচ করল।

নুরুল বলল, 'লোকের টাকা। চোর অপবাদ দেবে যে?'

পূর্ণ বলল, 'সারারাত ভেবেছি। কত লোকের অগাধ টাকা। আর আমাদের মতো লোকের কিছু নেই। যাদের অগাধ টাকা, তাদের থেকে একটু নিলে তারা কি দেখতে পাবে? সব তো নেবো না। একটু নেবো। তুই তোর মতো করে দোকান দাঁড় করাবি। আমায় খাওয়াবি। আমার তো বউ নেই। সংসার নেই। আমাকে একটু খাওয়াতে পারবি না সারাজীবন? দেখ না, টাকাগুলো যদি কিছু করা যায়?'

নুরুল বলল, 'কত টাকা?'

পূর্ণ বলল, 'দু'লাখ।'

নুরুল হেসে ফেলল, 'দু'লাখ? ওতে আজকালকার দিনে কিছু হয় নাকি? তুইও একটা পাগল। দিয়ে দিস। আমার ব্যাঙ্কেই ঢুকিয়ে দিয়ে আসব। তারপর তোকে পাঁচশোর নোট দিয়ে দেব না হয়।'

পূর্ণ চোখ কপালে তুলে বলল, 'সে কী রে ভাই? দু'লাখ টাকায় কিছু হয় না?'

নুরুল বলল, 'এই যে দোকানটা দিয়েছি, এর জন্য পার্টির লোকেদের মাসে সাত হাজার টাকা করে দিতে হয়। বুঝতে পারিস? সাত হাজার টাকা। মাসে সাত হাজার। বছরে চুরাশি হাজার টাকা। তার উপর আছে বাজার সমিতির বিশ্বকর্মা পুজো, কালি পুজো, দুর্গা পুজোর চাঁদা। আরও কত চাঁদা আছে। শেতলা পুজো হবে, গণেশ পুজো হবে, একটার পর একটা কিছু না কিছু চলতেই থাকবে। বছরে এক লাখ টাকা তো তোলা দিতেই চলে যায়। আর দু'লাখ। ধুস।'

পূর্ণ বলল, 'টাকার কোনও দাম নেই?'

নুরুল বলল, 'নেই। সত্যি নেই। দু'লাখে সারাজীবন চলবে না। হ্যাঁ, তুই একলা মানুষ। সাত-আট বছর রোগ-ভোগ না থাকলে খাবার টাকা উঠবে। এটুকুই।'

পূর্ণ পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করে নুরুলের হাতে দিয়ে বলল, 'রাখ তবে। এটা দিয়ে যা করার করতে হবে।'

নুরুল সন্তর্পণে চারদিকে তাকিয়ে টাকাগুলো তাড়াতাড়ি নিজের বাক্সে রাখল। তারপর একটা নোট বের করে দেখে নিয়ে বলল, 'টাকাটা জাল মনে হচ্ছে রে।'

পূর্ণ চমকে উঠল, ‘সে কী?’

৩৪

একটা মাছি ঘুর ঘুর করছে চোখের সামনে। দিব্যেন্দুর অস্বস্তি হচ্ছে। মাছিটা ঘুরে ঘুরে আসছে। চোখের নীচে ব্যথা করছে। প্রবল ব্যথা। মাথাটা ঘোরাচ্ছে।

সুখেন তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়ি টানছে। দিব্যেন্দুর জ্ঞান ফিরেছে দেখে বলল, ‘ভাই কি পুরো মেন্টাল? না হাফ?’

দিব্যেন্দু বলল, ‘মানে?’

সুখেন বলল, ‘আমি তো জানি এ পাড়ায় লোকে লাগাতে আসে। হাতুড়ি মারতে আসে, তা তো প্রথম দেখলাম। সমস্যা কী জীবনে?’

দিব্যেন্দু লাল চোখে সুখেনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। কী বলবে বুঝতে পারল না। রাত হয়েছে। মোড়ের মাথায় অনেকেরই আনাগোনা বেড়েছে। সুখেনের যেতে ইচ্ছে করছিল না। এরকম চিজ রোজ রোজ আসে না। একে পুরোপুরি মাপতে না পারলে পরে নিজেকেই দোষারোপ করতে হবে।

সুখেন বলল, ‘তোমার কপাল ভালো। বেঁচে থাকাটাই এ যুগে চ্যালেঞ্জ। তুমি বেঁচে আছ, এত কিছু করে, হালকা ক্যাল্যানি খেয়ে, এর থেকে ভালো তো আর কিছু হতে পারে না। বাড়িতে কে কে আছে?’

দিব্যেন্দু বলল, ‘কেউ নেই। বউ ছিল। পালিয়েছে।’

সুখেন বলল, ‘বউকে এভাবে ক্যালাতে?’

দিব্যেন্দু মাথা নাড়ল, ‘হ্যাঁ।’

সুখেন পকেট থেকে টুথপিক বের করে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, ‘তুমি লিজেন্ড আদমি আছ। বউকে মনে পড়ছিল বলে পারুলকে হাতুড়ি মেরে দিয়েছ। আমার মনে হচ্ছে তোমার মগজের সব স্ক্রু ঢিলা হয়ে গেছে। ঠিক মনে হচ্ছে তো মামা?’

দিব্যেন্দু বলল, ‘আমি বাড়ি যাব।’

সুখেন বলল, ‘সে তো যাবে। এখন রাত সাড়ে বারোটা বাজে। রাতটা কাটিয়ে যেও। যা খেয়েছ, একা একা তো ফিরতে পারবে না। চল দেখি, আমার ঝুপড়িতে।’ দিব্যেন্দু কোনওমতে উঠতে গিয়ে পড়ে গেল। সুখেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দিব্যেন্দুকে ধরল, ‘এখন একজনের কাঁধে চল। আরেকটু হলে চারজনের কাঁধে যেতে হতো।’

দিব্যেন্দু যন্ত্রণায় কোঁকাতে কোঁকাতে সুখেনের ঝুপড়িতে ঢুকল। সুখেন বলল, ‘কার্ডবোর্ডের উপর শুয়ে পড়।’

মেঝেতে কার্ডবোর্ড পাতা ছিল। দিব্যেন্দু তার উপরে শুয়ে পড়ল। সুখেন বলল, ‘ভাত বসাচ্ছি। খেয়ে নাও কোনমতে। কাল সকালে দেখা যাবে কী করব।’

দিব্যেন্দু উল্টে শুয়ে আছে। সুখেন চাল চাপাল। বলল, ‘তোমার পকেটে যে টাকা ছিল, ওরা সব নিয়ে নিয়েছে। ভালো লোকের ঘরে গিয়ে পাঙ্গা নিয়েছ। শমিতা হল এখানকার ডন। আর তুমি তার ঘরের মেয়ের পায়েই মেরে দিয়েছো। এর থেকে ট্রেনের সামনে গিয়ে ঝাঁপ দিতে। কম ঝামেলায় হয়ে যেত।’

দিব্যেন্দু বলল, ‘ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। সবাই মিলে আটকে দিল।’

সুখেন বড় বড় চোখ করে দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বটে? বউয়ের দুঃখে এত কষ্ট হচ্ছে?’

দিব্যেন্দু বলল, 'একবার সামনে পাই, মাথায় ইট মেরে মেরে শেষ করব! কত বড় সাহস! বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে! কোন নাগরের সঙ্গে পালিয়েছে কে জানে। যখন খুঁজে পাবো, দুটোকে একসঙ্গে মারব।'

দিব্যেন্দু এমনভাবে কথা বলছে, যেন কোনও বিষাক্ত সাপ ফোঁস ফোঁস করছে। সুখেন শিস দিয়ে উঠল, 'বাঃ গুরু, তোমার হবে। তুমি হেবি ভিলেন হবে।'

দিব্যেন্দু নিজের মনে বলে চলল, 'শালি পালিয়ে গেল। ভেবেছে পালিয়ে বাঁচতে পারবে। দাঁড়া না, আমি তোকে ঠিক খুঁজে বের করব। তারপর কীভাবে বিষ ঝাড়ব, তুই নিজে দেখতে পাবি।'

সুখেনের ফোন বাজছিল। সুখেন দেখল শমিতা ফোন করছে। সে ফোন নিয়ে বাইরে গেল। শমিতা থমথমে গলায় বলল, 'মালটাকে তুই নাকি নিয়ে গেছিস?'

সুখেন বলল, 'কেন?'

শমিতা বলল, 'কোথায় নিয়ে গেছিস?'

সুখেন অম্লানবদনে মিথ্যে বলে দিল, 'ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এলাম তো। কেন?'

শমিতা চিৎকার করে উঠল, 'উফ্, আমাকে জিগ্যেস করবি না?'

সুখেন বলল, 'কেন? কী হয়েছে?'

শমিতা বলল, 'মালটাকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছে।'

সুখেন বলল, 'কে পাঠিয়েছে?'

শমিতা বলল, 'সেটা তুই জেনে কী করবি? কোথাকার ঠিকানা বলেছিল?'

সুখেন বলল, 'মানিকতলা শুনলাম।'

ফোন কেটে গেল। সুখেন ঘরের ভেতরে ঢুকে বলল, 'তোমার তো হেবি ডিমান্ড গুরু। খোঁজে লোকও চলে এসেছে।'

দিব্যেন্দু সুখেনের কথার পাত্তাও দিল না। নিজের মনে বিড়বিড় করে যেতে লাগল।

৩৫

'জাল নোট! জার্মানিতে থেকে বাপি জাল নোটের কারবার করে নাকি রে?' হতভম্ব গলায় বলল নুরুল।

পূর্ণর মাথা ভোঁ-ভোঁ করছিল। সে বলল, 'আমি জানি না। কেমন কপাল আমার। ভাবলাম কদিন একটু শান্তিতে থাকতে পারব, তাও গেল।'

নুরুল বলল, 'তুই সব টাকা যেমন ছিল, তেমন রেখে দে। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে তো লাভ নেই। খামোখা বদনামের ভাগীদার হবিই বা কেন?'

পূর্ণ মাথা নাড়ল, 'ঠিকই বলেছিস। দিয়ে আসি।'

নুরুলের থেকে টাকাগুলো নিয়ে আবার পকেটে ঢুকিয়ে চুপ করে বসল পূর্ণ। চায়ের খদ্দের এসে গেছে। নুরুল ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পূর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।

নুরুল ডাকল, 'এই পুন্ন, চা খেয়ে যা আরেক কাপ। আমি খাওয়াচ্ছি।'

পূর্ণ ম্লান মুখে তাকাল। নুরুল বলল, 'আয় আয়। বোস।'

পূর্ণ চুপ করে বসে চা হাতে নিয়ে বসল। এলাকা জমজমাট। মেলা হবে। মাঠে বাঁশ পড়ছে। গাড়ি আসছে। ঘোর বর্ষায় মেলা চলবে। ভিড় করে আসবে লোকে। কাঁদায় আছাড়ি পিছাড়ি খাবে। তবু লোকের মেলা দেখার পুরকিই আলাদা।

খদ্দের চলে গেলে নুরুল বলল, 'টাকাগুলো ঘরে রেখে দিয়েছিল কেন রে?'

পূর্ণ বলল, 'কে জানে। কী করতে রেখেছে।'
বাক্সর মতো আরও কী সব দেখেছে, কিছু বলল না পূর্ণ।
নুরুল বলল, 'কাউকে বলার দরকার নেই। শুধু তুই ফাঁসিস না।'
পূর্ণ বলল, 'কাজ ছেড়ে দেব। এখানে কাজ করব না।'
নুরুল বলল, 'তা কেন? কে খাওয়াবে তোকে? মাস গেলে কিছু টাকা তো পাবি।'
পূর্ণ বলল, 'সেগুলো জাল হয় যদি?'
নুরুল বলল, 'হবে না। আমার মনে হয় না সেগুলো জাল হবে।'
মন মরা হয়ে কিছুক্ষণ বসে চা শেষ করে পূর্ণ উঠে পড়ল।
এলাকায় টোটো গিজগিজ করছে। আগে রিক্সা চলত। ভ্যান চলত। এখন টোটো চলে। প্রথমদিকে টোটো ভাড়া এত ছিল না। ইদানীং প্রচুর বেড়ে গেছে। তার সঙ্গে টোটোচালকদের রোয়াবও বেড়েছে।
পূর্ণ একজনকে জিগ্যেস করল, কত নেবে। বলে সত্তর টাকা। আগে কুড়ি টাকা নিত। সব কিছুর দাম বেড়ে গেছে। নুরুল ঠিকই বলছিল। দু'লাখ টাকায় কিছু হয় না। এক দিকে ভালোই হয়েছে।
ফোন রিং হচ্ছে। বাপিদা ফোন করছে। ধরল সে, 'বল।'
বাপিদা বলল, 'ক্যামেরার লোক বাড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি কোথায়?'
পূর্ণ বলল, 'বাজারে এসেছিলাম। যাচ্ছি। কুড়ি মিনিট পরে আসতে বল।'
বাপিদা রেগে গেল, 'তোমাকে না বলেছিলাম, বাড়ি ফাঁকা রাখবে না। কেন আমাদের ওখানে সব্জিওয়ালা যায় না?'
পূর্ণ উত্তর দিল না। চুপ করে রইল।
বাপিদা বলল, 'কী হল? চুপ করে আছ কেন?'
পূর্ণ বলল, 'খুব গরম পড়েছে। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি তো। চলে যাচ্ছি।'
বাপিদা বলল, 'যাও। আর মই টইগুলো দেখে নিও। এবারে যেন ভেঙে না পড়ে। আমি না থাকলে কিছুই হয় না দেখছি।'
পূর্ণ বলল, 'দেখব দেখব। চিন্তা কোরো না। দরকার হলে আমি মই ধরে রাখব। চিন্তার কোনও কারণ নেই।'
বাপিদা বলল, 'আজকের মধ্যে সব কাজ যেন হয়ে যায়। আর ঠাকুরঘরেও একটা ক্যামেরা লাগাতে বলবে। ঠিক আছে?'
পূর্ণ থমকে গেল, 'ঠাকুরঘরে?'
বাপিদা বলল, 'হ্যাঁ। বাথরুম ছাড়া সব ঘরেই লাগানো থাক। আমি তাহলে এখান থেকে সব দেখে রাখতে পারব। তুমিও যখন ইচ্ছে বাজার যেতে পারবে। চিন্তার কিছু থাকবে না।'
পূর্ণ বলল, 'ঠিক আছে। বলে দেব।' ফোন কেটে দিল বাপিদা।
পকেটে টাকাগুলো যেন মরে পড়ে আছে। অথচ বাজার যাবার পথে তার পকেট কেমন গরম মনে হচ্ছিল। বুকটাও উত্তেজনায় জোরে জোরে ধুকপুক করছিল। ব্যাজার মুখে পূর্ণ হাঁটতে থাকল।

৩৬

'লগ ঠিকই আছে। এদের ক্যামেরা খারাপ।'
চিন্তিত মুখে বলল নীল।

অরিত্র বলল, 'তাহলে কী হবে?'

নীল বলল, 'আমি আপনার স্ত্রীর ফোনটা ট্রেস করতে দিয়েছি। দেখা যাক, কিছু পাওয়া যায় নাকি। তার আগে আপনি বলুন, ওর আচরণে সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলেন?'

অরিত্র নীলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে তো বলেছি ওর সিরিয়াল করা নিয়ে একটা ঝামেলা চলছিল।'

নীল বলল, 'বলেছেন?'

অরিত্র বলল, 'বলিনি? জানি না, মনে করতে পারছি না। তাহলে এখন বলি, ওর এই সিরিয়াল করা, রাত করে বাড়ি ফেরা, লেট নাইট পার্টি করা, এসব নিয়ে আমার আপত্তি আমি জানিয়েছিলাম। রাগ করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু তা বলে এত তাড়াতাড়ি ব্যাগ রেখে কোথাও চলে যাওয়ার মেয়ে ও নয়। আমি নিশ্চিত এণাক্ষী কোনও সমস্যায় পড়েছে।'

নীল মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, সেকেন্ড ব্যাঙ্কোয়েটের প্রাইভেট পার্টির আরও ডিটেলস আমি বের করার চেষ্টা করছি। যেখানে যেখানে যা যা জানানোর, আমি তাও জানিয়ে দিচ্ছি। আপনি বাড়ি চলে যান। রেস্ট করুন। এখানে সেখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়ে তো কোনও লাভ হবে না, তাই না?'

অরিত্র অন্য দিকে তাকাল। বলল, 'বুঝতে পারছি সবটাই। কিন্তু ওর কোনও ক্ষতি হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। ও খানিকটা ঝোঁকের মাথাতেই...'

নীল অরিত্রর কাঁধে হাত রাখল, 'আরে এরকম তো হয়। আমারও হয়। স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া তো করবেই। তাছাড়া, ব্যাপারটা তো এমন না যে আপনি ওয়াইফকে বাড়িতে খুন করে এসে এখানে একটা সিন তৈরি করছেন। সুবীরবাবু আপনার ওয়াইফকে দেখেছে। তাই আপনি সেদিক থেকে সেফ।'

অরিত্র চমকে নীলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মানে! এ আবার কী কথা বলছেন?'

নীল বলল, 'এরকম ভাবে রিয়্যাক্ট করার কিছু হয়নি। তদন্তে নামলে সবদিক যাচাই করে দেখতে হয়। সবার আগে আপনার সব রকম অভিযোগ থেকে ফ্রি হওয়া দরকার। আপনারা যেখানে থাকেন, সেখানের এন্ট্রান্স বা এক্সিটে সিসিটিভি আছে তো?'

অরিত্র বলল, 'আছে। তা বলে আপনি আমাকেই...'

নীল বলল, 'ঠিক আছে। ওই ফুটেজ এটা প্রমাণ করে দেবে যে স্ত্রীর নিখোঁজে আপনার ডিরেক্ট কোনও হাত নেই। দ্যাটস ফাইন। ওর কোনও শত্রু? কারো সঙ্গে ঝামেলা?'

অরিত্র বলল, 'না। আমার অন্তত জানা নেই। তবে লাস্ট কয়েক মাসে ওর অনেক নতুন লোকজনের সঙ্গে পরিচিতি হয়। তারা কে কী করেছে, তাদের সঙ্গে কী রিলেশন ছিল, কী কথা হতো, আমি কিচ্ছু জানি না।'

নীল বলল, 'দু-তিন দিন সময় দিন, এর মধ্যে না ফিরলে সব জেনে যাব আমরা। আপনাকে এসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আপনি বাড়ি যান। উনি যদি বাড়ি চলে আসেন, আমাকে জানাবেন, নাম্বারটা নিয়ে নিন।'

নীল নাম্বার বলল। অরিত্র কাঁপা কাঁপা হাতে নাম্বার সেভ করে নিল।

নীল অরিত্রকে দেখে বলল, 'শুনুন, আমার মনে হয় না এত রাতে এই টেন্সড অবস্থায় আপনার ড্রাইভ করে যাওয়া ঠিক হবে। আপনার গাড়ি তো থানাতেই থাকল, আপনাকে বরং আমি নামিয়ে দিয়ে আসি। কাল গাড়িটা নিয়ে যাবেন।'

অরিত্র আপত্তি করল, 'না অফিসার, তার দরকার নেই।'

নীল বলল, 'দরকার আছে। আপনি বেশ আন্সটেবল হয়ে গেছেন। বেশি চিন্তা করে ফেলছেন। অত ভাবার কিছু হয়নি। চলুন।'

অরিত্রকে একপ্রকার জোর করেই নীল জিপে তুলল। গাড়ি স্টার্ট হতেই বলল, ‘আপনাদের স্বামী-স্ত্রী মনোমালিন্য হচ্ছিল, সে কথা এই শুটিং পার্টিরা জানে?’

অরিত্র বলল, ‘জানে। হয়তো জানে না। আমি ঠিক বলতে পারব না। অনেক মেয়ের বাড়িতেই ঝামেলা হয়। লাইনটা তো সুবিধার না।’

নীল বলল, ‘এরকম ধারণা কেন হল আপনার?’

অরিত্র বলল, ‘অন্য লোক এসে আপনার বউয়ের হাত ধরবে, তার কোমরে হাত রেখে নাচবে, সবসময় ভালো লাগে আপনার? আমি অত উদার হতে পারিনি, কী করব?’

নীল হেসে ফেলল।

৩৭

রুমা খাটে শুয়ে টিভি দেখছে। কী যে আরাম লাগছে! এসি চলছে। ঘরটা ঠান্ডা হয়ে আছে। ঘরের ভেতর কত কিছু আছে। টি ব্যাগ আছে, চিনি আছে, দুধ আছে, কফি আছে। গরম জল করার ইলেকট্রিক কেটলি আছে। দিব্যেন্দু একবার এরকম টি ব্যাগ নিয়ে এসেছিল। তাকে গরম জল করে দিতে বলত। নিজে চা বানিয়ে খেত। রুমার ইচ্ছে করত টি ব্যাগের চা খেতে, লজ্জায় বলতে পারেনি কখনও। তাছাড়া বললে যদি আজেবাজে কথা বলত, কিংবা গায়ে হাত তুলত! ‘শখ? শখ হয়েছে? শখ বের করে দেব, জুতোর তলায় থাকবি হারামজাদি!’

আরাম লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে দিনের পর দিন সে শুয়ে থাকে। একটা সময় সে সারাদিন শিউরে উঠত। সর্বক্ষণ মনে হতো, এই বোধহয় দিব্যেন্দু এসে গায়ে হাত দেবে। রুমা একবার স্টেশনে চলে গেছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে স্টেশনে বসে থাকার পর বাড়ি ফিরে এসেছিল। মনে হয়েছিল, কোথায় যাবে? তার কোথাও যাবার তো নেই।

বেল বাজল। উঠে দরজা খুলল রুমা। এণাক্ষী ফ্যাকাসে মুখে তার ঘরে ঢুকল।

রুমা বলল, ‘কী হয়েছে?’

এণাক্ষী বলল, ‘এটা সুবিধার জায়গা মনে হচ্ছে না। আমি কিছুতেই অরিত্রকে ফোনে পাচ্ছি না। এরা ভালো লোক না।’

রুমা বলল, ‘আপনি বসুন। এরকম অস্থির হয়ে যাবেন না।’

এণাক্ষী বলল, ‘বসব? বসব মানে? এখানে আমাকে আটকে রাখবে আর আমি বসে থাকব?’

রুমা বলল, ‘তাহলে কী করবেন? কিছু কি করার আছে?’

এণাক্ষী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রুমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনি ওদের দলে আছেন, তাই না?’

রুমা বলল, ‘আমি নিজেই জানি না, কার দলে আছি। কিন্তু এখানে আমি ভালো আছি। আমি বাড়ি যাব না।’

এণাক্ষী বলল, ‘আমি কী করব? আমাকে বাড়ি যেতে হবে।’

রুমা বলল, ‘আপনি দেখুন না কী হয়। আমার তো ভয়ের কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না।’

রুমের দরজা খুলে দুজন মহিলা ঢুকল। এণাক্ষীর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনাকে বলা হয়েছিল নিজের রুমে থাকতে। আপনি বেরিয়েছেন কেন?’

এণাক্ষী রেগে গেল, ‘কেন? আমি কি জেলখানায় আছি?’

দুজন মহিলার কেউ আর কোনও কথা বলল না। একজন এগিয়ে এসে এণাক্ষীর হাত ধরে টান মারল। এণাক্ষী আর্তনাদ করে উঠল, 'এ কী? এসব কী অসভ্যতা হচ্ছে?'

রুমা বলল, 'ওকে ছাড়ুন। ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?'

দুজনের কেউই উত্তর দিল না। এণাক্ষীকে টেনে ঘর থেকে নিয়ে রুমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। রুমার ফোন বেজে উঠল।

রুমা সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরল, 'হ্যালো।'

'তুমি ভেতর থেকে রুম লক করে রাখো। যে কেউ তোমার রুমে ঢুকে পড়লে সেটা কি তোমার নিরাপত্তার জন্য ভালো হবে?'

রুমা বলল, 'কিন্তু উনি তো আমার ক্ষতি করতে আসেননি?'

'সেটা তুমি জানো? কেউ কি জানে কার কী উদ্দেশ্য? কতক্ষণের আলাপ তোমাদের?'

রুমা চুপ করে রইল।

'রুম লক করে দাও। এখনই। আর আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে। কাল থেকে তোমার স্পেশাল ট্রেনিং আছে।'

'কী ট্রেনিং?' রুমা আগ্রহী কণ্ঠে জিগ্যেস করল।

উত্তর এল না। ফোন কেটে গেল।

রুমা উঠে দরজা বন্ধ করল। সে ঠিক করেছে, এরা যেই হোক, যেমন লোকই হোক, যা বলবে, সে তাই মেনে চলবে।

টিভি বন্ধ করে দিল সে। চোখ বুজল।

বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল এর আগে। এখন আর ঘুম এল না। এপাশ ওপাশ করতে লাগল। আবার টিভি চালাল। একটাই চ্যানেল চলছে। বাংলা সিরিয়াল হয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ সে আগ্রহ নিয়ে দেখল।

উঠে চা বানিয়ে খেল। জানলার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। রাস্তা দিয়ে একটার পর একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে। একটা দোকান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু দোকানের নামটা যে ভাষায় লেখা, সেটা চিনতে পারল না।

৩৮

এপাশ ওপাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল রুমা।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল ঘরের মধ্যে কারো অস্তিত্ব আছে। রুমার স্পষ্ট মনে পড়ল সে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করেছিল। অবশ্য ঘরে ছিটকিনি নেই। তার রুমের চাবি অন্য কারো কাছে থাকলে সে ঘরে ঢুকতে পারবে।

রুমা ভয়ে ভয়ে বলল, 'কে?'

কেউ কোনও সাড়া দিল না। রুমা উঠে বসল। খাট থেকে নামতে যেতেই কেউ তার মুখে হাত দিল। রুমা ছাড়াতে চেষ্টা করল, পারল না।

তাকে জড়িয়ে ধরে খাটে শুইয়ে দিল।

রুমা অশক্ত নয়। দিব্যেন্দুর মার খেয়ে খেয়ে তার সহ্যক্ষমতা এতদিনে বেশ ভালোই হয়ে গেছে। খাটে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে সরে গেল।

রুমা চিৎকার করল, 'কে?'

তাড়াতাড়ি হাতড়ে সুইচগুলো খুঁজতে যাচ্ছিল, এমন সময় আরেকজন এসে তাকে খাটে ফেলে হাত-পা বেঁধে দিল। রুমা চিৎকার করায় তার মুখে কাপড় দিয়ে দিল।

আলো জ্বলে উঠল। রুমা দেখল সকালের লোকটা আর ডাইনিং হলের ম্যাডাম দাঁড়িয়ে আছেন। ম্যাডাম রুমার মুখের কাপড় সরিয়ে দিল। রুমা আর্তনাদ করে উঠল, 'এগুলো কী?'

লোকটা রুমার হাতের দড়ি খুলে দিতে দিতে বলল, 'অসহায় লাগছিল না? মনে হচ্ছিল না সব শেষ হয়ে যাচ্ছে?'

রুমা জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল। বলল, 'এগুলো কী ধরনের অসভ্যতা?'

লোকটা বলল, 'অসভ্যতা না। এটা পার্ট অফ ট্রেনিং।'

রুমা বলল, 'কীসের ট্রেনিং?'

লোকটা বলল, 'সব সময় সচেতন থাকার। যেকোনও সময় আঘাত আসতে পারে। প্রস্তুত না থাকলে কী হতে পারতো?'

রুমা বলল, 'তা বলে এভাবে? কী করতে হবে আমাকে যে এরকম সচেতন থাকতে হবে?'

লোকটা সোফায় বসে বলল, 'আমাদের হয়ে কাজ করতে হবে। করবে?'

রুমার বুকের ধুকপুকুনি কমছিল না। বলল, 'কী এমন কাজ যাতে রাতে ঘরে লোক ঢুকে যাবে?'

লোকটা পায়ের উপর পা রেখে বলল, 'তোমাকে যে কাজ করতে হবে, সে কাজকে বলা হয় হানি ট্র্যাপ। হানি ট্র্যাপের নাম শুনেছ?'

রুমা অবাক হয়ে বলল, 'মানে?'

লোকটা বলল, 'বাঘ মারার জন্য হরিণকে বেঁধে রাখা হয়। বাঘ সেই হরিণের গন্ধ পেয়ে তাকে মারতে আসে। শিকারি অপেক্ষা করে মাচায়। শিকারির কাজ হয় বাঘকে ওই সময়ে মেরে ফেলা। তোমাকে হরিণ হতে হবে।'

রুমা বড় বড় চোখ করে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল।

লোকটা বলল, 'বাঘের আঁচড়ে হরিণ আহত হয়, মরেও যেতে পারে। কিন্তু সে মরে গিয়ে একটা গোটা গ্রাম বা শহরকে বাঁচিয়ে দিয়ে যায়। কাজে প্রচুর রিস্ক। কিন্তু সফল হতে পারলে তার থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। তুমি সুন্দরী, তোমার অনেক দূর যাওয়ার ক্ষমতা আছে। তোমার হাজব্যান্ড তোমাকে প্রচুর যন্ত্রণা দিয়েছে। আমরা সুযোগ দিচ্ছি। তুমি কি এ সুযোগ নিতে প্রস্তুত?'

রুমা মাথা নিচু করল। কয়েক সেকেন্ড পর মাথা তুলে বলল, 'তার মানে আমাকে শরীর বেচতে হবে। তাই তো?'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'শরীরকে শরীরের মতো দেখলে তাই মানে দাঁড়ায় বইকি। তুমি যার সঙ্গে সংসার করছিলে, সেখানেও কি একরকম শরীর বেচতে হয়নি?'

রুমা বলল, 'এই জন্যই আমাকে এত দয়া করে নিয়ে এসেছিলেন, খেতে দিয়েছিলেন, এত ভালোভাবে রেখেছেন, তাই তো?'

লোকটা বলল, 'খানিকটা তাই। আবার খানিকটা না। তোমাকে আমি অপশন দেব।'

রুমা কৌতূহলী হল, 'কী অপশন?'

লোকটা বলল, 'তোমাকে আমরা একটা হোমে পুনর্বাসন দিতে পারি। সারাদিন ওখানে হাতের কাজ করবে, একটা নিশ্চিন্ত জীবন পাবে। নিজের মতো করে থাকতে পারবে। অথবা, আরেকটা জীবন দিতে পারি, যেখানে তুমি নিজের জীবনের বিনিময়ে অসংখ্য মানুষের কাজে আসতে পারবে।'

রুমা বলল, 'আমি হোমে যাব। এই কাজ করব না। এভাবে একেকজন এসে শরীর নিয়ে জ্ঞান দেবে, আমি শুনব না। কিছুতেই না।'

লোকটা হাসি মুখে রুমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কাল সকালেই তোমাকে একটা ভালো সরকারি হোমে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। ভালো থেকো রুমা।’

রুমা অবাক হয়ে বলল, ‘এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেলেন? কোনও জোর করলেন না?’

লোকটা বলল, ‘কাজটা জোরের নয়। তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমাকে এই কাজে নামাব না।’

রুমা বলল, ‘আর ওই মহিলাকে? যাকে আটকে রেখে দিয়েছেন?’

লোকটা বলল, ‘বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছেন।’

রুমা বলল, ‘বিশ্বাস করছি না। এখন আমার আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না।’

লোকটা উঠে দাঁড়াল, ‘তুমি হোমে যেতে চাইছ রুমা। আমার কথায় বিশ্বাস কর আর না কর, তাতে কিছু যায় এসে না। ভালো থেকো। আমি আসি।’

ম্যাডামকে নিয়ে লোকটা বেরিয়ে গেল। রুমা হতভম্ব হয়ে বসে রইল।

৩৯

ভাত খেয়ে দিব্যেন্দু কার্ড বোর্ডের উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এত ক্লান্ত ছিল, একবারও ঘুম ভাঙেনি।

সুখেন ডেকে দিল, ‘ওঠো। মামা ওঠো। ঘুমিয়ে থাকলে হবে না। পালাও।’

দিব্যেন্দু ধড়মড় করে উঠে বসল, ‘কেন? কী হয়েছে?’

সুখেন বলল, ‘এখানকার লোকজন তোমায় খুঁজছে মানে খবর আছে। এখন ভোর হচ্ছে। এখানে রাত শুরু হবে। এরা এখন ঘুমোবে। তুমি কেটে পড়। নইলে তোমায় কোথায় নিয়ে কী চুলকে দেবে কেউ জানে না। লুকা সাঁতরাকে তো চেনো না।’

দিব্যেন্দু বলল, ‘লুকা সাঁতরা কে?’

সুখেন বলল, ‘আছে একজন। চুলকানি পাবলিক। ঠিক ঠাক চুলকে দিলে সারাজীবন পৃথিবীর সব চুলকানির মলম লাগালেও সে ব্যথা কমবে না। চল। তুমি ঢ্যামনা হতে পারো, কিন্তু চোখের সামনে একটা লোকের মার গাঁড়া যাবে, সেটা আমি দেখতে পারব না। চল চল।’

দিব্যেন্দুকে টানতে টানতে ঝুপড়ি থেকে বের করল সুখেন। দিব্যেন্দু ক্ষীণ গলায় বলল, ‘আমার হাগা পেয়েছে।’

সুখেন বলল, ‘উফ! কী ঝামেলা! যাও, ওই রাস্তার হাই ড্রেনে গিয়ে ঝেড়ে আসো। কেউ নেই এখন। যাও যাও।’

দিব্যেন্দু কাতর চোখে তাকাল। সুখেন বলল, ‘কিছু করার নেই, আমরাও এভাবেই করি। সব ইতর লোক এখানে। যাও মামা।’

সুখেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে লাগল।

দিব্যেন্দু মিনিট পাঁচেক পরে ধুঁকতে ধুঁকতে এল। সুখেন বলল, ‘হাত ধুয়েছ?’

দিব্যেন্দু বলল, ‘সাবান কোথায়?’

সুখেন বলল, ‘ফাইভ স্টারে এয়েচো মামা? মাটিতে হাত মুছে কলে হাত ধোও।’

দিব্যেন্দু সুখেনের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে তাই করল। সুখেন বলল, ‘আজিব চিজ মাইরি একটা। হাতুড়ি মেরে বেড়ায়। চল।’

সুখেন হাঁটতে শুরু করল। দিব্যেন্দু সুখেনের পেছন পেছন হাঁটছিল। কিছুক্ষণ পরে বড় রাস্তায় উঠে সুখেন সন্তর্পণে চারদিকে তাকাল। বলল, ‘নাহ্। ঠিক আছে। এস। বাস স্ট্যান্ডে বোস। বাস এলে চলে যাবে।’

দিব্যেন্দু বাস স্ট্যান্ডে বসল। সুখেন বলল, ‘চলে যেতে পারবে তো?’

দিব্যেন্দু বিড় বিড় করে বলল, ‘টাকা নেই। সব নিয়ে নিয়েছে।’

সুখেন বিরক্ত মুখে দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা টাটা সুমো এসে দাঁড়াল। সুখেন সুমোটার দিকে তাকিয়েই, ‘মাড়িয়েছে’ বলে তেড়ে দৌড় মারল। দিব্যেন্দু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল। গাড়ির দিকে তাকাল। দুজন ষণ্ডা লোক গাড়ি থেকে নেমে কলার ধরে কুকুরের মতো করে দিব্যেন্দুকে গাড়িতে তুলল। দিব্যেন্দু চিঁচিঁ করে বলল, ‘ছেড়ে দাও আমাকে। আমি কিছু করিনি। ছেড়ে দাও।’

সুখেন দৌড়ে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। গাড়ির ভেতর থেকে একজন চিৎকার করল, ‘তুই কাল ঢপ মারলি তো? তোকে দাদা বুঝে নেবে।’

সুখেন কান ধরল। গাড়ি স্টার্ট দিল। দিব্যেন্দু চিৎকার করল, ‘আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? পুলিশ! পুলিশ।’

মাথায় একটা গাট্টা পড়ল তার, ‘চিল্লাবি না। চিল্লালে মটকা গরম হয়ে যায়। তোকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।’

দিব্যেন্দু বলল, ‘কোথায়? কিডনি বেচবেন? চোখ বেচবেন? আমার কিডনি ঠিক নেই, বিশ্বাস করুন। দিনে অনেকবার হিসি পায়।’

গাড়ির ভেতরে সব লোক হো হো করে হেসে উঠল। একজন তার গাল টিপে দিয়ে বলল, ‘সোনা আমার, মানিক আমার। তোমায় কেন বেচবো? তোমার বিচি খুলে নিয়ে আমরা মারবেল খেলব। একদম চিন্তা কোরো না সোনা। তোমাকে তোমার মামা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।’

দিব্যেন্দু বলল, ‘আমার মামা-মামি সব মরে গেছে। মাইরি বলছি, বিশ্বাস করুন।’

গাড়ির ভেতর সবাই জোরে জোরে হাসতে শুরু করল।

কেউ কেউ দিব্যেন্দুর চুল টানতে লাগল, কেউ আবার গাল টিপে দিল। কেউ হঠাৎ করে দিব্যেন্দুর গালে চুমু খেল। দিব্যেন্দু চিৎকার করতে লাগল, ‘এটা ভালো হচ্ছে না কিন্তু। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমায়?’

একজন বলল, ‘গরিলা দিয়ে তোমায় মাড়াবো বাওয়া।’

দিব্যেন্দু ভয়ে সিঁটিয়ে গাড়ির মধ্যে বসে রইল।

৪০

জিভ পুড়ে গেছে। গরম চা খাবার অভ্যাস না থাকলে এটা স্বাভাবিক ঘটনা।

লুকা বিচ্ছিরি মুখ করে বসে আছে। রোজ মদ খায়। আজ সকালে উঠে ইচ্ছে হল চা খাবে। গরম চা জিভে পড়তেই পুড়ে গেল।

এত বিরক্ত লাগছে। লুকার ঠাকুরদা দাবি করেছিল জব চার্নকের আসার আগে তারাই কলকাতার মালিক ছিল। জমিদার ছিল নাকি! মামলা ঠুকে দিয়েছিল। সে মামলা গ্রাহ্য হয়নি। ‘আদালতের সময় নষ্ট করবেন না’ বলে খুব রেগে গিয়েছিলেন জাজ।

লুকার ঠাকুরদা ভদ্রলোক এমনিতেই খ্যাপা ছিলেন। এই ঘটনার পর পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলেন। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে কিছুদিন ট্রাফিক কন্ট্রোলের চেষ্টা করেছিলেন। মাঝে মাঝে নেতাজির সঙ্গেও কথা বলতেন, ‘আমাদের চেষ্টা করতেই হবে, ইম্ফল কতদূর? আসছি আমি নেতাজি, তোমার সঙ্গে ঘোড়ায় আমিও চড়ব।’

শেষমেশ স্ট্যাচুর ঘোড়ায় চড়তে পারেননি। পুলিশ তাড়া দিয়েছিল।

লুকা ঠাকুরদাকে ভারি ভালোবাসত। কিন্তু বাবাকে যদি বলত, 'আমি ঠাকুরদার মতো হব', তাহলে বাবা গম্ভীর হয়ে বলত, 'চুপ কর, বলদ।'

লুকা বলত, 'বলদ কী বাবা?'

বাবা বলত, 'যারা কিছু বোঝে না, তাদের বলদ বলে।'

লুকার ভোকাবুলারিতে শব্দটা যুক্ত হল। স্কুলে কী করে যেন সে শিক্ষককে বোঝাতে পারছিল না নখ কেন কেটে আসেনি, প্রার্থনার সময়ে বলেই দিল, 'আপনি একটা বলদ।'

তখন এখনকার নিয়ম ছিল না। স্কুলে শিক্ষকদের হাতে গবাদি পশু মারার মতো লাঠি মজুত থাকত। একটা গোটা লাঠি তার পিঠে পড়েছিল।

লুকা তখন থেকেই ঠিক করে নিয়েছিল,

১) সে আর পড়াশুনা করবে না,

২) যে শিক্ষকের জন্য পড়াশুনা ছাড়ল, তাকে দেখে নেবে।

লুকা চুরি শিখল, ছিনতাই শিখল, ছিনতাই দলের নেতা হল। বহুদিন তক্কে তক্কে ছিল, একদিন সুযোগ এল। সেই পিটি টিচারকে রাস্তায় ধরল। গম্ভীর মুখে বলল, 'আপনি জানেন আমি সেদিন কেন নখ কাটিনি?'

সেই টিচার লুকাকে চিনতে পারেননি। অবাক গলায় বললেন, 'কে আপনি?'

লুকা বলল, 'একটা পেয়ারার ডাল ভেঙেছিলেন। স্যাটাভ্যাঙা কেলিয়েছিলেন, মনে আছে? লোকেশ সাঁতরা। ভুলে গেলেন নাকি নামটা?'

ভদ্রলোক ফ্যাকাসে চোখে লুকার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'মনে পড়েছে। তা বাবা তুমি কী করবে?'

লুকা বলল, 'আমি গত কয়েকদিন ধরে আপনাকে দেখছি। বেশ কয়েকদিন।'

ভদ্রলোক আরও ঘাবড়ে গেলেন, 'কেন? আমি কী করেছি?'

লুকা বলল, 'কিছুই করেননি। তখন ছোট ছিলাম। ভাবতাম বড় হয়ে আপনাকে পেলে একই রকম ক্যালাবো। তারপর বুঝলাম টিচারদের মারতে নেই। তাই ঠিক করেছি আপনাকে ক্যালাবো না। আপনি যান। যেখানে যাচ্ছিলেন, যান।'

ভদ্রলোক কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে লুকা তাকে ছেড়ে দিয়েছে। তিনি ঘাবড়ে পালাতে গিয়ে দুবার হোঁচট খেলেন। লুকা হাত নেড়ে আবার ডাকল, 'শুনুন স্যার।'

ভদ্রলোক আবার ভিতু মুখে এলেন।

লুকা দাঁত বের করল, 'ভাগ্যিস কেলিয়েছিলেন। পড়ালেখা করলে আপনাদের মতো ডরপোক তৈরি হতাম যাদের এটুকু ধক নেই বলার যে মেরেছিলাম, বেশ করেছিলাম। এখন আমি মোস্ট ওয়ান্টেড। তেরোটা মার্ডার কেসের আসামি। ভাবতে পারেন! যাকগে, যান। আপনি আমার টিচার। তাই ছেড়ে দিলাম। ফুটুন।'

ভদ্রলোক দাঁড়ালেন না। পড়িমরি করে পালিয়ে গেলেন। লুকা ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। আজকেও লুকা হাসছিল। দিব্যেন্দুকে দেখে। ভেঙে পড়া, চোখের তলায় কালি পড়া একজন ছাপোষা কেরানি। হাতুড়ি মেরে দিয়েছে নাকি।

লুকা বলল, 'কীরে? কী করেছিস তুই?'

দিব্যেন্দু সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লুকা ধমক দিল, 'এক চড় মারব খানকির ছেলে। উত্তর দিচ্ছিস না কেন?'

দিব্যেন্দু বলল, 'কী করেছি মানে, ওই হাতুড়ি মেরে দিয়েছি।'

লুকা বলল, 'কেন মেরেছিস?'

দিব্যেন্দু বলল, 'বউয়ের কথা মনে পড়ছিল।'

লুকা বলল, 'বউয়ের কথা মনে পড়ছিল বলে হাতুড়ি মেরে দিবি? বউকেও মারতিস?'
দিব্যেন্দু বলল, 'হ্যাঁ। বউ তাই পালিয়েছে।'
লুকা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, 'আজব চিড়িয়া তো। গুন্ডামি করবি?'
দিব্যেন্দু বলল, 'পারি না স্যার। আমি ক্লার্ক।'
লুকা দলের বাকিদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল, 'কচুরি নিয়ে আয়। এটাকে খাওয়া। ক্লার্ক গিরি বের করছি মাদারচো...র।'
দিব্যেন্দু নড়ল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'যা করবেন করে ফেলুন। আমার আবার পায়খানা পেয়েছে। এখানেই করে দেব নইলে। আমার পেট ভালো না। প্যান্টে হলে আমার সাইজের প্যান্ট পাবেন?'
লুকা হো হো করে হেসে উঠল, 'এ কে বে? শান্তিগোপাল?'

৪১

বাড়ি এসেও অরিত্র ঘুমোতে পারছে না। অস্বস্তি হচ্ছে। আজে বাজে কথা মনে আসছে।
এণাক্ষীর ফোনে বেশ কয়েকবার ফোন করে দেখল। আগেও করেছে। একই কথা বলে যাচ্ছে।
নীলকে ফোন করল। নীল ফোন ধরে বলল, 'আপনাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম।'
অরিত্র আশান্বিত হল, 'খবর পাওয়া গেছে?'
নীল বলল, 'হোটেলের সামনের রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজটা পাওয়া গেছে। আপনার স্ত্রী যে হোটেলে ঢুকেছেন ব্যাগ নিয়ে সেটা দেখা যাচ্ছে।'
অরিত্র বলল, 'আর বেরোনোটা?'
নীল বলল, 'বেরনোটা দেখা যায়নি। কারো সঙ্গে বেরিয়েছে, সেটাও দেখা যায়নি। এর একটা মানে হতে পারে, আপনার স্ত্রী হোটেলেই আছেন।'
অরিত্র বলল, 'তাহলে?'
নীল বলল, 'আপনি কি শিওর যে আপনার স্ত্রীর অন্য কারো সঙ্গে কোনও অ্যাফেয়ার ছিল না?'
অরিত্র রেগে গেল, 'মানে?'
নীল বলল, 'দেখুন, আপনি রেগে যাবেন না, কিন্তু ইনভেস্টিগেশনের জন্য আমাদের সব কথাই জানা দরকার। হতে পারে আপনি জানেন না। হতে পারে আপনার অগোচরেই আপনার স্ত্রী কারো সঙ্গে কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এবার তিনি নিজের কন্সেন্টে যদি অন্য কারো ঘরে থাকেন, তবে আমি কেন, আমার বাপেরও অসাধ্য আপনার স্ত্রীকে খুঁজে বের করা।'
অরিত্র থমকে গেল, 'আমি...আমি জানি না। আমি বিশ্বাস করি না এণাক্ষী এরকম কোনও সম্পর্কে জড়িয়েছে।'
নীল বলল, 'আমরা কেউই বিশ্বাস করি না। প্রত্যেকেই আমরা আমাদের পার্টনারকে প্রচুর বিশ্বাস করি। সম্পর্কে ওটাই তো সব থেকে বড় কথা। কিন্তু এর পরেও কিছু জায়গা থাকে। আপনি বুঝতে পারছেন আমি কী বলছি?'
অরিত্র গম্ভীর হল, 'হ্যাঁ। আমি বুঝতে পারছি, আপনি কী বলছেন। যদি এরকম প্রমাণ থাকে, তাহলে সেটাও আপনি আমাকে বলে দিতে পারেন। আমি কিছু মনে করব না। সত্যিটাকে তো মেনে নিতেই হবে। জোর করে কিছু আটকে রাখা যায় না।'

নীল বলল, ‘আমরা সবরকম সম্ভাবনাই যাচাই করে দেখছি। আমার কাছে প্রমাণ কিছু নেই। তাও আপনাকে বলে রাখলাম।’

অরিত্র বলল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ অফিসার।’

নীল বলল, ‘টেক কেয়ার।’

অরিত্র চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল। এণাক্ষীকে সন্দেহ করার মতো সত্যিই কি কিছু ঘটেনি? তা তো না। এণাক্ষী তার কথা শোনেনি, নিজের মতো চলেছে। তার সামনেই প্রোডিউসারের গলা জড়িয়ে ধরে ছবি তুলেছে। যে মেয়েটা বরের সামনে এরকম করতে পারে, বরের সঙ্গে ঝগড়া করার পর তার প্রতিশোধ নিতে তো আরও অনেক কিছুই করতে পারে। রিভেঞ্জ সেক্স শব্দটা নিয়ে তো এককালে তারাই কত মজা করেছে।

মাথাটা দপ দপ করছিল। মাথায় অদ্ভুত সব ছবি আসতে শুরু করেছে। এণাক্ষী তাকে ছেড়ে অন্য কারো সঙ্গে চলে গেছে, তার সঙ্গে শুয়েছে, একটা অচেনা অজানা হাত তার শরীর জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বমি পেয়ে গেল তার। বাথরুমে গিয়ে হড়-হড় করে বমি করে দিল।

নীল একটা ইঙ্গিত দিয়েছে। এণাক্ষী তার মানে হোটেলের মধ্যেই আছে। বেরোতে গেলে তো লোকের সামনে দিয়েই বেরোতে হবে।

অরিত্র দেরি করল না। তৈরি হয়ে আবার গাড়ি নিয়ে বেরোল। এখন সকাল হয়েছে। রাস্তাঘাটে যথেষ্ট ভিড়। জ্যাম আছে। চিংড়িহাটা ক্রস করার সময় সে ঠান্ডা মাথাতেই বেরোচ্ছিল, হঠাৎ করে একটা সুমো তাকে পেছন থেকে মেরে দিল।

অরিত্র গাড়ি থেকে নামল। সুমোর ড্রাইভারের কাছে গিয়ে বলল, ‘কী হয়েছে?’

ড্রাইভার বলল, ‘সামনে গিয়ে বাঁ দিকে দাঁড় করান। সেটল করে নিচ্ছি।’

অরিত্রর মাথায় রক্ত উঠে গেল, ‘সেটল করবি, কী সেটল করবি? তোর বাবার চাকর নাকি?’

দরজা খুলে ড্রাইভারের কলার ধরল সে। মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমে গেল। ড্রাইভারও ছাড়ল না। হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। জামা ছিঁড়ল, মুখ থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করল।

অরিত্র থামল না। মারপিট চালিয়ে গেল। তার সব দুশ্চিন্তা, রাগ ড্রাইভারের উপর ঝাড়তে শুরু করল...

৪২

সিসিটিভি লাগানোর আগেই টাকাগুলো জায়গা মতো রেখে দিয়েছিল পূর্ণ। ক্যামেরা লাগানো শুরু হয়েছে আবার। তার টানা হচ্ছে।

পূর্ণ মন খারাপ করে বসে ছিল। পোড়া কপাল তার। টাকাগুলো পেলে কিছুটা ভালো থাকা যেতো। মানুষের জীবনে টাকার থেকে দরকারি আর কিছু নেই। সম্পর্ক টিকে থাকে এর জন্যই। ভালোবাসা অবধি জানলা দিয়ে পালায় যদি টাকা না থাকে। সে কী পেল? টাকাগুলোই নাকি নকল। নকল মানুষে ভর্তি পৃথিবীতে টাকা আসল লাগে নাকি!

ফোন বাজছে। বাপিদা। পূর্ণ ধরল, ‘বলো।’

বাপিদা বলল, ‘ক্যামেরা লেগে গেছে?’

পূর্ণ বলল, ‘লাগাচ্ছে। অত হড়বড় করলে হয় নাকি? আমি তো আছি, দেখছি। চিন্তা কোরো না।’

বাপিদা বলল, ‘হয়ে গেলে আমাকে ফোন করবে। এখান থেকে কী করে দেখতে হবে আমি জেনে নেব। আজ থেকে কিন্তু তোমাকে আমি এখান থেকেই দেখতে পাবো।’

পূর্ণ বলল, ‘দেখো। কী আছে তাতে? তোমার বাড়ি কি আমি খেয়ে ফেলব?’

বাপিদা হাসল, 'তা না। তোমার কাজও হালকা হয়ে যাবে। ক্যামেরা লেগে গেলে তোমাকে কি আর সারাক্ষণ থাকতে হবে?'

পূর্ণ প্রমাদ গুনল। মানে, কী বলতে চাইছে?

সে বলল, 'চাকরি ছাড়িয়ে দেবে?'

বাপিদা বলল, 'সারাক্ষণ তো আর লাগবে না। ক্যামেরা থেকেই আমি সব দেখে নেবো। তুমি অন্য কাজ করতে পারবে।'

পূর্ণ বলল, 'আমার অন্য কাজ নেই। কোথাও কোনও কাজ করি না বলেই এখানে থাকতে এসেছি।'

বাপিদা বলল, 'ঠিক আছে। আমি দেখছি কী করা যায়।'

পূর্ণ বলল, 'না, তুমি ঠিক করে বল। আমাকে কি কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবে?'

বাপিদা বলল, 'আহা, তা বলেছি নাকি? আমি শুধু বলতে চাইছি, ক্যামেরা লেগে গেলে তোমার উপর থেকে চাপটা কমে যাবে। এদিক সেদিক যেতে আর কোনও বাধা রইল না।'

মাথা দপদপ করছিল। ওই ছোট ছোট ক্যামেরাগুলো এত সহজে তার চাকরি খেয়ে ফেলল? পৃথিবীটার চারদিকেই এভাবে চাকরি খাবার মেশিন লেগে যাচ্ছে। মানুষের কোনও দাম থাকছে না। মেশিনই সব কাজ করে দেবে।

মুখে বলল, 'ঠিক আছে। আমি দেখে রাখছি। হয়ে গেলে ফোন করব।'

ক্যামেরা লাগাতে দেড় ঘণ্টা লাগল। কোনও ব্যাপারই না। ইন্টারনেট কানেকশন করিয়ে রাউটার লাগিয়ে বাপিদাকে ফোন করে সব বুঝিয়ে দেওয়া হল।

ছেলেগুলো চলে যাওয়ার পর পূর্ণর অস্বস্তি হওয়া শুরু করল। ভারি মুশকিল হল তো। সে উঠবে, বসবে, ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা করবে, সবই বাপিদা দূর থেকে বসে দেখতে পাবে? কেউ যদি সব সময় তার উপর চোখ রেখে চলে, তাহলে তো সমস্যা। তখন ভয় পাচ্ছিল চাকরি চলে যাবার, এখন মনে হচ্ছে চাকরি গেলেই ভালো হতো।

সন্ধে হল। পূর্ণ বসার ঘরের মেঝেতে চুপ করে শুয়ে ছিল। মেজাজ ঠিক লাগছিল না, এমন সময় তার ফোন বেজে উঠল। আবার বাপিদা। ফোন ধরে বিরক্ত গলায় বলল, 'বলো।'

বাপিদা বলল, 'ঠাকুরঘরের আলমারিটা অন্য দিকে ঘোরানো দেখলাম? কী হয়েছে?'

পূর্ণ বলল, 'আমি ঘরটা পরিষ্কার করে দিলাম। ঠাকুরের জায়গা, সেখানে নোংরা হয়ে থাকলে কি ভালো দেখায়?'

বাপিদা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে কড়া গলায় বলল, 'তোমাকে আমি ওই ঘরে যেতে বারণ করেছিলাম। তুমি ভুলে গেছ মনে হয়।'

পূর্ণ বলল, 'ভুলব কেন? ঠাকুর দেবতার ব্যাপার, অপরিষ্কার নোংরা ঘরে তাদের রেখে দেওয়া কি ঠিক? তুমিই বল?'

বাপিদা বলল, 'ঠিক আছে। আর ঢোকার দরকার নেই। আলমারি খুলেছিলে নাকি আবার?'

পূর্ণ বলল, 'না বাপু। তুমি বলেছো তার পরে আবার কে খুলবে?'

বাপিদা স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বলল, 'একদম খোলার দরকার নেই। তুমি ওই একটা ঘরেই থাকো। ঠাকুরঘরে ঝাড়পোঁছ করার কিছু নেই। আমি দেখে নেব এখান থেকে।'

ফোন কেটে গেল। পূর্ণ ক্যামেরার দিকে তাকাল। কী যে অদ্ভুত জিনিস তৈরি হয়ে গেছে। মানুষও অন্তর্যামী হয়ে গেল যন্ত্রের সাহায্যে!

সে কি শহরে, না শহরের বাইরে? ঠিক কোন জায়গায় আছে সে? একসঙ্গে কতগুলো আবছা ছবি মাথার মধ্যে কেউ যেন বসিয়ে দিচ্ছে। আবার পরপর কতগুলো ছবি সোয়াইপ করার মতো ডান দিক থেকে বাঁ-দিকে চলে যাচ্ছে। কিছুতেই রুমার ঘোর কাটছে না। জানলার বাইরে দেখার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কখন যে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে নিজেই জানে না।

রাস্তা দিয়ে গাড়িটা চলছে বেশ জোরে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে একপ্রকার জোর করেই চোখ খুলল সে। তার পাশে লোকটা বসে আছে। রুমা বলল, 'কোথায় যাচ্ছি?'

লোকটা বলল, 'হোমে। তুমি হোমে থাকতে চেয়েছিলে। তোমাকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। আশা করি, বাকি জীবনটা তুমি সেখানেই থাকবে।'

রুমা বলল, 'আমার সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে কেন? আমাকে কি কোনও ওষুধ দিয়েছেন?'

লোকটা বলল, 'একটু গোপনীয়তার ব্যাপার তো থাকেই। চিন্তা কোরো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি ঠিক হয়ে যাবে।'

রুমা চুপ করে গেল। শরীর ঠিক লাগছে না।

একটা সময় গাড়ি থামল। লোকটা বলল, 'এসে গেছি।'

গাড়ি থেকে নামল রুমা।

চারতলা একটা বিল্ডিংয়ের সামনে এসে লোকটা বলল, 'এস।'

রুমার মাথা গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে ঘুরে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর সামলে নিয়ে লোকটার পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করল।

বিল্ডিংয়ের দেয়ালে বিভিন্ন প্রকল্পের বিজ্ঞাপন দেওয়া। রুমাকে অফিস ঘরে নিয়ে বসানো হল। লোকটা একটা কাগজ দিয়ে বলল, 'ফর্মটা ফিল আপ কর।'

ফর্মটা দেখতে গিয়ে হঠাৎ করে অফিস ঘরের জানলার বাইরে চোখ পড়ল রুমার। এক যুবক হাঁটছে। হাঁটার ভঙ্গিটা ভীষণ চেনা তার। অফিস থেকে ফিরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এভাবেই পায়চারি করত বারান্দায়। কিছুক্ষণ পরেই তার হাতে উঠে আসত কখনও পর্দা টাঙানোর রড, কখনও বা প্রাইমারি স্কুলের কাঠের স্কেল, কখনও তবলার হাতুড়ি। এখানে দিব্যেন্দু কী করছে?

সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

লোকটা বলল, 'কী হয়েছে?'

রুমা সভয়ে বলল, 'আমাকে গাড়িতে নিয়ে চলুন।'

লোকটা বলল, 'কেন? কী হয়েছে?'

রুমা বলল, 'প্লিজ, চলুন।'

লোকটা বলল, 'বেশ, চলো।'

আবার দৌড়তে দৌড়তে গাড়িতে এসে বসল রুমা। তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল। লোকটা জলের বোতল এগিয়ে দিয়ে বলল, 'কী হয়েছে? এবার বলা যাবে?'

রুমা বলল, 'এখানে আমার হাজব্যান্ড আছে। ও কী করছে এখানে?'

লোকটা বলল, 'এখানে? তুমি শিওর?'

রুমা বলল, 'হ্যাঁ, আমি শিওর। আমি ওকে দেখতে পেয়েছি। এটা তো লেডিস হোম। ও এখানে কী করছে?'

লোকটা বলল, 'হবে কিছু একটা। আমি তো এই হোমটাই চিনি। তোমাকে এখানেই পুনর্বাসন দেওয়া যেত। একটু অপেক্ষা করবে?'

রুমা লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে যে কাজ বলেছিলেন, সেখানেও তো আমার হাজব্যান্ডের সামনে পড়ে যাবার সুযোগ থাকবে? থাকবে না?'

লোকটা বলল, 'না থাকার চান্সটাই বেশি। তুমি হাই সোসাইটিতে যাবে যেখানে তোমার হাজব্যান্ড কোনওভাবেই পৌঁছতে পারবে না। যদি বা কোনওভাবে পৌঁছে যায়ও, তাহলেও তুমি তখন এতটাই শক্তিশালী হবে, তোমার হাজব্যান্ড কোনওরকম অসভ্যতা করার আগে তুমি প্রতিরোধ করতে পারবে।'

রুমা জোরে জোরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'আপনি ইচ্ছে করে আমার হাজব্যান্ডকে এখানে নিয়ে এসেছেন যাতে আমি আপনাদের কাজটা করি, তাই তো? আপনারা তো ওকে খুব ভালো করেই চিনে গেছেন। কোনভাবে ওকে এখানে নিয়ে এসেছেন।'

লোকটা খুশি হল, 'ভেরি গুড রুমা। এর মানে হল তোমার বুদ্ধি আছে। এটুকু বুদ্ধি কিন্তু খুব কম কিছু না। পরিস্থিতির চাপ মানুষের বুদ্ধির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়ে আবার অন্য এক পরিস্থিতিই সে বুদ্ধি বের করে আনতে পারে। তোমার বুদ্ধি আছে। এই কাজে তুমি সফল হবে। আমি নিশ্চিত।'

রুমা লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। আর কোনও কথা বলল না...।

৪৪

মাথা ধরে আছে। কিছুই ভালো লাগছে না। সারাক্ষণ মনে হচ্ছে একটা গোটা মানবজনম কেমন বৃথা হয়ে গেল তার। একটা লোক ক্যামেরা দিয়ে সারাদিন তাকে দেখবে? এটা কেমন ব্যাপার? সে খাবে দাবে ঘুরবে, সব দেখবে? রাগ হচ্ছিল। তালা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নুরুলের দোকানে বসল পূর্ণ। দোকান ফাঁকাই ছিল। নুরুল বলল, 'কীরে পুন্ন, কী হল?'

পূর্ণ বলল, 'ভাল্লাগছে না। ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়েছে। আমাকে তাড়িয়েও দেবে বোধহয়।'

নুরুল বলল, 'কী আর করবি! এখন ক্যামেরার সময়। কিছু তো করার নেই। আচ্ছা, বাপিদা ওই টাকাগুলো দিয়ে কী করে বলত?'

পূর্ণ বলল, 'জানি না। বিদেশে থাকে, জাল নোট কি বিদেশে চলে?'

নুরুল চিন্তিত মুখে বলল, 'সেই তো। ভালো ছেলে, কোত্থেকে এসব পেল কে জানে।'

পূর্ণর ফোন বেজে উঠল। বিরক্ত গলায় পূর্ণ বলল, 'দেখলি তো? বেরোতে পারলাম না, ফোন করতে শুরু করে দিয়েছে।'

নুরুল বলল, 'ধর ধর। কী আর করবি?'

পূর্ণ ফোন কেটে দিল, 'থাক। ধরব না। আমি আর কাজ করব না। অন্য কোথাও কিছু পাওয়া যায় নাকি দেখি।'

নুরুল বলল, 'খুব রেগে গেছিস দেখছি।'

পূর্ণ বলল, 'হ্যাঁ। রাগ তো হবেই। এত কষ্ট করে কাজ করলাম, কেমন ভাগিয়ে দেওয়ার ছক কষছে দেখতে পারছিস না?'

ফোনটা আবার বাজতে শুরু করেছে। পূর্ণ বলল, 'ধুস, জ্বালিয়ে খেলো তো!' ধরল, 'হ্যালো।'

বাপিদা বলল, 'কী হল? আবার বেরিয়েছ নাকি?'

পূর্ণ বলল, 'হ্যাঁ। নুরুলের দোকানে এসেছি চা খেতে। তুমিই তো বললে ক্যামেরা লেগে গেলে আর চিন্তা নেই, তাই বেরিয়েছি।'

বাপিদা বলল, 'ক্যামেরা লেগে গেল মানে যখন খুশি বেরিয়ে যাবে? তোমাকে কী বলা হয়েছিল? যখন খুশি বেরোনো যাবে না, সেটা বলেছিলাম তো?'

পূর্ণ রেগে গেল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। দাসখত দিয়ে রেখেছি নাকি?'

বাপিদা বলল, 'দাসখতই দিয়েছ। কাজের শুরুতেই আমি বলেছিলাম কাজটা এরকম হবে। সব জেনেবুঝে এরকম করছ তুমি। মাইনে নেবে না? নাকি সেটাও চাও না?'

পূর্ণ বলল, 'ছাড়ো ছাড়ো। টাকার গরম দেখিও না। নকল নোট নিয়ে চলো, ভেবে বসে আছ কেউ কিছুই জানে না।'

নুরুল অবাক হয়ে পূর্ণর দিকে তাকিয়ে ঠোটে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'কী বলছিস কী? চুপ কর!'

ও প্রান্ত একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এসব কথা কি বাজারে বলে বেড়াচ্ছ?'

পূর্ণ বোকা মানুষ। সে বুঝেছে কথাটা বলে ভুল হয়ে গেছে। সেটাকে ম্যানেজ করতে গিয়ে বলল, 'কোন সব কথা? এখানে কথার কী আছে? আমি আর নুরুল জানি। আর কেউ জানে না।'

বাপিদা বলল, 'ঠিক আছে। এসব নোট খেলনা হিসেবে রাখা হয়েছিল, তুমি আবার আলমারি খুলে সেটা নিয়ে এদিক-সেদিক বলে বেড়াচ্ছ?'

পূর্ণ বলল, 'এদিক সেদিক বলিনি। আমরা দুজনেই জানি।'

ফোনটা কেটে গেল।

নুরুল ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'এটা তুই কী করলি? এ কথা কেউ বলে? এবার জেনে গেল তুই আলমারি খুলেছিলিস'!

পূর্ণ উঠে দাঁড়াল, 'আমি যাই বরং। কী বলিস?'

নুরল বলল, 'যা। কী যে করিস। এ চাকরিটা বোধ হয় তোর গেল।'

পূর্ণ বলল, 'হ্যাঁ। ব্যাগটা নিয়ে আসি।'

পূর্ণ হাঁটতে শুরু করল। মন খারাপ হয়ে গেছে। এটাই তার সমস্যা। রাগের মাথায় কী বলে, নিজেই জানে না। আরেকবার কি বাপিদাকে ফোন করবে? নাকি করবে না?

হাঁটতে হাঁটতে বাজার পেরিয়েছে সবে, এমন সময় একটা পটকা ফাটার আওয়াজ কানে এল। পূর্ণ বিড়বিড় করতে লাগল, 'লোকের এত আনন্দ যে কোত্থেকে আসে, কে জানে!'

ব্যাগটা নিতে হবে, মাথার মধ্যে ঢুকে ছিল, রাস্তায় জোর পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে, এমন সময় দেখল পিন্টু জোরে সাইকেল চালিয়ে আসছে। পূর্ণ অবাক হয়ে বলল, 'কীরে, এত তাড়া কীসের?'

পিন্টু চিৎকার করে বলল, 'ভরা বাজারে নুরুলদাকে কারা জানি গুলি করে পালিয়েছে।'

৪৫

কামরায় উঠে চুপ করে বসে আছে দিব্যেন্দু। মাথা ধরে আছে। তাপসদা নেই, কামরুল নেই। কেউ নেই। এই ট্রেনে সে কাউকে চেনে না।

লুকা তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা হোমে নামিয়ে দিল। বলল, 'মামু, তুমি এখানে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াও। তারপর তোমার ছুটি।'

দিব্যেন্দু তাই করল। হঠাৎ করে একজন এসে তাকে বলল, 'চলো, তোমায় স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে আসি।'

তাই করল। শেয়ালদায় নামিয়ে দিয়ে গেল। পকেটে হাজার টাকা গুঁজেও দিয়েছে। দিব্যেন্দুর নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস হচ্ছিল না।

সে বেঁচে আছে? বেঁচে থাকার তো কথা না!

একই ট্রেনে পরিচিত মানুষজন না থাকলে কেমন অপরিচিত লাগে। যে ট্রেনে সে এতদিন ধরে যায়, সেই ট্রেনেই সে আছে, শুধু অন্য সময়ে, অন্য লোকজনের সঙ্গে। ওই তো, কোণে চারজন তাস পিটোচ্ছে, কিন্তু তাদের সে চেনে না।

এই সময়টা অফিস টাইম না। ভিড়ও নেই। জানলার কাছে বসে আছে। হাওয়া এসে ঝাপড় মারছে কেমন! একটু বৃষ্টিও হয়ে গেল বিধাননগর পেরনোর পর। জল এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

একটার পর একটা স্টেশন পেরোচ্ছে। হকার উঠছে। দিব্যেন্দু চুপ করে বসে আছে। সবাইকে দেখে যাচ্ছে শুধু।

এই ট্রেনটা বনগাঁ অবধি গিয়ে আবার ফিরবে। শেয়ালদায় গিয়ে আবার বনগাঁ যাবে। এই করতে থাকবে কারশেডে যাওয়ার আগে অবধি। লোক উঠতেই থাকে। ট্রেন যতই বাড়ুক, এখানে ভিড় কখনও কমে না। কামরা বাড়লেও ভিড় কমে না। তাপসদা বলে বাংলাদেশের লোকেরাও কাঁটাতার পেরিয়ে এসে বনগাঁ থেকে ট্রেনে উঠে পড়ে। সীমান্ত থেকে কলকাতা যাবার শর্টেস্ট রুট। শেয়ালদায় পুলিশ থাকে, আর পি এফ থাকে। বোকারা শেয়ালদায় নামে। চালাক লোকজন বিধাননগর বা দমদমেই নেমে যায়। তারপর ভিড়ে মিশে গেলেই হল। এভাবেই অনুপ্রবেশকারীরা এসে মিশে যাচ্ছে এ-দেশে।

তার স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়াল। দিব্যেন্দু ট্রেন থেকে নামল। সাইকেল স্ট্যান্ড থেকে সাইকেল নিল। ধীরেসুস্থে প্যাডেল করা শুরু করল।

বাড়ির সামনে এসে সাইকেল রেখে ঘরে ঢুকল।

কেউ নেই কোথাও। সে আলমারির জিনিস মেঝেয় ফেলে রেখে গেছিল। সব জিনিস সেভাবেই পড়ে আছে। কেমন একটা অদ্ভুত হাহাকারের মতো ব্যাপার হচ্ছে। যে মেয়েটার উপর সব হতাশা ঝাড়ত, সেই মেয়েটাই নেই। কেমন বিচ্ছিরি ব্যাপার! সোফায় চুপ করে বসে কিছুক্ষণ টিভি দেখল। গা হাত পা ব্যথা শুরু হল আবার।

কলিং বেল বাজছে। দিব্যেন্দু বিরক্ত মুখে উঠে দরজা খুলল। বলভদ্র দাঁড়িয়ে আছেন। দিব্যেন্দুকে দেখে বললেন, 'কী একটা খবর শুনলাম! তোমার চোখে কালো দাগ কীসের?'

দিব্যেন্দু বলল, 'আসুন।'

বলভদ্র ঘরের ভিতর ঢুকে চোখ কপালে তুললেন, 'এসব কী?'

দিব্যেন্দু বলল, 'বউ পালিয়েছে। কী করব? ভাবলাম ওর নামে ইনসিউরেন্স করব। তার আগেই পালিয়ে গেল।'

বলভদ্র বললেন, 'পালিয়ে গেল? বেশি মারতে নাকি?'

দিব্যেন্দু বলল, 'খুব বেশি কিছু না তো!'

বলভদ্র জোরে জোরে মাথা নাড়ালেন, 'না। বেশি মারতে। মারার মাপ আছে। ঠিক ঠাক মারতে পারলে পালাবে না। ডোজ বেশি হয়ে গেলে পালায়। ঠিক আছে, কিছুদিন যাক, আরেকটা বিয়ে কর। কমবয়সি। সেটাকে কী করবে, আমি বলে দেব। ওভাবে ডোজ বাড়াতে নেই। লোক জানবে কেন? আর্ট তো ওতেই।'

দিব্যেন্দু বলল, 'আমি আর বিয়ে করব না।'

বলভদ্র বললেন, 'ওরকম সবাই বলে। একা থাকা সম্ভব নাকি? কেউ তো থাকবে যে খিদমত খাটবে। যা বলবে তাই করবে। রান্না করবে, ঘর ঝাঁট দেবে, ঘর মুছে দেবে, পুজো দেবে আবার রাতে বিছানা গরম করবে। কাজের মেয়ে থেকে রাঁধুনি হয়ে বেশ্যা, সব এক প্যাকেজ। বুঝলে না?'

দিব্যেন্দু শক্ত হয়ে বলল, 'আমি বিয়ে করব না, বললাম তো। মাগী চলে গেলে অনেক ঝামেলা। আমি অত ঝামেলা নিয়ে পারব না।'

বলভদ্র শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তাহলে আর কী? একটা ইনসিউরেন্স করে নাও।'

দিব্যেন্দু বলল, 'নমিনি কে হবে? আপনার বাবা?'

বলভদ্র বললেন, 'রেগে গেলে কেন? কী হয়েছে?'

দিব্যেন্দু বলল, 'কিছু না। আপনি যান তো। ভালো লাগছে না।'

৪৬

—আপনিই অরিত্রবাবু?

—হ্যাঁ।

অফিসার তীক্ষ্ণ চোখে অরিত্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনলাম কাল রাতে আপনি অনেকটা সিন ক্রিয়েট করেছেন।'

অরিত্র অফিসারের দিকে তাকিয়ে আছে। রাস্তায় ঝামেলা করেছে সে। প্রথমে পুলিশ এসে তাকে স্থানীয় থানায় নিয়ে গেছিল।

বেশ খানিকক্ষণ তাকে বসিয়ে রেখে অন্য একটা ইনভেস্টিগেশন সেন্টারে তুলে নিয়ে এসেছে। অরিত্রর মাথা এতটাই ঘেঁটে আছে, সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না যে তাকে কোথায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অফিসার বলল, 'করেছেন তো ঝামেলা? কাল রাতে?'

অরিত্র বলল, 'ইচ্ছে করে তো করিনি। আমার ওয়াইফকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিলজলা থানায় গিয়ে মিসিং ডায়েরি করেছি। হোটেলে গেছি। এটাকে ঝামেলা বলে কি?'

অফিসার বলল, 'বলে। আমার কাছে রিপোর্ট আছে। আপনার চালচলন, কথাবার্তা অন্য সন্দেহ তৈরি করছে। আপনি সেটা বুঝতে পারছেন?'

অরিত্র অবাক হয়ে বলল, 'কী সন্দেহ তৈরি করছে?'

অফিসার বলল, 'হতে পারে আপনি কোনও কন্ট্রাক্ট কিলার দিয়ে আপনার স্ত্রীকে খুন করেছেন।'

অরিত্রর মাথা ঘুরে গেল। সে চিৎকার করতে শুরু করল, 'এ সব কী বলছেন আপনি? আমি আমার স্ত্রীকে খুন করতে যাব কেন?'

অফিসার শান্ত গলায় বলল, 'এফেক্ট অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। এরকম হতেই পারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনও কখনও সন্দেহ এতটাই বেড়ে যায় যে হাজব্যান্ড ওয়াইফকে খুন করে ফেলে। বাইরে নাটক করতে গিয়ে অনেকটা বেশি হয়ে যায়, সেটা হাজব্যান্ড বুঝতে পারে না।'

অরিত্র বলল, 'আপনি এরকম আজে বাজে কথা বলে যাচ্ছেন কেন? আমি কেন এণাক্ষীকে খুন করতে যাব? এক মিনিট, এক মিনিট। খুন হয়েছে মানে কী? কী বলতে চাইছেন?'

অফিসার বলল, 'আমরা সব অপশন যাচাই করে দেখছি। হতেই পারে আপনি কোথাও গুম করে রেখেছেন ওকে। রাস্তাঘাটে অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা লাগিয়ে ফেলছেন যাতে আপনার উপরে কোনও সন্দেহের তির না আসে।'

অরিত্র মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করল, 'শুনুন অফিসার। আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে হেকল করতে চাইছেন। আমার স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় একটা ঠিকঠাক ইনভেস্টিগেশন করে ওকে খুঁজে বের করবেন, তা না, আপনি উল্টোপাল্টা অ্যালিগেশন করে যাচ্ছেন।

তিলজলা থানার অফিসার নীল কিন্তু জানেন আমার হোয়ার অ্যাবাউটস। আমাকে অযথা অ্যাটাক না করে সেই এনার্জি এণাক্ষীকে খুঁজতে ব্যবহার করলে ভালো হতো না?'

একটা বাল্ব জ্বলছে। অফিসার উঠে বাল্বের সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'সব রকম সন্দেহ আপনার উপরে আসছে। আপনি বুঝতে পারছেন না। ঠিক আছে, আপনি বাড়ি যান।'

অরিত্র বলল, 'কোনরকম সন্দেহই আমার উপরে আসছে না। আপনারা জোর করে আমার উপর কোনও কিছু প্ল্যান্ট করার তালে আছেন। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।'

অফিসার অরিত্রর দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট করে বলল, 'আপনি বাড়ি চলে যান। আপনার গাড়িটা আটক হবে। পরে দেখছি কী করা যায়।'

অরিত্র বলল, 'আপনারা সিসিটিভিতে দেখেননি? আমার কোনও দোষই ছিল না। খামোখা আমার গাড়িটা আটকে রাখছেন কেন? আমার স্ত্রীকে খুঁজতে গাড়িটা দরকার ছিল। প্লিজ গাড়িটা ছেড়ে দিন।'

অফিসার বলল, 'বললাম তো, আমরা সব সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছি। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার যা অবস্থা, আমরা আপনাকে গাড়ি চালাতে দিতে পারি না। দেখছি কী করা যায়।'

অরিত্র বলল, 'আর এণাক্ষী? ওর কোনও খবর পাওয়া গেছে?'

অফিসার অরিত্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি শিওর, জানেন না আপনার স্ত্রী কোথায়?'

অরিত্র বলল, 'আমাকে বার বার একই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন কেন বলুন তো?'

অফিসার বলল, 'আপনি এখন ভদ্রভাবে বাড়ি চলে যান। মনে রাখবেন, অতিরিক্ত সক্রিয়তা বিপদের কারণ হতে পারে।'

কথাটা বলে অফিসার হাসল। অরিত্র অবাক চোখে অফিসারের দিকে তাকিয়ে রইল। অতিরিক্ত সক্রিয়তা মানে?

৪৭

খারাপ সময় এলে কি মাথার উপর শকুন ঘুরে বেড়ায়? কাক চিলে তার শরীর নেবে বলে ঝগড়া শুরু করে? এরকমই তো শুনেছিল ছোটবেলায়।

কোত্থেকে একটা পাখি এসে মাথার উপরে ঘুরছে। বাজারসুদ্ধ লোক নুরুলের দোকানের দিকে দৌড়চ্ছে। পূর্ণ হতবাক হয়ে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

ফোন বাজছে। পূর্ণ ফোন ধরল, 'হ্যাঁ।'

বাপিদা বলল, 'বাড়ি যাচ্ছ?'

পূর্ণ বলল, 'আরে বাড়ি যাব কী, নুরুলকে কে খুন করে দিয়েছে!'

বাপিদা হাসল, 'তাই নাকি?'

পূর্ণ বলল, 'হাসছ তুমি? এটা হাসার বিষয়? তুমি এখানে থাকতে না? নুরুলকে চেনো না তুমি? জানো না ওর পরিবার আছে?'

বাপিদা ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমার জানার দরকার নেই। আমি শুধু এটুকু জানি, তুমি যদি ওই টাকার ব্যাপার আর কাউকে বলো, তার অবস্থাও নুরুলের মতো হবে। তুমি কি সেটা চাও?'

পূর্ণ হতভম্ব হয়ে বলল, 'মানে? তুমি করিয়েছ?'

বাপিদা বলল, 'বাড়ি যাও। অনেক কাজ আছে। বাজারে দাঁড়িয়ে থেক না। ইমন পেইন্টের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছ, যাও। ফিরে যাও।'

পূর্ণ বলল, ‘তুমি দেখতে পাচ্ছ কী করে?’

বাপিদা বলল, ‘ইচ্ছে করলে সব দেখা যায়। যা বলছি করো।’

ফোন কেটে গেল। পূর্ণ বোকাসোকা মানুষ। বেশি বুদ্ধি তার কোনকালেই ছিল না। কিন্তু বাপিদার কথা শুনে সে ভয় পেয়ে গেল। চেনা জানা মানুষটা কেমন যেন অচেনা হয়ে গেছে।

টোটো যাচ্ছিল একটা। পূর্ণ তাতেই উঠে বাপিদার বাড়ির ঠিকানা বলল। টোটোওয়ালা বলল, ‘নুরুলদা মার্ডার হয়েছে, শুনেছেন?’

পূর্ণ বিড়বিড় করে বলল, ‘হ্যাঁ, শুনেছি বাপু। তুমি তাড়াতাড়ি চলো। বাড়িতে অনেক কাজ।’

টোটোওয়ালা বক বক করে যেতে লাগল, ‘ভাবা যায় না, এসব এলাকায় এককালে একটাও বাইরের লোক আসত না। আর এখন নাকি কে বাইকে করে এসে খুন করে দিয়ে গেল! কী অবস্থা বুঝতে পারছেন? আর সে কী টিপ! কুত্তামারা টিপ যাকে বলে। কপালের মাঝ বরাবর গুলি করে দিয়ে গেছে। ভালো মানুষ ছিল। কারো সাতে পাঁচে থাকত না। সেই লোকের এই হাল করে দিয়ে গেছে। ভাবা যাচ্ছে না।’

পূর্ণ বলল, ‘কী আর করা। সবার নিজের নিজের কপাল।’

বাড়ির সামনে নেমে পড়ল পূর্ণ। তালা খুলে ঘরের ভেতর গিয়ে তালা বন্ধ করে ঢুকে পড়ল।

বুক ঢিব ঢিব করছে। ফোন বাজল আবার। সে ফোন ধরতেই বাপিদা বলল, ‘তোমাকে বোকা ভাবতাম। তুমি তো তেমন বোকা না। আলমারি খোলার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি দরকার। সেটা যখন পেরেছ, তাহলে আমার অন্য কাজগুলোও করতে পারবে। এক কাজ করো। আমার বেডরুমে দেখো একটা ব্যাগ আছে। টাকাগুলো ওই ব্যাগে ভরে নাও। একটা ঠিকানা পাঠাচ্ছি। দিনের আলো থাকতে বেরিয়ে গিয়ে ব্যাগটা ওই ঠিকানায় দিয়ে এস। পারবে?’

পূর্ণর ঘাম হচ্ছিল। সে কোনমতে বলল, ‘আমার বুক ধড়ফড় করছে বাপিদা। নুরুলকে তুমি মেরে দিলে? নুরুল আমার বন্ধু ছিল।’

বাপিদা বলল, ‘মানুষ মরল বাঁচল, তাতে কিছু যায় আসে না। এই যে তুমি না খেতে পেয়ে ঘুরে বেড়াতে, তোমার বন্ধু কি তোমায় খাইয়ে দিত? নিজেই ভেবে দেখো। এই পৃথিবীতে কেউ কারো না। একেক জন, একেক রকম। তুমি তোমার মতো। নুরুল নুরুলের মতো। আমার কথা শুনে কাজ করো, তোমাকে না খেয়ে থাকতে হবে না। তোমাকে বোকা ভাবাটা আমার ঠিক হয়নি। আগে জানতে পারলে নুরুলের প্রাণটা বাঁচত এই যা। ব্যাগে টাকাগুলো ভরে নাও। উলুবেড়িয়া গেছ কোনওদিন?’

পূর্ণ বলল, ‘না।’

বাপিদা বলল, ‘হাওড়া গিয়ে ওখান থেকে মেচেদার দিকের লোকাল ট্রেন ধরবে। উলুবেড়িয়া নেমে রিকশা নিয়ে আমার পাঠানো ঠিকানা বলবে, নিয়ে যাবে। কাজ করো। খাবারের চিন্তা করতে হবে না।’

পূর্ণর বমি পাচ্ছিল। সে ফোন কেটে দিল।

৪৮

হোটেলের রুমে ফিরে এসেছে সে। টিভি দেখছে স্থির হয়ে বসে। আবেগ শূন্য হয়ে গেছে সে। কী হবে ভেবে?

যত ভাববে, তত সমস্যা বাড়বে।

দিব্যেন্দু যখন প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে মারত, প্রথম প্রথম অনেক ভেবেছে। পরে দেখেছে, আসলে ওসব ভেবেটেবে কিছু হয় না। যা হবার, তা হয়েই যায়।

হোমে দিব্যেন্দুকে দেখার পর হৃদস্পন্দন থমকে গেছিল তার। মনে হচ্ছিল যেকোনও সময় হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। কী ভয়ংকর একটা মুহূর্ত। আবার সে লোকটার মুখোমুখি! পৃথিবীতে কি দিব্যেন্দুর থেকেও ভয়ংকর কেউ হতে পারে? না বোধহয়।

দিব্যেন্দু অফিস থেকে ফিরে জুতো খুলতে খুলতে বলত, 'আফগানিস্তানের গল্প শুনলাম। ওখানে বউরা যদি বরের কথা না শোনে, মাথায় পাথর ঠুকেই মেরে দেয়। বুঝতে পারছ, কী ভয়ংকর ব্যাপার? তার তুলনায় আমি কী? কিচ্ছু না। আমি তো আসলে ভালোবাসি তোমায়। এই যে মারি, মারার পরে কি আমার কষ্ট হয় না? কিন্তু কী করব? বউকে সিধে রাখতে হলে মারতে হয়।'

রুমা চুপ করে বসে থাকত। কী আর বলবে? বাড়ির লোক যদি সাপোর্ট না দেয়, তাহলে সব রকম পরিস্থিতি সহ্য করতে হয়। একবার কী মনে হল, মাঝরাতে হঠাৎ করে ঠেলে তুলে দিয়ে বলল, 'একটা কাজ করো। বাড়ির বাইরের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। দেখা যাক কী হয়।'

রুমা কোনও প্রতিবাদ করেনি। চুপচাপ গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

দিব্যেন্দু জানলা থেকে চুপ করে বসে তাকে দেখছিল। রুমা কাঁদেনি। পাড়ার কুকুরগুলো এসে একবার তাকে ঘিরে ডেকে চলে গেল। রুমা ভয় পায়নি। ভয়গুলো এভাবেই জয় করতে হতো।

কিছুক্ষণ পর দিব্যেন্দু তাকে ডাকল। সে আবার ঘরের ভেতর এল। দরজা বন্ধ করতে করতে শুনল দিব্যেন্দু বলছে, 'রাস্তায় দাঁড়ান অভ্যাস আছে তার মানে। দাঁড়িয়েছিলি নাকি কোনদিন?'

রুমা সে কথারও প্রতিবাদ করেনি।

প্রতিবাদ করার ইতিহাস মনে আছে তার। ব্লেড দিয়ে এমন ভাবে হাত চিরে দেবে, অসহ্য যন্ত্রণা হয়। একবার কাটা জায়গায় নুন দিয়ে দিয়েছিল। ব্যথায় সে চিৎকার করছে, দিব্যেন্দু এসে মুখে হাত দিয়ে বলেছে, 'গলা নামিয়ে চিৎকার কর শুয়োরের বাচ্চা, পাশের বাড়ির লোক জেগে যাবে।'

কলিং বেল বাজল। রুমার হুঁশ ফিরল।

সে দরজা খুলল।

লোকটা বলল, 'আসব?'

রুমা কিছু না বলে দরজা থেকে সরে দাঁড়াল।

লোকটা ঘরের ভেতর ঢুকে বলল, 'তুমি আমার উপর রাগ করে আছ। রাগ করে থেকো না। রাগ কোনও কিছুর সলিউশন হতে পারে না। আজ না হোক, কাল তোমার হাজব্যান্ড ওই হোমের ঠিকানা ঠিকই পেয়ে যেত। তারপর কী হতো ভেবে দেখেছ?'

রুমা পাথুরে মুখে বলল, 'ভাবতে চাই না। আমাকে কী করতে হবে, সেটা বলুন।'

লোকটা বলল, 'তোমার ট্রেনিংটা হোক। তারপর তুমি ঠিক করে নিও।'

রুমা বলল, 'আপনি বলেছিলেন হানি ট্র্যাপ করাবেন। শেষ অবধি ওটাই করতে হবে তো?'

লোকটার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। বলল, 'ব্রাভো। তোমার মেমোরি তো খুব শার্প। এই কাজে মেমোরি শার্প হওয়া মাস্ট। একটা কোনও কথা শুনলে, কোনও কোড, কোনও ফোন নাম্বার, মনে রাখতে হবে। তুমি টুয়েলভ অবধি পড়েছ, তারপর পড়া হয়নি। বাড়ির লোক জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করার প্রয়োজন বোধ করেনি।'

রুমা বলল, 'চেক করলে কি জানা যেত ছেলেটা ওভাবে মারে?'

লোকটা বলল, 'তুমি শক্তিশালী হলে মারতে পারত না। ধর তোমাকে মারতে এল, তুমি এমন একটা প্যাঁচ দিলে, উল্টে পড়ে গেল। কোনওদিন প্রতিরোধ করনি। করলে এত খারাপ অবস্থা হতো না।'

রুমা বলল, 'করার কথা মনে হয়নি। বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে রাখত না।'

লোকটা বলল, ‘ঠিক রাখত। এই ধরনের সাইকোপ্যাথরা শক্তের ভক্ত। নরমের যম। তুমি কি কাল থেকে ট্রেনিং শুরু করতে প্রস্তুত?’

রুমা বলল, ‘আপনি যা বলবেন।’

লোকটা বলল, ‘তুমি এখনও ভাবছ তোমাকে জোর করা হচ্ছে, তাই না?’

রুমা ম্লান হাসল, ‘সবাই একটা কথাই বলে। আমার ভালোর জন্যই নাকি করা হচ্ছে। বাবা-মা বলল ভালোর জন্য বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ও বলল ভালোর জন্য মারা হচ্ছে। কোনটা খারাপ, সেটাই ভাবছি।’

লোকটা বলল, ‘বেঁচে থাকতে চাও তো এত কিছুর পরেও? সেটার থেকে ভালো আর কী হতে পারে?’

রুমা উত্তর দিল না।

৪৯

রাত গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে।

গলির সামনে ভিড় বাড়ছে একটু একটু করে। যেন কোনও উৎসব চলছে। কত রকম মানুষ আসে, একেক জনের একেক রকম চাহিদা। প্রথম প্রথম সবাই ভয়ে ভয়ে থাকে। এক দিন, দু-দিন করতে করতে যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তাদের শরীরে আত্মবিশ্বাস ঝকঝক করতে থাকে।

সুখেনের দুটো কাস্টমার হয়েছে। পকেটে দুশো টাকা এসেছে। সে চায়ের দোকানে গিয়ে বসল।

আরেকটু রাত হলে আরও মজা হয়। সুখেন আসলে রাতের প্রতীক্ষাই করে দিনভর। রাত হলে সে বেঁচে থাকার রসদ পায়।

লুকা সাঁতরার গাড়ি গলির সামনে আসতেই সুখেন উঠে পড়ল। লুকা দিব্যেন্দুকে তুলেছিল। কী কেস জানতে হবে।

লুকা গাড়ি থেকে নামতেই একটু দূরত্ব রেখে সে চিৎকার করল, ‘দাদা, প্যাকেজটা কী করলেন?’

লুকা সিগারেট টানছিল। সুখেনকে দেখামাত্র হাতছানি দিয়ে ডাকল। সুখেন কান ধরল, ‘মারবে দাদা।’

লুকা বলল, ‘চাইলে অনেক আগেই উড়িয়ে দিতে পারতাম। এদিকে আয়।’

সুখেন ধীর পায়ে লাজুক মুখে লুকার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লুকা সুখেনের কান ধরে জোরে মুলে দিল, ‘তোর নাকি পাখনা গজিয়েছে?’

সুখেনের লাগছিল। তাও চিঁচিঁ করে বলল, ‘দাদা, তোমরাই তো রাখবে, তোমরাই তো মারবে। আমি ভাবলাম লোকটাকে যদি হাপিশ করে দাও। এমনি তো দোষ কিছু করেনি। হাতুড়িটা নাকি ওর মুদ্রাদোষ।’

এক রাস্তা লোকের সামনে লুকা তাকে লাথি মারল। পরপর কয়েকটা চড় মেরে বলল, ‘আমার কথা না শুনে নিজের বুদ্ধি খাটাতে গেলে এরপরে ধাপার মাঠে তোর লাশ পাওয়া যাবে। আমার কথার নড়চড় হয় না।’

কান মাথা ঝিঁঝি করছে। যে কাজ সে করে, তাতে অপমান বলে কোনও শব্দ হয় না। তাও সুখেনের খারাপ লাগছিল। সে বলল, ‘ভুল হয়ে গেছে দাদা। আর হবে না।’

লুকা বলল, ‘ভুল বলে কিছু হয় না। তুই পুরোনো শুয়োর বলে তোকে হালকার উপরে ছাড়লাম আজ। আমার ছেলেদের তুই বলেছিলি রাতেই ওকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছিস। কিন্তু তুই তা করিসনি। নিজের কাছে রেখেছিলি। তুই কী ভেবেছিলি, এসব করবি আর কিছু হবে না?’

সুখেন বলল, ‘দাদা, মালটাকে আমি একটু দেখতে চেয়েছিলাম। মানে এরকম তো দেখিনি, তুমি কি দেখেছ? বেশ্যাপাড়ায় এসে পায়ে হাতুড়ি মারে, দেখব না?’

লুকা জ্বলন্ত চোখে সুখেনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘সাতদিন এলাকায় ঢুকবি না। তোকে সাতদিনের জন্য এখান থেকে বের করা হল। ফের যদি তোকে এলাকায় দেখেছি, তাহলে তুই খবর হয়ে যাবি।’

সুখেন কাঁদার নাটক করল, ‘এরকম করে বললে কী করে হবে দাদা? আমি কী খাব? না খেতে পেয়ে মরবো তো। তোমার দয়ার শরীর। ছেড়ে দাও।’

লুকা মাথা নাড়ল, ‘তোর অনেক বাড় বেড়েছে সুখেন। আমি অনেক দিন ধরেই দেখছি। তুই যদি ভেবে থাকিস কেউ কিছু বোঝে না, তাহলে তুই মূর্খের স্বর্গে বাস করছিস। আমি যা বলেছি, তাই হবে। সাতদিন তোকে যেন না দেখি। যদি দেখতে পাই, তোর খবর আছে।’

সুখেন কান ধরল। আরেকটা গাড়ি এসে গলির মুখে দাঁড়াল।

লুকা ইশারা করল। সুখেন দেখল গাড়ি থেকে একটা বউ নামল। দেখে বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা হকচকিয়ে গেছে। ভয় পাচ্ছে। একবারে ভদ্রবাড়ির মেয়ে দেখলেই বোঝা যায়।

লুকা মেয়েটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সুখেন ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল। বোঝা যাচ্ছে মেয়েটাকে নিয়ে লুকার কোনও প্ল্যান আছে। গলির ভেতরে ঢুকে জোর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে শমিতার ঘর থেকে নিরাপদ দূরত্বে একটা ঘরের ছাদে উঠে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বসে রইল।

ঠিক যা ভেবেছিল তাই।

মেয়েটাকে নিয়ে শমিতার ঘরে ঢুকল লুকা।

সুখেন ভ্রু কুঁচকে চিন্তা করতে লাগল, কী করে শমিতার ঘরের ভেতর ঢোকা যায়।

৫০

রাত দেড়টা। লুকা সাঁতরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। ফোন বাজতে শুরু করল তার, দেখল সুখেন ফোন করছে। ধরল, ‘বল।’

সুখেন যতটা সম্ভব গলাটা কান্না কান্না করে বলতে শুরু করল, 'দাদা, তোমার তো দয়ার শরীর। গ্রামের বাড়িতে আমার বুড়ি মা থাকে, মা-র টিবি হয়েছে। টাকা পাঠাতে হয় দাদা। তুমি যদি এখন এরকম শাস্তি দাও, তাহলে কী করে হবে?'

লুকা বলল, 'তুই কোথায়?'

সুখেন বলল, 'পাশের বস্তিতে বসে আছি দাদা। কী করব, কী খাব, বুঝতে পারছি না।'

লুকা বলল, 'বুঝেছি। আমার গাড়ির কাছে আয়।'

সুখেন ভয়ে ভয়ে বলল, 'মারবে না তো দাদা?'

লুকা বলল, 'না। মারব না। আয়।'

ফোন কেটে দিল লুকা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুখেন কাঁচুমাচু মুখে এসে হাজির হল।

লুকা সন্দিগ্ধ গলায় বলল, 'কাছেপিঠেই ছিলিস। তাই না?'

সুখেন বলল, 'তোমাকেই দেখছিলাম। কী করব বল দাদা? তুমি যা শাস্তি দিয়েছে, আমি যে কী করব, তাই ভালো করে বুঝে উঠতে পারছি না।'

লুকা বলল, 'বুঝে উঠতে পারছিস না? তুই জানিস না কী করেছিস?'

সুখেন লুকার পা জড়িয়ে ধরল, 'ভুল করেছি দাদা। মাফ করে দাও।'

লুকা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। উঠে দাঁড়া। রাস্তার মাঝখানে ন্যাকামি করবি না।'

সুখেন উঠল না, 'না দাদা। তুমি যতক্ষণ না মাফ করবে, আমি উঠব না।'

লুকা বলল, 'হয়েছে রে বাপ, হয়েছে, মাফ করলাম। এবার ওঠ।'

সুখেন উঠে দাঁড়াল।

লুকা বলল, 'বল এবার। তোর মা সত্যিই অসুস্থ?'

সুখেন বলল, 'খবর নিয়ে দেখো। তোমাকে মিথ্যে বলব আমি? তোমার যা নেটওয়ার্ক, আমি জানি না?'

লুকা তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, 'হেবি রেগে গেছিলাম আমি। ভাবছিলাম তোর লাশ নামিয়ে দিই। এত পাখা গজিয়েছিল তোর?'

সুখেন বলল, 'দেখো দাদা, আর হবে না। তুমি বললে মালটাকে আমিই খুঁজে গুলি করে দিয়ে আসব।'

লুকা হাত নাড়ল, 'না না। তার দরকার হবে না। মালটাকে ছেড়েও দিয়েছি।'

সুখেন আকাশ থেকে পড়ল, 'সে কী গো দাদা? ছেড়ে দিয়েছ মানে কী?'

লুকা বলল, 'হ্যাঁ। কী করব? অর্ডার ছিল। কাজ হয়ে গেছে, ছেড়ে দিয়েছি।'

সুখেন বলল, 'কী অর্ডার ছিল?'

লুকা রেগে গেল, 'জুতো খাস কেন বুঝতে পারিস? যা তোর জানার দরকার নেই, সেটা জানতে যাবি কেন তুই?'

সুখেন কান ধরল, 'আবার ভুল করে ফেলেছি দাদা।'

লুকা বলল, 'ঠিক আছে। আমাদের লাইনে অনেক ব্যাপার থাকে। তোর সেটা জানা উচিত। কথাবার্তা এমন বলিস যেন কিছুই বুঝিস না!'

সুখেন বলল, 'ওই মালটার জন্য তুমি আমাকে মারতে যাচ্ছিলে দাদা, একটু তো জানতে ইচ্ছে হয়ই, ও কিছু না। ছেড়ে যখন দিয়েছ, তখন থাক। তোমার কথা বলো, শুনি।'

লুকা আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আমি কি গল্পদাদু রে শালা?'

সুখেন বলল, 'এ মা, তা কেন? ভালোমন্দের কথা কি বলতে ইচ্ছে করে না তোমার সঙ্গে? তুমি হলে আমাদের সবার দাদা।'

লুকা বলল, ‘তা ঠিক। আজ বিজনদার সঙ্গে দেখা হল। এই মার্কেটেও বিজনদা পার্টি ছাড়েনি। একটা কথা মনে রাখবি সুখেন, এই যুগে যারা এখনও দাঁতে দাঁত চেপে আদর্শের লড়াই করে যাচ্ছে, তাদের মারার জন্য যদি কোনও শুওরের বাচ্চা লুকা সাঁতরাকে টাকা দেয়, লুকা তার খাল খিচে নেবে।’

সুখেন বলল, ‘বিজনদাকে মারার জন্য টাকা দিয়েছে নাকি?’

লুকা মাথা নাড়ল, ‘না না, তা না। যদি দেয়, তাহলে কী করব তাই বললাম। বিজনদার সঙ্গে কথা বললে ভালো লাগে। আমায় অনেক জ্ঞান দিল, ভালো হয়ে যা এই সব। আমি বললাম, আমি তো ভালোই। বিজনদা আমার পিঠে চাবড় মারল। বলে মানুষের জন্য ভালো কিছু কর। তুই বল সুখেন, আমি কি ভালো কাজ করি না? এই তো এখানের মেয়েদের জন্য কত কিছু করি।’

সুখেন খুক খুক করে কেশে বলল, ‘তা তুমি করো। তুমিই এখানের ভগবান।’

লুকার ফোন বেজে উঠল। সুখেন দেখল লুকা ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘তুই এখন যা। আমার কাজ আছে।’

সুখেন বলল, ‘কোথায় যাব দাদা?’

লুকা জোর পায়ে হাঁটতে শুরু করল, ‘জাহান্নামে যা।’

লুকা গলিতে ঢুকেছে। সুখেন দূরত্ব রেখে হাঁটতে শুরু করল।

লুকা একরকম দৌড়ে শমিতার ঘরের দিকে গেল। সুখেন দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা ঝুঁকি নিতে হবে। মরলে মরবে। কিন্তু কৌতূহলে মরে যাওয়ার থেকে এমনি মরে যাওয়া ভালো।

শমিতার ঘরের পিছনে গলি শেষ হয়ে গেছে। সুখেন ‘জয় মা’ বলে পাইপ বেয়ে ছাদের উপরে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে ছাদের উপর থেকে ভেতরের বারান্দায় উঁকি মারল। যে মেয়েকে এনেছিল, সে মেয়েটা চিৎকার করে কাঁদছে, ‘আমি এখানে থাকব না, আমায় ছেড়ে দিন।’

এতটা কষ্ট করে উপরে উঠে সুখেনের বুক হাপরের মতো ওঠা নামা করছিল। পাশের বিল্ডিং থেকে তাকে দেখতে পাবার প্রবল ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও সুখেন নামল না। ছাদের উপর থেকে আবার উঁকি মারল। মেয়েটাকে শমিতার দুজন মেয়ে জোর করে ধরে হাতে ইনজেকশন দিয়ে দিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মেয়েটা অচৈতন্য হয়ে গেল।

প্রবল উত্তেজনার মুহূর্তে সুখেন শিস দিয়ে ফেলে। এবার দিতে গিয়েও বহু কষ্টে নিজেকে আটকাল। ধরা পড়লে এবার আর লুকা ছেড়ে দেবে না তাকে!

৫১

ব্যাগটা যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। হাওড়ার বাসে উঠে পায়ের তলায় ব্যাগটাকে রেখেছে সে। মাঝে মাঝেই প্রবল কান্না পাচ্ছে। নুরুলের কথা মনে পড়ছে। এভাবে মেরে দিল বাপিদা?

নকল টাকাগুলো ব্যাগে রেখে বাপিদার বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে বাপিদা ফোন করল আরেকবার, ‘সাবধানে যাবে। কেউ যেন বুঝতে না পারে, ব্যাগে কী আছে। বুঝেছ?’

পূর্ণ বলল, ‘হ্যাঁ, বুঝেছি।’

বাপিদা বলল, ‘পুলিশ যেন না বোঝে।’

পূর্ণ বলল, ‘এই টাকা তোমার কাছে এল কী করে বাপিদা? অত দূরে বসে এখানে এত টাকা?’

বাপিদা বিরক্ত গলায় বলল, ‘যা বলেছি, সেটা করো। এত প্রশ্ন জিগ্যেস করে কোনও লাভ নেই। দিনের আলো থাকতে থাকতে বেরিয়ে যাও।’

ফোন কেটে গেল। বাস স্ট্যান্ডে গিয়েও পূর্ণ শুনতে পেল সবাই নুরুলের ব্যাপারেই কথা বলছে। কাল বন্ধ ডাকা হয়েছে। এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বলে মিছিল হবে বিকেলে।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ব্যাগ কাঁধে নিয়েই পূর্ণ ট্রেনের টিকেট কাটল। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসেছে। এর মধ্যে অনেকে উঠেও পড়েছে। তাও সিট পাওয়া গেল। পূর্ণ পায়ের তলায় ব্যাগ রেখে বসল। সামনের লোকটা নিবিষ্ট মনে খবরের কাগজ পড়ছে। পূর্ণর বুক ধড়ফড় করছে। স্টেশনে অনেক পুলিশ ছিল। একবার যদি তারা তাকে ধরে ফেলত, তাহলে কী হতো?

সাঁতরাগাছিতে একটা লোক উঠল। ট্রেনে ভিড় নেই, অথচ লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। পূর্ণর ফোন বাজতে শুরু করেছে। পূর্ণ ফোন ধরল, বাপিদা বলল, 'তোমাকে উলুবেড়িয়া অবধি যেতে হবে না। পরের স্টেশনে নেমে যাও। তোমার সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, সে ব্যাগ নিয়ে যাবে।'

পূর্ণ লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখল। মাঝবয়সি লোক। গাট্টাগোট্টা চেহারা। সে সঙ্গে সঙ্গে সিট থেকে উঠে লোকটাকে বলল, 'বসুন।'

লোকটা বসল। পূর্ণ গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগছিল তার। আশেপাশের লোকগুলো কিছু বুঝল নাকি কে জানে। ট্রেন ফুলেশ্বর স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। পূর্ণ তড়িঘড়ি নেমে গিয়ে ফেরার টিকিট কাটল। ফোন বাজছে আবার। পূর্ণ ফোন ধরল। বাপিদা বলল, 'এখনই ট্রেনে উঠো না। একটা ব্যাগ দেবে। নিয়ে ফিরবে।'

পূর্ণ বলল, 'আবার? রাত হয়ে যাবে তো?'

বাপিদা বলল, 'হোক। কাজ করছ। সময় লাগলে লাগুক। এক নাম্বার প্ল্যাটফর্মের একদম শেষ বেঞ্চ, যেটা হাওড়ার দিকে মুখ করে আছে, সেটায় গিয়ে বোস। কারো সঙ্গে কথা বলবে না।'

পূর্ণ বলল, 'আমায় যদি পুলিশ ধরে? আমি কী করব তখন?'

বাপিদা বলল, 'কেন ধরবে? তুমি কি কিছু করেছ যে ধরবে?'

পূর্ণ ঘামছিল। বলল, 'আমি জানি না। তুমি এগুলো কী করছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বাপিদা বলল, 'বোঝার জন্য তোমায় টাকা দেওয়া হবে না।'

পূর্ণ বলল, 'আমার টাকা লাগবে না। আমাকে ছেড়ে দাও।'

বাপিদা বলল, 'ছেড়ে দিতাম, যদি তুমি চুরিটা না করতে যেতে। তোমাকে তো সৎ ভাবতাম। তোমার মধ্যেও লোভ আছে তার মানে। লোভের জন্য এটুকু তো করতেই পারো, তাই না? প্রথম প্রথম একটু ভয় লাগবে। তারপর আর লাগবে না। চিন্তা কোরো না। যা বলছি করো। ভালো টাকা পাবে।'

পূর্ণ বলল, 'আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আর করব না। আমাকে ছেড়ে দাও।'

বাপিদা বলল, 'বললাম তো তোমায়, যেটা বলছি করো। নইলে নুরুলের মতো দশা করব।'

পূর্ণ বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা। যাচ্ছি।'

ফোন কেটে দিল বাপিদা।

পূর্ণর অসুস্থ লাগছিল। সে কোনমতে হাঁটতে হাঁটতে ওভারব্রিজ পেরিয়ে বাপিদার বলা বেঞ্চে গিয়ে বসল। বেঞ্চ ফাঁকাই ছিল। অন্ধকার নেমে এসেছে চারপাশে।

'কোথায় যাবেন?'

তার সামনে একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে, পূর্ণ বুঝতে পারেনি। চমকে তাকাল।

পূর্ণ বলল, 'হাওড়া যাব।'

'টাকাগুলো নকল কেন?'

পূর্ণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে লোকটার দিকে তাকাল। মুহূর্তের মধ্যে তাকে চারজন ঘিরে ধরল।

৫২

পূর্ব কথা

বাজারের হোটেলে অনেকদিন খাওয়া হয় না। একটা দোকান থেকে ডিম আর ময়দার গন্ধ ভেসে আসছে। এগরোল ভাজছে।

দিব্যেন্দু দোকানের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। যে লোকটা এগরোল ভাজছে, সে জিগ্যেস করল, 'কী দেব?'

দিব্যেন্দু দাঁত বের করল, 'দেখছি।'

লোকটা অবাক গলায় বলল, 'কী দেখছেন?'

দিব্যেন্দু বলল, 'এগরোল ভাজছেন, সেটা দেখছি।'

লোকটা বিরক্ত গলায় বলল, 'নিলে নিন, নইলে সরে যান। ভিড় করবেন না। এমনিতেই ভ্লগারদের জ্বালায় অস্থির। দু-দিন পর পর কেউ না কেউ এসে বলে ভিডিও করব, তোমার প্রচার হবে, খেয়ে নেবো, টাকা দেব না। পরে দেখা যায় দশটা সাবস্ক্রাইবার তার। অনেক মুরগি হয়েছি। আর হব না বাপ। আপনিও কি ভ্লগার নাকি?'

দিব্যেন্দু মাথা নাড়ল, 'না না। আমি কিছু না। আচ্ছা আমাকে একটা রোল দিন।'

'ডবল ডিম না সিঙ্গল ডিম?'

'ডবল।'

'লঙ্কা দেব?'

'দিন।'

লোকটা অভ্যস্ত হাতে ডিম ভাঙল। এখন একটু নুন দিয়ে চামচ দিয়ে নাড়াচ্ছে। দিব্যেন্দু মুগ্ধ হয়ে দেখছে।

পেঁয়াজ কাটা আছে। ডিম ভাজার উপর পরোটা দিয়ে এদিক-ওদিক ভেজে নিয়ে এবার রোলের উপর পেঁয়াজ সাজানোর পালা। দিব্যেন্দু বলল, 'বাদাম আছে?'

লোকটা বিরক্ত গলায় বলল, 'বাদাম কে দেয়?'

দিব্যেন্দু বলল, 'আমি খাই। বাদাম দিন না।'

লোকটা বলল, 'বাদাম নেই।'

দিব্যেন্দু বলল, 'আমি বাদাম কিনে আনছি।'

লোকটা তাড়াতাড়ি রোলটা বানিয়ে দিব্যেন্দুর হাতে দিয়ে বলল, 'টাকা দিন, দিয়ে ফুটুন। বাড়িতে গিয়ে বাদাম দিয়ে নিন।'

দিব্যেন্দু টাকা দিয়ে রোলটা নিয়ে বাড়িতে এল।

'রুমা।'

রুমা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

দিব্যেন্দু বলল, 'বাদাম দে তো।'

তুই সম্বোধন শুনেই রুমা বুঝেছে দিব্যেন্দুর মেজাজ ঠিক নেই। সে বলল, 'দেখছি।'

রান্নাঘরে গেল। না। বাদাম নেই।

দিব্যেন্দু বাইরের ঘরে দাপাচ্ছে।

রুমা বেরিয়ে বলল, 'আমি বাদাম নিয়ে আসছি। নেই।'

দিব্যেন্দু রোলটা ছুঁড়ে মারল রুমার গায়ে, 'শুধু বাইরে গিয়ে লোকের গায়ে ঢলানোর ইচ্ছা না?'

রুমা কাঁপতে শুরু করেছে। দিব্যেন্দু রোলটা মেঝে থেকে তুলে বলল, 'তুই খা। খা।'

খেতে না চাইলেও গোটা রোলটা রুমার মুখের মধ্যে জোর করে পুরে দিল দিব্যেন্দু। রুমা খেতে পারল না। বমি করে দিল। দিব্যেন্দু চুলের মুঠি ধরে বলল, 'ষাট টাকা তোর বাপ দেবে রে মাগী? তোর বাপ দেবে?'

বর্তমান সময়

দোকানটার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দিব্যেন্দু। বুকের কাছটায় ব্যথা করছে। বেশ্যাপাড়ার গুন্ডাগুলো বহুত পিটিয়েছে। এ ব্যথা বেশ কিছুদিন থাকবে।

রোলের লোকটা তাকে দেখে বলল, 'কী বাদাম দাদা? বাদাম দেব?'

দিব্যেন্দু হাসল, 'আছে?'

লোকটা বলল, 'এনেছি। আপনার মতো দু-চার পিস আছে, বলে বাদাম ভালো লাগে।'

দিব্যেন্দু বলল, 'দাও।'

লোকটা বাদাম ভাজছে। বাদামটা একটু একটু করে কালো হচ্ছে। দেখতে দিব্যি লাগছে। দিব্যেন্দু মুগ্ধ হয়ে দেখছে। পেঁয়াজ শসার সঙ্গে বাদামও দেওয়া হবে। তার উপরে সস। এখানে দামি সস দেয় না। কুমড়োর সস দেয় মনে হয়। লাল, হলুদ, খয়েরি সসের বন্যা। যা দেবে দিক। খিদে পেয়েছে। খেতে হবে। বাড়িতে রুমা নেই। রান্না নেই। বাইরেই খেতে হবে। আগে রোল খাবে। তারপর ফুচকা খাওয়া যেতে পারে। তারপর ঘুগনি।

ঘুগনির মধ্যে একটা গোটা সেদ্ধ ডিম ভেঙে দেয়। নরম কুসুমটা ছড়িয়ে পড়ে। আলাদা ব্যাপার থাকে তাতে। ভাবতেই জিভে জল চলে এল।

মানিব্যাগ কিনতে হয়েছে। এটিএম থেকে শুধু পাঁচশো বেরিয়েছে। দিব্যেন্দু সেটা দিল। দোকানদার বিরক্ত গলায় বলল, 'খুচরো দিন।'

দিব্যেন্দু বলল, 'খুচরো নেই।'

লোকটা রেগে গিয়ে বলল, 'তাহলে রাস্তা দেখুন।'

দিব্যেন্দুর মাথা গরম হচ্ছে। এখন রাগ ঝাড়ার জন্য রুমা নেই। কার উপর ঝাড়বে?

দোকান থেকে সরে গেল সে। টাকা খুচরো করতে হবে।

উফ্, কী ঝামেলা! রক্ত উঠছে মাথায় একটু একটু করে।

একটা গাড়ি দাঁড়াল বাজারের মধ্যে। 'এই এদিকে।'

একী! সেই গুন্ডাগুলো না? উফ্! তাকে ডাকছে আবার! রাগ এবার ভয়ে পরিণত হচ্ছে।

৫৩

গাড়ির ভেতরে হালকা মিষ্টি একটা মদের গন্ধ ভাসছে। দিব্যেন্দু ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমাকে আবার এখন কী করতে হবে?'

দিব্যেন্দুর পাশে যে বসেছিল, সে দিব্যেন্দুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তোমার বান্টু টেস্ট হবে কাকা।'

দিব্যেন্দু বলল, 'মানে?'

'মানে আবার কী? তোমারটা কী পজিশনে আছে, ঠিক করে দাঁড়ায় নাকি, ফাংশান করে নাকি, দেখতে হবে না?'

দিব্যেন্দু বলল, 'এসব কী? আমার খিদে পেয়েছে?'

'এই কে আছিস, একে কিছু খাইয়ে দে।'

গাড়ি দাঁড়াল একটা ধাবায়। তুমুল ঝাল দিয়ে একটা মাটন তড়কা দেওয়া হল। খেতে দারুণ লাগছিল। দিব্যেন্দু উশ আস করে সাতটা রুটি খেয়ে নিল।

'উরিব্বাস। মামা তো ভালোই খেতে পারো।'

দিব্যেন্দু বলল, 'খিদে পেয়েছিল। আপনারা খাবেন না।'

'না না। খাব না। তুমি খাও। পাঁঠা বলির আগে পাঁঠাকে খাওয়ায়, দেখো না?'

দিব্যেন্দু বলল, 'মানে?'

'মানে বুঝতে হবে না। খাও।'

খেয়ে নিল। আবার পান দেওয়া হল তাকে।

গাড়িতে উঠে ঘুমও পেয়ে গেল দিব্যি। একটা ছেলের কাঁধে মাথা দিয়ে ঘুমিয়েও পড়ল সে।

ঘুম ভাঙতে দেখল আবার সেই পাড়ায় গলির মুখে চলে এসেছে। ছেলেগুলো তাকে বলল, 'চলো। ভেতরে চলো।'

চারদিকে তাকাল দিব্যেন্দু। এখন অনেক রাত হয়েছে। বাইরে তেমন কেউ নেই। ছেলেগুলোর সঙ্গে তাকে শমিতার ঘরে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

লুকা তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তারপর? কেমন লাগল আবার আসতে?'

দিব্যেন্দু ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমাকে কেন আনা হয়েছে?'

লুকা বলল, 'ওই ঘরে ঢোকো। বুঝে যাবে।' দরজায় তেল চিট চিট করছে। একটা বেলফুল দিব্যেন্দুর হাতে দিল লুকা। 'যাও যাও।'

দিব্যেন্দু দরজা ঠেলে ঢুকল।

পরমুহূর্তেই চমকে উঠল।

খাটে রুমা শুয়ে আছে। চোখে মুখে কত মেক আপ। সে ফিসফিস করে বলল, 'শালা। পুরো বেশ্যার মতোই লাগছে তো।' মাথায় রক্ত উঠতে বেশিক্ষণ লাগল না, 'এই মাগী, ওঠ, এই।' রুমার কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকাতে শুরু করল সে।

রুমার ঘুম ভেঙে গেছিল। দিব্যেন্দুকে দেখে সে শিউরে উঠল। দিব্যেন্দু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'দেখেছিস তো মাগী, আমি জানতাম, এটাই তোর আসল জায়গা। তুই এই জায়গায় আসবি বলেই জন্মেছিলি।'

রুমার মনে হচ্ছে সে কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছে। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না তার সামনে আবার দিব্যেন্দু ফিরে এসেছে। দরজা ঠেলে লুকা ঢুকল। দিব্যেন্দুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'যাও সোনা, তুমি অন্য ঘরে যাও।'

দিব্যেন্দু একঝটকায় লুকার হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার বউ, আমি বুঝব!'

লুকা সপাটে একটা চড় কষালো, 'যা বলছি, তাই করবি শুয়োরের বাচ্চা। চল ফোট। এর মধ্যেই সব ভুলে মেরে দিয়েছিস?'

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল। দিব্যেন্দু সিঁটিয়ে গেল। লুকা চিৎকার করল, 'যা।'

দিব্যেন্দু সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল। রুমা কাঁপছিল। লুকা বলল, 'আমাকে বলা হয়েছে আপনার সামনে এই লোকটাকে নিয়ে আসতে। আমি কারো ইন্সট্রাকশন শুনে কাজটা করেছি। আমি জানি এই লোকটা একটা ব্র্যান্ডেড শুয়োর।'

রুমা কাঁদছিল। বলল, 'আমার সঙ্গে আপনারা এরকম করছেন কেন?'

লুকা বলল, 'আমি জানি না। বিশ্বাস করুন। আমি কেয়ার টেকার মাত্র। আপনি যেতে চাইলে চলে যেতে পারেন। কিন্তু হাতে সময় বড় কম। পনেরো দিনের মধ্যে শমিতার কাছ থেকে আপনাকে এ পাড়ার হাল-হকিকত, খদ্দেরের সঙ্গে ডিল করার কায়দা, সব শিখতে হবে। তারপর ওরা আপনাকে নিয়ে যাবে। সেখানে কী করবে তাও জানি না। আপনি আজ চলে গেলে হয়তো ওরা আবার এই জানোয়ারটার সঙ্গে ঘর করতে পাঠিয়ে দেবে। সেটা কি ভালো হবে?'

রুমা বলল, 'কী পাপ করেছিলাম আমি? কী করে আমি এরকম একটা খারাপ মেয়ে হয়ে যাব?'

লুকা মাথা নিচু করল, 'জানি না দিদি। এটুকু জানি, যারা আপনাকে এগুলো করতে বলছে, এই ট্রেনিং নিতে বলছে, তারা ছোটখাটো কেউ না। লুকার মতো লোকও তাদের কথা শুনতে বাধ্য।'

রুমা বলল, 'আমাকে বেশ্যা বানিয়ে দিল ওরা?'

লুকা বলল, 'এটার উত্তর আমি দিতে পারব না বিশ্বাস করুন।'

রুমা চুপচাপ কেঁদে যেতে লাগল।

৫৪

জানলা দিয়ে বাইরের রাস্তায় তাকিয়ে আছে অরিত্র। একটার পর একটা গাড়ি যাচ্ছে। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা।

তার দোষেই এণাক্ষী হারিয়ে গেল। তার জন্যই। কেন সে ওকে একা ছেড়ে দিল সেদিন?

ইনভেস্টিগেশন সেন্টার থেকে তাকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, সব জায়গায় এ বিষয়ে আলোচনা না করতে। পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করছে এণাক্ষীকে খুঁজে বের করতে। আজেবাজে লোককে বললে নাকি খুঁজে পাওয়ার চান্স কমে যাবে। অরিত্র এটাই বুঝতে পারছে না। এরকম আবার হয় নাকি? একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর তার কথা কাউকে বলা যাবে না?

ফোনটা বাজতে শুরু করল। অরিত্র দেখল নীল ফোন করছে। ধরল সে, 'হ্যাঁ, বলুন।'

নীল বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলার জন্য ফোন করলাম। মনে হয় এই কথাটা আপনাকে জানানো দরকার।'

অরিত্র বলল, 'প্লিজ বলুন।'

নীল বলল, 'ম্যাডামের ফোনের লাস্ট লোকেশন হোটেলেই পাওয়া গেছিল। তারপরে সিম নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা চিন্তার।'

অরিত্র উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'তাহলে ও নিজের ইচ্ছেয় কোথাও যায়নি, সেটা তো প্রমাণ হল? যেভাবে ওর ক্যারেকটার অ্যাসাসিনেট করা হচ্ছে, সেটা তো আর হবে না। তাই না?'

নীল বলল, 'আপনি রেগে যাচ্ছেন। এই সময়টা মাথা ঠান্ডা রাখা উচিত।'

অরিত্র বলল, 'এই সময়টা আপনার এলে কী করতেন আপনি? ঘরে বসে থাকতে পারতেন?'

নীল বলল, 'আমরা দেখছি তো। আপনি ভাববেন না। আরও এক্সটেনসিভ সার্চ অপারেশন শুরু করা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি একটা না একটা খবর পাওয়া যাবে।'

কলিং বেল বেজে উঠল। অরিত্র বলল, 'ধরুন একটু। কে এল দেখি।'

দরজা খুলল অরিত্র। দরজা খুলে স্তব্ধ হয়ে গেল। এণাক্ষী দাঁড়িয়ে আছে! তার হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেল, 'তুমি?'

এণাক্ষী যেন অনেকক্ষণ ঘুমোচ্ছিল। তার দিকে ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে রইল।

অরিত্র তড়িঘড়ি এণাক্ষীকে হাত ধরে সোফায় বসিয়ে ফোনটা তুলল, ‘হ্যালো...অফিসার।’
নীল বলল, ‘হ্যাঁ। আমি ধরে আছি। কী হয়েছে?’
অরিত্র বলল, ‘এণাক্ষী ফিরে এসেছে।’
নীল বলল, ‘বাঃ। ভালো খবর। আমি কি একবার আসতে পারি?’
অরিত্র বলল, ‘হ্যাঁ নিশ্চয়ই। প্লিজ আসুন। আমি ওয়েট করে আছি।’
তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। হাতে চিমটি কেটে দেখল। এণাক্ষীকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘কোথায় গেছিলে তুমি? আমি কত খুঁজেছি জানো তোমাকে? পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম।’
এণাক্ষী করুণ গলায় বলল, ‘আমার কিছু মনে নেই।’
অরিত্র বলল, ‘ঠিক আছে। তুমি খাটে শোবে চলো। আমার মনে হয় তোমার রেস্ট নেওয়া দরকার।’
এণাক্ষী বলল, ‘আমি খারাপ মেয়ে নই। বিশ্বাস করো। আমি পার্টিতে কারো সঙ্গে খারাপ কিছু করতে যাইনি।’
অরিত্র লজ্জা পেল, ‘এভাবে না প্লিজ। তুমি শোও। এস।’
এণাক্ষীকে ধরে বেডরুমে নিয়ে গিয়ে খাটে বসাল অরিত্র। এণাক্ষী একা একা বিড়বিড় করতে লাগল, ‘ওরা আমাকে অনেক চাপ দিয়েছে। ফোন করতে দেয়নি। আমি বার বার তোমাকে ফোন করতে চেয়েছি, ফোনে পাইনি। আমি...কে নিয়ে গেছিল আমায়...’
অরিত্র বিস্মিত হয়ে বলল, ‘কে নিয়ে গেছিল?’
এণাক্ষী অরিত্রর দিকে তাকিয়ে কেঁদে দিল, ‘জানি না। আমি বুঝতে পারছি না।’
অরিত্র বলল, ‘কে দিয়ে গেল তোমায়?’
এণাক্ষী মাথা নাড়ল, ‘জানি না। আমাকে ফ্ল্যাটের নীচে নামিয়ে দিয়ে গেল। তার আগে আমি মনে হয় ঘুমোচ্ছিলাম। আমি জানি না।’
অরিত্র এণাক্ষীকে শুইয়ে বাইরে গিয়ে নীলকে ফোন করে সব বলল। নীল বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে ম্যাডামের একটা মেডিকাল টেস্ট করাতে হবে।’
অরিত্র বলল, ‘আবার মেডিকাল টেস্ট কেন?’
নীল বলল, ‘অনেকগুলো কারণ হতে পারে। হতে পারে যারা নিয়ে গেছিল তারা বেআইনি অরগ্যান ব্যবসায়ী। কিংবা বদ মতলব ছিল। আপনি ওকে নিয়ে...ওহ আপনার গাড়িটা এখন নেই তো। ঠিক আছে। আমি আসছি। আপনি তৈরি থাকুন।’
অরিত্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইল।

৫৫

ঝাপসা একটা রাত কাটছে যেন। এমন একটা রাত, যার জন্য কোনওদিন সে প্রস্তুতি নেয়নি।
প্রস্তুতি তো সে রাতটারও নেওয়া ছিল না। সবার সঙ্গে মিষ্টভাষী, ভদ্র সভ্য ছেলেটা যখন ফুলসজ্জার রাতে ঢুকেছিল।
খুব ভালোভাবে বলেছিল, ‘তুমি খুব ক্লান্ত। ঘুমিয়ে পড়।’
কোনও অসভ্যতা না, কোনও কিচ্ছু না।
সে চমৎকৃত হয়েছিল। প্রত্যুষদা না থাক, কেউ একজন অন্তত এল, যে তার খেয়াল রাখবে। প্রথম রাতের কথা সে ভুলতে পারবে না কোনদিন। সেই ভদ্র সভ্য মানুষটাই ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে গেল রাক্ষসে। এমন

এক ভয়াবহ রাক্ষস, যার ছায়া পড়লেও সে চমকে উঠত। আতঙ্কিত হতো। ভয়ে কাঁপত। যে তাকে বিন্দুমাত্র ভালো থাকতে দেয়নি। প্রতিটা সময় কখনও গায়ে হাত তুলেছে, কখনও তীব্র লাঞ্ছনা দিয়েছে।

রুমা বসে আছে ঘরের মধ্যে। তেল চিটচিটে একটা বিছানার চাদর। দেওয়ালে মা কালীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার। এই জায়গাটাতেও ঈশ্বর আছেন? আছেন হয়তো। শমিতা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

রুমা শমিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে কীরকম ট্রেনিং হবে?'

শমিতা পান খাচ্ছিল। হেসে বলল, 'খদ্দের সামলানোর ট্রেনিং দেব। খদ্দের সামলাতে পারবি না?'

রুমা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। শমিতা জানলা খুলে পানের পিক ফেলে বলল, 'তোর মরদটা কি পাগল?'

রুমা বলল, 'ওরকমই।'

শমিতা বলল, 'পুলিশে বলিসনি?'

রুমা শূন্য চোখে তাকাল, 'কী করতাম? থাকব কোথায়?'

শমিতা বলল, 'তাও ঠিক। আমাদের সবার তো ওই একটাই চিন্তা থাকে। থাকব কোথায়? আমাদের এখানে কতজন আছে, তোর মতোই অবস্থা। কাউকে কাউকে শ্বশুরবাড়ি থেকেই বেচে দিয়েছিল। আমাদের এখানে এসে উঠেছে। ওই যে পারুল, তোর বর যার পায়ে হাতুড়ি মেরেছে, তাকে তার বাপ বেচে দিয়েছিল।'

রুমা মাথা নিচু করে বসে নিজের পায়ের নখ দেখছিল। বলল, 'আমার বাবা-মা তো ভদ্রবাড়ির লোক। তারাও আসলে আমাকে বেচেছে। কিন্তু সেটা বাইরের লোক বুঝতে পারবে না। বেড়াল তাড়িয়েছিল তারা আমার বিয়ে দিয়ে। বিয়ে দেওয়াটাই সব।'

শমিতা বলল, 'তুই জানিস, তোকে শেখানোর জন্য আমি হোটেলেও যেতে পারতাম। তোকে এখানে পাঠিয়েছে কেন?'

রুমা ঘেন্নায় সিঁটিয়ে যাচ্ছিল, 'আমি কারো সঙ্গে কিছু করতে পারব না। আমাকে ছেড়ে দাও।'

শমিতা রুমার পাশে এসে বসল। কাঁধে হাত রেখে বলল, 'সব সময় ওই পাগলের সঙ্গে থেকেছিস। তোকে মেরেছে। আমি যা শেখাচ্ছি, ভালো করে শেখ, তোকে কেউ মারতে আসবে না। সবাই ভালোবাসবে। আমি কি তোকে বলেছি এই রিকশাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, চানাচুরওয়ালার সঙ্গে শুতে হবে? কখন বলিনি। তোর কাছে অনেক বড় বড় লোক আসবে রে। তাদের অনেক চাহিদা। আমি কি অত শেখাতে পারব? সে শেখানোর অন্য লোক আছে। আমি তোকে একটা জিনিস শেখাব। সেটা কী বলত?'

রুমা বলল, 'কী?'

শমিতা বলল, 'লজ্জা কাটাতে শেখাব। লজ্জা পেলে হবে? তোর কাছে সব থেকে বড় অস্ত্র আছে। এমন এক অস্ত্র, যেটা থাকলে একটা পুরুষ মানুষ তার সব কিছু তোর পায়ে লুটিয়ে দিতে পারবে। আমি যা শেখাব, তুই শুধু তাই শেখ। নইলে ওই শুয়োরটার সঙ্গে ঘর করবি নাকি রে মাগী? কী হবে ওই ভাবে বেঁচে?'

রুমা বলল, 'কোন জীবন ভালো?'

শমিতা বলল, 'আমি জানি না। আমার জানার দরকার নেই। কিন্তু তোকে জানতে হবে। তোর সে রূপ আছে। তোকে শিখতে হবে। দেখ, ঘর থেকে বেরো। তোর বরকে বসিয়ে রেখেছে একটা ঘরে। ওর বাড়িতে গিয়ে ঠিক করে তো ভাতও পাবি না। পরিবর্তে জুতো, লাঠি সব খাবি। নিজেই বল, গিয়ে কি কোনও লাভ হবে?'

রুমা জোরে শ্বাস নিয়ে সোজা হয়ে বসল। বলল, 'তোমরা যা বলবে, আমি করতে রাজি আছি। তবে আমার একটা শর্ত আছে।'

শমিতা বলল, 'বল।'

কিছুক্ষণ পর বারান্দায় দিব্যেন্দুকে টেনে নিয়ে আসা হল।
দিব্যেন্দু অবাক গলায় বলল, 'কী হল?'
লুকা সিগারেট টানছিল। বলল, 'বোস। হাঁটু গেড়ে বোস।'
দিব্যেন্দু বলল, 'কেন?'
লুকা বলল, 'দানা খাবি কি? কপালের মাঝ বরাবর দেব, একদম ছবি হয়ে যাবি। যা বলছি কর। বোস।'
দিব্যেন্দু বসল। রুমা শমিতার ঘর থেকে বেরোল। তার চোখে আগুন জ্বলছে।
লুকা চেয়ারে বসে বলল, 'শুরু কর।'
দিব্যেন্দু অবাক হয়ে রুমাকে দেখছে। রুমা দিব্যেন্দুর স্থির চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। দিব্যেন্দু বলল, 'কী হল? কী দেখছ?'
রুমা এগোতে শুরু করল দিব্যেন্দুর দিকে।
তার হাতে দিব্যেন্দুর সেই হাতুড়ি...!

৫৬

তিন মাস পরের কথা

বৃষ্টি পড়ছে। পুরাতন ঢাকার গলি দিয়ে একটি মেয়ে বোরখা পরে হেঁটে যাচ্ছে। বৃষ্টি থামছে না। বেড়ে চলছে। কালো আকাশে মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমক দেখা যাচ্ছে।
মেয়েটার কানে কয়েকটা কথা ভেসে আসছে, 'মনে রাখবে, এমন একটা দেশে যাচ্ছ, যেখানে মেয়েদের জীবনের কোন মূল্য নেই। একবারে এটাই বাস্তব সত্যি। চরম পুরুষতান্ত্রিক দেশ। ছেলেদের কোনও দোষ নেই। ভিক্টিম ব্লেমিং হয় রেপের পরে। আমাদের দেশেও হয়। কিন্তু ও দেশে সব সীমা পরিসীমার উপরে গিয়ে হয় যা হওয়ার। বুঝতে পারছ, কী বলছি আমি?'
মেয়েটা দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা সিএনজি চালকের একজোড়া চোখ তার উপর নজর রাখছে। সামান্য উৎকণ্ঠা দেখা দিল মেয়েটার মধ্যে? সেকেন্ড পাঁচেক দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল সে।
গলিটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেই দরজায় টোকা মারল।
দরজা খুলে গেল। লোকটার ঠোঁটের কাছটা কাটা। তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী দরকার?'
মেয়েটা বলল, 'মজিদ ভাই পাঠাইসে। বলল সাদিক সাহেবরে সালাম দিবি।'
লোকটা তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বাইরের দিকে দেখল। সিএনজিটা এখন আর নেই। গলিতেও বৃষ্টির জন্য ভিড় কম। লোকটা বলল, 'ভিতরে আসেন।'
মেয়েটা ভেতরে ঢুকল। লোকটা তাকে একটা ছোট ঘরে বসাল। ছোট টিভি চলছে একটা। ঘরে আর কেউ নেই।
ফোন বের করে লোকটা ঘরের বাইরে চলে গেল। মেয়েটা চুপ করে বসে আছে। কিছুক্ষণ পর লোকটা এসে বলল, 'ভাই আসছে। আপনাকে খেতে দিতে বলল।'

মেয়েটা কাঁদতে শুরু করল, ‘এটা কোন জায়গা? আমার ভয় লাগছে।’

কান্নাটা ইচ্ছাকৃত। এমনই নির্দেশ আছে। বোঝাতে হবে যে সে অথৈ জলে পড়ে গেছে। লোকটা বলল, ‘ভাই আসছে তো। জরিনা! এই জরিনা!’

একজন সতেরো আঠেরো বছর বয়সি মেয়ে ঘরে ঢুকল। লোকটা জরিনাকে বলল, ‘খেয়াল রাখ। ভাই আসবে আজ।’

লোকটা বেরিয়ে গেল।

জরিনা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বোরখা তোল আপা।’

মেয়েটা বোরখা তুলল।

জরিনা গালে হাত দিয়ে বলল, ‘মাশাল্লাহ, আপনে খুব সুন্দর।’

মেয়েটা কাঁদছে। জরিনা বলল, ‘কাঁদেন না আপা। এখানে থাকবেন। খাবেন, দাবেন, ঘুমাইবেন। চিন্তা নাই। আফনের নাম কী?’

মেয়েটা বলল, ‘সাকিনা। ঘরের লোক আরব গেছে। এখন শুনি বেঁচে নাই। মজিদ ভাই বলল সাদিক সাহেবের লগে দেখা করতে।’

জরিনা গলা নামিয়ে বলল, ‘দেখা করতে কইছে? তুমি জানো দেখা করার মানে কী?’

সাকিনা বিহ্বল হবার অভিনয় করল, ‘মানে কী?’

জরিনা ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করল। সাকিনাকে ঠেলল কনুই দিয়ে ‘তোমারে শোয়াইবে। বোঝ না?’

বাইরে একজনের চিৎকার শোনা গেল, ‘কই তোরা? কীরে জরিনা?’

জরিনা তড়িঘড়ি বাইরে গেল। কয়েক সেকেন্ড পরে একজন সুখী সুখী চেহারার লোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করল।

সাকিনা বোরখা পরে ছিল। লোকটা গম্ভীর গলায় বলল, ‘মজিদ পাঠাইছে তোমায়?’

সাকিনা কাঁদতে শুরু করল।

লোকটা বিব্রত হল, ‘আহা কান্দো ক্যান? আমার কাছে আইসা পড়সো যখন, তখন তোমার চিন্তা নাই। দেখি, বোরখা তোল।’

সাকিনা বোরখা তুলল। লোকটা ফিসফিস করে বলল, ‘মাশাল্লাহ, মাশাল্লাহ। তোমার তো চিন্তার কিছু নাই। আমি আছি তো। আমার কাছে আইছো যখন, তখন তুমি চিন্তামুক্ত। তুমি থাকবা আমার কাছে? টেকা দিমু নে। তার চিন্তা করতে লাগবো না, মজিদ যখন পাঠাইছে, তখন তো চিন্তার কিছুই নাই। এই নাও, এই নাও, টেকা নাও।’

পকেট থেকে টাকার গোছা বের করে সাকিনার কোলে ছুঁড়ে মারল লোকটা।

সাকিনাকে শক্ত থাকতে হবে। আসল পরীক্ষা শুরু হবে এখন।

‘জরিনা, ও জরিনা...’ সাদিক বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ হাঁক ডাক করে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

‘দেখি, সব খুলে ফেলাও দেখি, আমি আছি যখন, তোমার কুনো চিন্তা নাই। রানী কইরা রাখব তোমায়...’

রুমা একটু থমকে গেল। সাদিক ধৈর্য ধরতে পারল না। নিজেই এগিয়ে এসে রুমার বোরখা খুলতে শুরু করল...

টাকা। ভারতীয় টাকা না। বাংলাদেশী টাকা। তাও কম হবে না ভারতীয় মুদ্রায়। বেশ কয়েকটা নোটের বান্ডিল তার নগ্ন শরীরের উপর রেখে চলে গেছে সাদিক। রাত দেড়টা বাজে। রুমা আর শাড়ি পরেনি। চুপ করে শুয়ে আছে। এখানে থাকার জন্যই তো এত ট্রেনিং। এত কিছু। কত ভাবে তাকে বোঝানো হল, নিজেই ভুলে গেছিল সে।

শেষমেশ সাদিক তাকে ছুঁল। অভ্যস্ত শরীর। শরীর বিদ্রোহ করলেও সে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে গেছে। খুব একটা অসুবিধা হবেই বা কেন? এরকমই তো হয় অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ। একটা অচেনা অজানা লোক এসে জামা কাপড় খুলিয়ে মেয়েটার সঙ্গে শারীরিক মিলনে লিপ্ত হয়।

সাদিকের বউ হবে না সে। এই বাড়িতে একজন রক্ষিতার মতো থাকবে। বাড়িটা সাদিকের হারেমের মতন। তার সঙ্গে যারা কাজ করে, তাদের আমোদ প্রমোদের জন্য এই বাড়িটা রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে যে কারো সঙ্গে শুয়ে পড়তে হবে।

পাখি পড়ানোর মতো করে রুমাকে বোঝানো হয়েছিল। অসুবিধা হবার কথা নয়। রুমা বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বাথরুমে গিয়ে কল চালিয়ে বমি করল যাতে তার বমির শব্দ বাইরে না যায়। একটা ময়লা শাড়ি ছিল। সেটা পরেই বাথরুম থেকে বেরোল।

ঘরের দরজায় জরিনা এসে দাঁড়াল, 'সাহেব বলে গেছে এটাই তোমার ঘর। তুমি এখানে থাকবা।'

রুমা বলল, 'তুই এখানে কতদিন আছিস?'

জরিনা বলল, 'ছোট থেকেই। আমার মা সাহেবের কাছে থাকত। তারপর কী হইসিল জানি না।'

রুমা বলল, 'সাহেবের কাছে যাস না তুই?'

জরিনা দাঁত বের করল, 'না। উনি আমারে নেন না।'

রুমা বলল, 'আর কে থাকে এখানে?'

জরিনা বলল, 'থাকে আরও। তারা তোমার মতো না। তোমার নাম হবে। আমি বলে দিলাম। মিলায়ে নিও।'

রুমার মাথাটা দপ দপ করছে। জরিনা বলল, 'তুমি ঘুমায়ে পড়। কাল সকালে তোমারে সবার সঙ্গে আলাপ করাব।'

রুমা বলল, 'কেন? বাকিরা কোথায়?'

জরিনা বলল, 'সব আছে। একদিনে সব জানবা নাকি? এই তো ছোট একটা খানকি বাড়ি, তার বিষয়ে জানতে বেশিক্ষণ লাগব না। তুমি ঘুমাও। এখানে কুনো সমেস্যা নাই। ভালো থাকবা।'

রুমা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে বলল, 'ঠিক আছে। তুই যা।'

জরিনা বলল, 'দরজা বন্ধ কইরা দাও। এখানের পোলাগুলান ভালা না। তুমি দরজা খুইলা রাখবা, ঘরের ভিতর ঢুইকা যাইব।'

রুমার সেই ঘটনাটা মনে পড়ল। সে ঘুমোচ্ছিল হোটেলের ঘরে, আর ওই লোকটা ঢুকে এসেছিল। রুমা বলল, 'তুই আমার লগে ঘুমা।'

জরিনা রাজি হল। দরজা বন্ধ করে রুমার পাশে শুয়ে পড়ল।

রুমা চুপ করে শুয়ে রইল। তার ঘুম পাচ্ছে না। মাথার মধ্যে কত কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তার। নতুন পরিচয়, কোথায় থাকত, সব কিছু পাখি পড়ার মতো করে পড়তে হয়েছে। সাদিকের একটাই দোষ, মেয়ে মানুষের। সাদিকের একমাত্র মেয়ে সাপ্পায়ার মজিদ। তাকে মজিদের মাধ্যমে এখানে পাঠানো হয়েছে। সামনে কী আছে, কে জানে! শেষ রাতে ঘুম এল।

চোখ খুলে দেখল জরিনা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কোত্থেকে একটা হিন্দি গান ভেসে আসছে। রাতে এল, সাদিকের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে গেল, এর বাইরে কিছুই তো সে চেনে না।

জরিনাকে তুলবে? না থাক। ঘুমাক। এইটুকু মেয়ে। অযথা বিরক্ত করে লাভ নেই। খাট থেকে উঠে চুপ করে বসে থাকবে সে।

অদ্ভুত কিছু নির্দেশ আছে। সাদিক যা করছে, তাকে করতে দিতে হবে। সময় এলে তারপর কী করতে হবে বলে দেওয়া হবে। কতদিন তাকে এই নরকে পড়ে থাকতে হবে?

ভাবতে পারছে না কিছুই। দিব্যেন্দুর মুখটা ভেসে উঠল মনের মধ্যে।

সেই ভয়টা আবার ফিরছে। সিঁটিয়ে দেওয়া, কুঁকড়ে দেওয়া ভয়টা...

৫৮

'রাবণের কাছ থেকে সীতা ফিরে এল। তারপর রাম কী করেছিলেন?'

অরিত্র টিভি দেখছিল। এণাক্ষী হঠাৎ কথাটা বলে উঠল।

অরিত্র ভ্রু কুঁচকাল, 'মানে? এরকম বললে কেন?'

এণাক্ষী বলল, 'তোমার মনে সারাক্ষণ ধরে এই কথাটাই ঘুরপাক খাচ্ছে না? ওই দিনগুলোতে আমি কী করেছি?'

অরিত্র বলল, 'তোমার মেডিকাল রিপোর্ট বলছে তুমি একদম ঠিক আছ। আমি অকারণ অন্য কথা ভাবতে যাবই বা কেন?'

এণাক্ষী শ্বাস ছাড়ল, 'মনে হল। সারাক্ষণই মনে হয় আমার।'

অরিত্র বলল, 'কী মনে হয়?'

এণাক্ষী বলল, 'মনে হয়, আমি তোমায় ঠকিয়েছি।'

অরিত্র বলল, 'চুপ করো তো। কিচ্ছু ঠকাওনি। চাইলে তুমি শ্যুটেও যেতে পারো। আমি আটকাবো না।'

এণাক্ষী বলল, 'এরকম ব্যাপার? এত স্বাধীন?'

অরিত্র বলল, 'হ্যাঁ। এরকমই ব্যাপার এবং ঠিক এতটাই স্বাধীন। চিন্তার কিছু নেই। চিন্তা করিও না। তুমি আজেবাজে ভেবো না। তিন মাস কেটে গেল। এবার মূল স্রোতে ফেরো। নইলে কাউন্সেলিং করাতে চাইলে করাও। থাক, তুমি তো কোনদিন চাইবে না, আমিই দেখছি।'

এণাক্ষী বলে উঠল, 'না না, তার দরকার নেই। অনেক টাকা নিয়ে নেয়। দরকার নেই।'

অরিত্র বলল, 'টাকাটা বড় কথা না। তোমার সুস্থ থাকাটা বড় কথা।'

এণাক্ষী অরিত্রর কাছে ঘেঁষে বসল, 'তুমি খুব চিন্তায় পড়ে গেছিলে, বলো?'

অরিত্র বলল, 'ভীষণ। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। যেটা কোনওদিন করি না, তাও করে ফেললাম। মারপিট। ভাবতে পারছ?'

এণাক্ষী চোখ বড় বড় করে বলল, 'সত্যি। আমি ভাবতে পারছি না। কী সব করে বসেছ। এত ভালোবাস আমায়?'

অরিত্র হাসল, 'একদম। তোমায় ছাড়া আমি পাগল হয়ে যাব।'

এণাক্ষী বলল, 'তারপর তো আমি মরলে আরেকটা বিয়ে করতে। তখন বলতে পাগলে কী না বলে।'

অরিত্র এণাক্ষীকে জড়িয়ে ধরল, 'না। কোনদিন বলব না। চল কোথাও ঘুরে আসি। কাছে পিঠে। কোনও শপিং মলে। যাবে? সারাদিন ল্যাপটপে কাজ করে মাথাটা জ্যাম হয়ে গেছে।'

এণাক্ষী বলল, 'চল। আমি রেডি হয়েনি তাহলে। তুমিও একটা ভালো জামা পরো। রাতে বাইরে খাব।'

অরিত্র উঠল, 'একদম। চল।'

দুজনে বেরোল কিছুক্ষণ পরে। দুজনকেই ঝকঝকে লাগছে। অরিত্রর পাশে এণাক্ষী বসল। ড্রাইভ করতে করতে অরিত্র বলল, 'আমার আজকাল সব স্বপ্ন মনে হয়। তোমার ফিরে আসাটা আমি এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারি না। আমার মনে হয়েছিল আর কোনদিন তোমাকে ফিরে পাব না। ছি ছি, কী যা-তা বলেছিলাম।'

এণাক্ষী বলল, 'থাক। বার বার আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না। আমি কত লাকি যে তোমাকে পেয়েছিলাম। অত ঝগড়ার পরে আমার জন্য ছুটে এসেছিলে।'

অরিত্রর চোখে জল। রাতের মোহময়ী শহরে কিছুক্ষণ পর অরিত্র এক শপিং মলে পার্ক করল। মাইনাস টু ফ্লোরে তারা দাঁড়িয়ে আছে লিফটের জন্য। লিফট এসে দাঁড়াল। একজন স্যুট পরিহিত ভদ্রলোক লিফট থেকে বেরোলেন। লিফটে তারা দুজন উঠল। লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পারফিউমের গন্ধটা নাকে যাওয়া মাত্র এণাক্ষী নাক কুঁচকে ছিল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, 'তাই ভাবছি এই গন্ধটা আমি কোথায় পেয়েছি। মনে পড়েছে।'

অরিত্র চমকে উঠল, 'কী মনে পড়েছে?'

এণাক্ষী বলল, 'এই যে লোকটা নেমে গেল লিফট থেকে, এই লোকটাই ছিল সেদিন। শিগগিরি চল বেসমেন্টে। শিগগিরি।'

লিফট উপরে যাচ্ছিল। অরিত্র মাইনাস টু দিল। থার্ড ফ্লোর থেকে ঘুরে আবার নীচে নামতে বেশ খানিকটা সময় চলে গেল। মাইনাস টুতে লিফট নামতেই এণাক্ষী সঙ্গে সঙ্গে নেমে গিয়ে দৌড়ে চারদিকে দেখল। নাহ্, কোথাও কেউ নেই। পারকিং ফ্লোরের এক কোণ থেকে অন্য কোণে দৌড়ে গেল এণাক্ষী। পাগলের মতো খুঁজতে লাগল। কাউকে দেখতে পেল না।

অরিত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এণাক্ষী বেশ কিছুক্ষণ খুঁজে অরিত্রর কাছে এসে অরিত্রর হাত ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'লোকটা ছিল। এই লোকটাই সেদিন তুলে নিয়ে গেছিল।'

অরিত্রর চোখে পড়ল তার গাড়ির উইন্ডশিল্ডে একটা কাগজ সেঁটে রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে কাগজটা হস্তগত করল সে, তাতে লেখা, 'এণাক্ষী ম্যাম, ভাগ্যিস আপনার হাজব্যান্ড আপনাকে ভালোবাসেন...ভালো থাকবেন। হ্যাভ এ ব্লাস্ট। ভবিষ্যতে আর কোনদিন আমাদের দেখা হবে না...।'

৫৯

ঝাঁ চকচকে আধুনিক একটা বিল্ডিং। সতেরো তলা। প্রতিটা ফ্লোরে সিসিটিভি ক্যামেরা। প্রতিটা ঘরে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা। এসি। মেডিকাল ফেসিলিটি। নিউট্রিশনিস্ট নির্দেশিত খাবার। পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা ডিপোজিট। প্রতি মাসে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা।

লোকটা রিসেপশনে বসে শুনছে, সুবেশ সেলসম্যান এন আর আই ছেলে আর তার বউকে বৃদ্ধাশ্রমের সুযোগ-সুবিধা বোঝাচ্ছে। এন আর আইকে বলছে, 'স্যার, আপনি একবারে নিশ্চিন্ত থাকুন। এই ডিপোজিটটা আপনার বাবা এক্সপায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার অ্যাকাউন্টে ব্যাক করবে। আমরা সে চুক্তিও করে নেব। এই প্রশ্নটা বার বার আমাদের করে আপনি বিব্রত করবেন না প্লিজ।'

রিসেপশনে বসে থাকা লোকটা সেলসম্যানকে ইশারায় ডাকল। সেলসম্যান লোকটার কাছে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ স্যার।'

লোকটা বলল, 'বিপ্র পালিত। সাতশো সতেরো। অ্যাক্সেস কী দিন। আপনাদের রিসেপশনিস্ট অনেকক্ষণ তার সিটে নেই। এরপর আমি কমপ্লেইন করতে বাধ্য হব।'

সেলসম্যান বলল, 'শিওর স্যার। আমি একবার বিপ্রবাবুর সঙ্গে কথা বলেনি?'

লোকটা ঘাড় নাড়ল, 'শিওর।'

সেলসম্যান বলল, 'আপনার নামটা স্যার?'

লোকটা বলল, 'বলুন ওর বন্ধু সুমিত এসেছে পাটায়া থেকে।'

সেলসম্যান বলল, 'ওকে স্যার।'

সেলসম্যান বিপ্রকে ফোন করল। কথা বলে লোকটার হাতে অ্যাক্সেস কী এগিয়ে দিয়ে বলল, 'লিফট ডান দিকে স্যার। ভালো থাকবেন।'

লোকটা সেলসম্যানকে আর পাত্তাও দিল না। অ্যাক্সেস কী নিয়ে লিফটে উঠল। লিফটে অ্যাক্সেস কী-টা স্ক্যান করাতে হয়। স্ক্যান করানোর পর সাত টিপলে লিফট চলতে শুরু করল। সাত নম্বর ফ্লোরে লিফট দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা লিফট থেকে নেমে সাতশো সতেরো নাম্বারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। লোকটা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। এসি চলছে। বেশ ঠান্ডা হয়ে গেছে ঘর।

বিপ্র বলল, 'চা চলবে স্যার?'

লোকটা বলল, 'শিওর।'

বিপ্র ইলেকট্রিক কেটলে গরম জল বসাল।

লোকটা বলল, 'এরকম সুন্দর বৃদ্ধাশ্রম থাকতে লোকে বাড়িতে থাকবে কেন? ফাইভ স্টার হোটেলকে এর কাছে শিশু মনে হচ্ছে। ছেলেমেয়ের কাছে কে থাকবে? সারাজীবন চাকরি করে টাকা জমিয়ে এখানে চলে এলেই তো হয়।'

বিপ্র হাসল, 'হ্যাঁ স্যার। ঠিকই বলেছেন।'

লোকটা বলল, 'আমরা তোমার জন্য এত গাদা গাদা টাকা খরচ করে এখানে রেখেছি, তোমায় বাড়ি করে দিয়েছি। পরিবর্তে তুমি কী করেছ বিপ্র, যদি একটু বলো।'

বিপ্রর মুখ শুকিয়ে গেল, 'স্যার, আপনারা যেভাবে বলছেন, আমি সেভাবেই তো সব করছি। অ্যাসেট বাংলাদেশ চলে গেছে। তার নিখুঁত কভার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সাদিকের দালালকে ম্যানিপুলেট করা হয়েছে, যা যা বলেছেন, তাই তো করেছি।'

লোকটা রিমোট নিয়ে টিভির চ্যানেল পাল্টে বলল, 'টেল মি অ্যাবাউট অমল।'

বিপ্র বলল, 'অমল বেশ কয়েকদিন রিপোর্ট করেনি। সাদিকের সঙ্গে ওর মেলামেশা বেড়েছে।'

লোকটা শিস দিয়ে উঠল, 'গুড। মেলামেশা বাড়বে, সেটা আমি চাই। ওকে সেজন্যই ওখানে পাঠানো হয়েছে।'

বিপ্র বলল, 'সাদিকের কাজ করতে সাদিকের দেওয়া ফেক আইডি নিয়ে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, বাহরিনের মতো দেশগুলোতে যাওয়ার কথা কি বলা হয়েছিল?'

লোকটা টেবিলের উপর চায়ের কাপ রাখল, 'তার কারণ কী দেখিয়েছে?'

বিপ্র বলল, 'বলেছে সাদিকের বিশ্বাস অর্জন করতে চায়। এটা করলে কী ধরনের বিশ্বাস অর্জন হবে? আমার তো ভয় লাগছে এর ফলে অমলের কভারটাই না নষ্ট হয়ে যায়। তখন কী হবে?'

লোকটা বলল, 'ওকে। টেল অমল টু কন্ট্যাক্ট রুমা। পারবে?'

বিপ্র বলল, 'মেসেজ পাঠাচ্ছি। দেখা যাক কী রিপ্লাই করে।'

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আর রুমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে না পারলে অমলকে বলে দাও, বাংলাদেশের সব কাজ বন্ধ করে ইমিডিয়েটলি দিল্লিতে রিপোর্ট করতে। ওকে ওখানে কিছু করতে হবে না।'

বিপ্র খুশি হল, 'আমি সেটাই বলতে চাইছিলাম স্যার।'

লোকটা বলল, ‘পেটে এক আর মুখে এক রাখবে না। তোমাকে এখানে এত টাকা দিয়ে ইয়ার্কি মারতে রাখা হয়নি।’

বিপ্র অপ্রতিভ হয়ে বলল, ‘স্যার, তাতে আপনিই আমার উপর রেগে যেতে পারতেন। আপনি কী ডিসিশন নেবেন, সেটা আমার বলে দেওয়া ঠিক হবে না।’

লোকটা চিন্তিত মুখে বলল, ‘অ্যান্ড, বাই দ্য ওয়ে, পূর্ণ নাম না লোকটার? কোথায় আছে এখন?’

৬০

অদ্ভুতভাবে পরদিন আর সাদিক এল না। রুমা অবাক হলেও কিছু বলল না। জরিনা এসে ঘুরঘুর করে। মেয়েটাকে দেখে বড় মায়া হয়। এইটুকু মেয়ে। সাদিক যদি ওর বাপও হয়, ওর মেয়েকে এখানে রেখে দিল? এরা কেমন ধরনের মানুষ? নাকি এরা দিব্যেন্দুর মতোই মানুষ? নাকি তার থেকেও খারাপ?

দরজার কাছে এসে জরিনা দাঁড়িয়ে আছে। রুমা বলল, ‘কী বলবি? ঘরে আয়।’

জরিনা ঘরে ঢুকে বলল, ‘কিছু খাবা?’

রুমা বলল, ‘খেয়েছি তো। আর খাব না।’

জরিনা বলল, ‘কিছু খাইলে বলো।’

রুমা বলল, ‘বলব। সবাই কোথায় এখন?’

জরিনা বলল, ‘বাজার গেছে।’

রুমা অবাক হল, ‘মেয়েরাও?’

জরিনা হাসল, ‘এখানে তুমি ছাড়া কেউ থাকে না তো। রাতে মেয়ে নিয়ে আসে। ধান্দা করে চলে যায়। এইখানে কয়টা ঘর আছে শুধু সাহেবের।’

রুমা বলল, ‘এখানে শুধু সাহেব আসে?’

জরিনা ঘাড় নাড়ল, ‘হ্যাঁ। আরও আসে। চেনা জানা লোক। তোমার আগে এখানে একজন ছিল। তাকে হঠাৎ করে পাওয়া যাচ্ছে না।’

রুমা বলল, ‘কে ছিল?’

জরিনা বলল, ‘আমিনা আপু। সাহেব এলে আমিনা আপুর কাছে থাকত।’

রুমা বলল, ‘কী হয়েছিল তার?’

জরিনা অদ্ভুতভাবে রুমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

রুমা অবাক হল, ‘কীরে? কী হয়েছিল বলবি না?’

জরিনা বলল, ‘কক্সবাজারে নিয়া গেছিল। তারপর আর তারে খুঁজে পাওয়া যায় নাই। সাহেবের অনেক খেয়াল।’

রুমা বলল, ‘কী খেয়াল?’

জরিনা কথা বন্ধ করে টিভি চালিয়ে দিল। রুমা বলল, ‘কীরে? কী খেয়াল বলবি তো?’

কলিং বেল বাজল। জরিনা অবাক হয়ে বলল, ‘সকালে সাহেব আসল নাকি? ও আল্লা! দেখি।’

জরিনা বেরিয়ে গেল। মিনিট খানেক পর এসে বলল, ‘রুমান ভাই আসছেন। আমাকে বাজারে যেতে বলসেন। তুমি কথা বলবা? সাহেবের বন্ধু?’

রুমা কিছু বলার আগেই রুমান ঘরে ঢুকে জরিনাকে ধমক দিল, ‘তুই যা। যা বলছি নিয়া আয়। দেরি করবি না।’

জরিনা ভীত মুখে রুমার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। রুমান চেয়ারে বসল। রুমা তাকাল। শমিতা শিখিয়েছিল। বেশ্যাবাড়ি সাধারণ ঘরবাড়ির মতো না। এখানে কেউ বলে ঘরে ঢোকে না। এভাবেই হুট হাট করে ঢুকে যাবে।

'আমাকে আপনার খোঁজ খবর নিতে পাঠানো হয়েছে।'

রুমানের মুখে হঠাৎ কলকাতার বাংলা শুনে অবাক হয়ে গেল রুমা। রুমান বলল, 'আপনার সঙ্গে দেখা করার ইন্সট্রাকশন আছে। আগের মেয়েটাকে আমরাই গুম করেছি। আপনার এন্ট্রান্সের জন্য।'

রুমান উঠে পর্দা সরিয়ে বাইরেটা দেখে এসে বলল, 'কোনও রেকর্ডিং ডিভাইস ইউজ করবেন না। ফোন রাখবেন না। সাদিক যা বলবে, সব মাথায় রাখবেন।'

রুমানের দিকে চুপ করে চেয়ে থেকে রুমা বলল, 'আমাকেও সাদিক ওরকম করে দেবে? গুম করে দেবে? মেরে দেবে?'

রুমান বলল, 'পারবে না।'

রুমা বলল, 'এত শিওর হচ্ছেন কী করে?'

রুমান বলল, 'হচ্ছি। শিওর হবার কারণ আছে বলেই বলছি।'

রুমা বলল, 'আর আমার ফেরার পথ?'

রুমান বলল, 'সেটা আপনি ঠিক করবেন। আমি বলব না। পারবেন?'

রুমা চুপ করে বসে থেকে বলল, 'আপনি করবেন? না আমাকেই করতে হবে?'

রুমান বলল, 'আমি ব্যবস্থা করব।'

রুমা বলল, 'নইলে মরতে হবে। তাইতো?'

রুমান উঠে দাঁড়াল, 'দেখা যাবে। বেঁচে থেকে কী করবেন? কোন লোক বেঁচে থেকে কিছু করতে পেরেছে? আমিই বা বেঁচে থেকে কী করতে পারলাম? এখন যাই। জরিনা এসে যাবে যেকোনও সময়। সাদিক যেন সন্দেহ না করে।'

রুমা বলল, 'আপনার কলকাতায় বাড়ি?'

রুমান বেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, 'ভুলে গেছি কোথায় বাড়ি।'

৬১

দিল্লি

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। তুষার বই পড়ছিলেন। গল্পের বই।

আশরফ খান দরজায় নক করলেন, 'আসব স্যার?'

তুষার বললেন, 'এসো।'

খান চেম্বারে প্রবেশ করে বললেন, 'কী বই পড়ছেন?'

তুষার হাসলেন, 'নভেল। আরে তুমি বসো। খবর বলো।'

খান বললেন, 'মিজান আহমেদ সম্ভবত নেক্সট উইকে সাদিকের কাছে যাচ্ছে। আমাদের কাছে সেরকমই খবর আছে।'

তুষার বললেন, 'খবরটা কি ঢাকা থেকে এল?'

খান বললেন, 'না। দুবাই থেকে। আলি জানালো। ঢাকার ইন্টেল জাস্ট কোনও রিপোর্ট করছে না। কবে কী করবে কিচ্ছু বলছে না।'

তুষার ভ্রু কুঁচকালেন, 'কেন? ঢাকার কী হয়েছে?'

খান বললেন, 'কিছুক্ষণ আগেও রিপোর্ট করল, বলল সব ঠিকঠাক। তাহলে আলির খবর আলাদা হল কী করে? ঢাকা জানছে না, দুবাই জেনে যাচ্ছে...সামথিং ইজ ফিশি।'

তুষার বললেন, 'মিজান মুজফফরাবাদ থেকে বেরোবে। সায়ক এই খবরটা দিয়েছিল। কিন্তু ওর নেক্সট ডেসটিনেশন কী, সেটা ও জানতে পারেনি। এবার জিগস পাজলের একটা মিস্ট্রি সলভ হল।'

খান চিন্তিত মুখে বললেন, 'আই এস আই আবার অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে স্যার। ঢাকা একটা বড় কনসার্ন হয়ে যাচ্ছে। এখানে যদি সরকার পাল্টায়, তাহলে...'

তুষার বললেন, 'অবভিয়াসলি। তবে ডেমোক্রেসিতে সরকার পাল্টাতেই পারে। তার জন্য আমাদের বসে থাকলে চলবে না। আমরা কীসের জন্য বসে থাকব? এগুলো তো আমাদের কন্ট্রোলে নেই। আরেকটা ব্যাপারও আছে। জনমত উপেক্ষা করে কোনও দেশে যদি অহেতুক জনস্বার্থ বিরোধী সরকার চলে, সে দেশের আইনশৃঙ্খলা আরও বেশি করে প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। আই এস আই তখন সেখানে নিশ্চিন্তে অপারেট করবে।'

খান বললেন, 'তাও ঠিক।'

তুষার বললেন, 'ঢাকার সেল অ্যাক্টিভ কর। মিজানের অ্যাক্টিভিটির পুরোটা চাই আমার। মিজান এখন কোথায়? দুবাইতেই আছে?'

খান বললেন, 'হ্যাঁ। খুব কেনাকাটা করছে। প্রচুর সোনা কিনেছে।'

তুষার বললেন, 'সোনা মানে? গয়না না বার?'

খান বললেন, 'দুটোই। বার বেশি। সেভেন্টি থার্টি রেশিও। মানে...'

তুষার খানকে শেষ করতে দিলেন না, 'এভাবে ফান্ড পাঠাবে নাকি? তা মনে হয় না। দুবাই থেকে ঢাকায় ফান্ডিং এর জন্য মিজান সোনার বার কিনে নিয়ে যাবে না। অন্য কিছু করবে।'

খান বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'কী হবে?'

তুষার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বইটা টেবিলের উপরে রেখে ইন্টারকমে পীযূষকে ফোন করলেন, 'একবার এসো তো।'

পীযূষ এসে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার।'

তুষার বললেন, 'লাস্ট সাত দিনের ক্রিপ্টো রেট কী আছে?'

পীযূষ বললেন, 'ডাউনের দিকে। ক্রিপ্টোর এক্সচেঞ্জ কম আছে।'

তুষার বললেন, 'ডার্ক ওয়েবে?'

পীযূষ বললেন, 'কেউ কেউ এখন গোল্ড প্রেফার করছে। ক্রিপ্টো অনেকেই নিচ্ছে না।'

তুষার বললেন, 'সলিড গোল্ড?'

পীযূষ বললেন, 'সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে সলিড গোল্ডই বেশি প্রেফারেন্স পাচ্ছে।'

তুষার বললেন, 'হঠাৎ গোল্ডের দিকে ঝুঁকছে কেন সব?'

পীযূষ বললেন, 'ইন্ডিয়ান মার্কেটে ট্যাক্সের জন্য ক্রিপ্টোর এক্সচেঞ্জ কমেছে। এখনও ইন্ডিয়া-ই এখানকার ইকোনমি কন্ট্রোল করে। সেটা একটা কারণ অবশ্যই।'

তুষার বললেন, 'আরও কী কী কারণ হতে পারে একটা সার্ভে করে আমাকে জানাও। সামথিং ইজ ভেরি ফিশি।'

খান পীযূষকে বললেন, 'ঢাকার ডার্ক ওয়েব থেকে কিছু পাওয়া গেছে লাস্ট সাত দিনে?'

পীযূষ বললেন, ‘ওদিকে আর্মস ডিলিং বেড়েছে। সেটা লাস্ট সাত আট মাসে এমনিতেও বেড়েই আছে। ইলেকশন আছে বলে বাড়তে পারে।’

খান তুষারের দিকে তাকালেন, ‘স্যার, আমি কি ঢাকা যাব?’

তুষার মাথা নেড়ে বললেন, ‘না। এখনই না। আমি আরও চার পাঁচ দিন দেখব। ঢাকার ইন্টেল থেকে কিছু খবর না পেলে তারপর বলছি। অবিনাশ কী বলছে বল তো? ঠিক করে রিপোর্ট করছে না কেন? আবার বিগড়েছে নাকি?’

পীযূষ বললেন, ‘অবিনাশ এখন কলকাতায়। আজকেই লোকেশন আপডেট পেয়েছি।’

তুষার বললেন, ‘সে কী? আমায় বলেনি কেন?’

পীযূষ বললেন, ‘আমি তো ভেবেছি আপনাকে বলেছে।’

তুষার বললেন, ‘না। আমি সেটাই জানতে চাই। কন্ট্যাক্ট করো। আমার সমস্ত আপডেট চাই।’

পীযূষ বললেন, ‘ওকে স্যার।’

পীযূষ চেম্বার থেকে বেরোতেই তুষার গম্ভীরমুখে বললেন, ‘খান, অবিনাশের কাজকর্ম মনিটরিং করার সময় এসেছে। আমার কাছে ওর ব্যাপারে বেশ কয়েকটা রিপোর্ট আছে। তার ইনভেস্টিগেশন শুরু হবে। আমার মনে হয় ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে তোমায় অনেক বেশি ভিজিল্যান্ট হতে হবে।’

খান বললেন, ‘ঠিক আছে স্যার। আমি দেখে নিচ্ছি।’

তুষার চিন্তিত মুখে বসে রইলেন।

৬২

সবসময় ভয় নিয়ে বেঁচে থাকতে কেমন লাগে? তা সে জানে। দিব্যেন্দু যখন অফিস থেকে ফিরত। যেদিন খুব ভয় পেত, দেখা যেত সেদিন কিছুই করল না। যেদিন শুরুটা হালকাভাবে হল, সেদিনই দেখা গেল হঠাৎ করে গায়ে হাত তুলতে শুরু করে দিত।

জরিনার সঙ্গে গল্প করছিল সে। রাত দশটা বেজেছে। ভাবছিল আর হয়তো কেউ আসবে না, ভাবতে না ভাবতেই কলিং বেল বেজে উঠল। জরিনা বলল, ‘সাহেব আসছে মনে হয়।’

রুমা বলল, ‘দেখ।’

জরিনা উঠে দরজা খুলল। ঠিকই ধরেছে সে। সাদিক ঢুকল। রুমাকে দেখে বলল, ‘কেমন লাগে তোমার এখানে সাকিনা কুমারী?’

রুমা বলল, ‘আসেন।’

সাদিক দরজা বন্ধ করল।

খাটের উপর উঠে বসে অভ্যস্ত হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। যেন কতদিনের চেনা। রুমার শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, ‘তুমি বড়ই সুন্দর। বেশ্যা না হইলে তোমারে বাসায় নিয়া তুলতাম।’

রুমা সাদিকের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ‘আপনি আমার কাছে আসেন, এটাই আমার বাসা।’

সাদিক বলল, ‘বাঃ, তুমি ভারি সুন্দর কথা কও। কে শিখাইসে তোমারে কথা কওন?’

রুমা বলল, ‘শিখাইবার লাগে নাই। আমি এমনিই কই।’

সাদিক আলো নিভিয়ে দিল। প্রথম দিন তাড়া ছিল। এদিন ধীরে ধীরে রুমাকে বিবস্ত্র করল। রুমাও সঙ্গত করল। তাকে সাদিককে খুশি রাখতে হবে। তার জন্য যা করার, সব করতে হবে।

সাদিক দিব্যেন্দুর মতো নয়। সে শৌখিন মানুষ। রুমার ভালো লাগছিল। নিজেই মরমে মরে যাচ্ছিল সেই জন্য। এই ক্রিমিনালটাকে তার ভালো লাগছে শুধু শরীরের জন্য? তাহলে কি শরীরই সব?

স্খলনের পর রুমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইল সাদিক। আবেগপূর্ণ গলায় বলল, 'তুমি ভালো। খুবই ভালো সাকিনা কুমারী। তোমার জন্য আমি গয়না আনব।'

রুমা আগ্রহী ভাব আনল গলায়, 'কোন গয়না আনবেন?'

সাদিক বলল, 'তোমারে এখন কমু না। নিয়া আসুম।'

রুমা বলল, 'আনবেন।'

সাদিক বলল, 'আমার এক মেহমান আসব। আমি ভাবসিলাম তোমারে নিয়া যাব তার কাছে। কিন্তু আমার তোমারে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। মেহমানের জন্য আমি মাইয়া ভাড়া কইরা আনুম। তুমি আমার রানি হবা।'

রুমার হার্টবিট মিস হল। তবু সে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল, 'মেহমান? কোন মেহমান?'

সাদিক জোরে হাসল, 'সবে তো আইলা। কত মেহমান আসব এখানে। দেইখা শেষ করতে পারবা না।'

রুমা গলায় ন্যাকামি আনল, 'এখন আমি নূতন আইসি, তাই আমারে নিয়া আফনের এত আনন্দ। আমি পুরানা হইলেই আফনি আমারে সবাইরে বিলায়ে দিবেন।'

সাদিক রুমার গাল ধরে নাড়ল, 'না না। তুমি দেখবা।'

সাদিকের ফোন বেজে উঠল। সাদিক সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। ফোন ধরে বলল, 'বলো...জি, জি...আইতাসি, বাজারে আইসিলাম...আসি।'

ফোন রেখে বলল, 'বাসার ডাক আইসে।'

রুমা বলল, 'ভাবি?'

সাদিক হেসে উঠল, 'ভাবি কও কেন? আমি কি তোমার ভাই হই?'

রুমা বলল, 'তাহলে কী কমু?'

সাদিক বলল, 'ভাইবা কমু।' আলো জ্বালল সে। ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে রুমার হাতের দিকে চোখ পড়তে দাঁড়িয়ে গেল। কালশিটে দাগ আছে হাতে। সিগারেট খেতে গিয়ে দিব্যেন্দু ছ্যাকা দিয়েছিল।

বলল, 'কোন শুয়ারের বাচ্চার কাম এইডা?'

রুমা সাদিকের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'মইরা গেছে সেইডা।'

সাদিক বলল, 'তোমারটা?'

রুমা ঘাড় নাড়ল।

সাদিক বলল, 'তোমারে যে জ্বালাইবে, তুমি শুধু আমারে কইবা। তারপর আমি বুঝুম। বুঝলা?'

রুমা খিলখিল করে হাসল। এই হাসিটা শমিতা শিখিয়ে বলেছিল, এটা নাকি খানকি হাসি। সে খানকি হয়েছে। এরকম হাসি হাসতে হয়। কী অদ্ভুত একটা কথা। কোনও মানে হয়? ভেবেছিল কোনদিনও এই হাসিটা হাসবে না। সাদিকের কথা শুনে সে হাসিটাই হাসল। তার জন্য নাকি একজন পুরুষ লড়বে। তার জন্য? কী অদ্ভুত!

৬৩

'মাথুর, ঘুমিও না। নামতে হবে।'

অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর কলকাতায় প্লেন ল্যান্ড করবে। মাথুর ঘুম ভেঙে সোজা হয়ে বসলেন।

খান বললেন, ‘কী স্বপ্ন দেখছিলে?’

মাথুর ফিক ফিক করে হেসে বললেন, ‘অদ্ভুত একটা স্বপ্ন। বললে বিশ্বাস করবে না তুমি।’

খান বললেন, ‘সেটা কী বলে ফেলো। তার জন্য সাসপেন্স ক্রিয়েট করার কিছু নেই।’

মাথুর বললেন, ‘আরাবিয়ান নাইটস পড়েছ?’

খান বললেন, ‘স্যার তো এখন ওটাই পড়ছেন। তুমি ওই বইটার স্বপ্ন দেখলে?’

মাথুর বললেন, ‘ইয়েস। ওই বইটার স্বপ্ন দেখলাম। আরাবিয়ান নাইটসে রানিদের দুই বোনের নাম কী ছিল?’

খান মনে করার চেষ্টা করলেন। করতে পারলেন না। বললেন, ‘ভুলে গেছি।’

মাথুর বললেন, ‘শাহারজাদি, আর দিনারজাদি। শাহারজাদি রাজা শাহরিয়রকে বিয়ে করবেন। রাজা হিংস্র। দেশের সব মেয়েকে বিয়ে করে খুন করে ফেলছে। বাকি মেয়েদের বাঁচাতে শাহারজাদি রাজাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।’

খান বললেন, ‘রাইট। তা তুমি কী স্বপ্ন দেখলে? তুমিই কি সেই রাজা হয়ে গেছ নাকি? নাকি তুমি রানি হয়ে গেছো?’

মাথুর বললেন, ‘আমি দেখলাম এরা সব দিল্লিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজা হুমায়ুন টুম্বে বসে রানির কাছে গল্প শুনছে। জাস্ট ইমাজিন!’

খান হাসতে হাসতে বললেন, ‘তুমি এটা স্বপ্ন দেখলে? মানে ভালো কোনও স্বপ্ন দেখতে পারলে না?’

মাথুর বললেন, ‘ভালো স্বপ্ন মানে কলকাতার বিরিয়ানি? সেটা তো গিয়ে নিজের হাতেই চাখব। ওটা নিয়ে ভেবো না।’

প্লেন অবতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। খান সোজা হয়ে বসলেন, ‘ঠিক আছে খেও। অবিনাশকে আগে খুঁজি।’

মাথুর বিরক্ত মুখে বললেন, ‘ওই এক পাবলিক। তোমাদের সব পেয়ারের লোক। ওকে আমার কোনওকালেই পোষায় না।’

খান বললেন, ‘পেয়ারের লোক? আমার তো না। তাহলে তুমি স্যারের কথা বলছ।’

মাথুর বললেন, ‘স্যার ওকে পছন্দ করেন বলে মনে হয় না। তবে...’

মাথুর আর কিছু বললেন না।

খান বললেন, ‘তবেটা কী?’

মাথুর বললেন, ‘পরে বলছি। পৌঁছই।’

খান বললেন, ‘ওকে।’

ল্যান্ডিং, লাগেজ কালেকশন সব মিলিয়ে আধ ঘণ্টা লাগল। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে দুজনে ক্যাব নিলেন। ড্রাইভারকে হোটেলের ঠিকানা বলে জানলার বাইরে তাকালেন খান, ‘অ্যামেজিং সিটি। যতবার আসি, এত ভালো লাগে।’

মাথুর বললেন, ‘অ্যামেজিং বিরিয়ানি, সেটা বলো। আমার দিল্লির বিরিয়ানি কিন্তু কলকাতার মতো লাগে না যাই বলো। এখানকার বিরিয়ানিতে যে আলুর ব্যাপারটা, সেটা অদ্ভুত।’

খান বললেন, ‘তুমি কি ভ্লগার হওয়ার প্ল্যান করছ রিটায়ারমেন্টের পরে?’

মাথুর বললেন, ‘সেরকমই।’

খান ফোন বের করে অবিনাশের নাম্বারে ফোন করলেন। তারপর মাথা নাড়লেন, ‘নট রিচেবল। ওকে ফোনে পাওয়া যাবে না।’

মাথুর শিস দিচ্ছিলেন। বললেন, ‘ঠিক আছে। ও কলকাতা চেনে তো আমরাও চিনি। চিন্তার কিছু নেই।’

খান চোখ বন্ধ করলেন, বললেন, ‘হোটেলে গিয়ে স্নান করতে হবে। স্নান করা হয়নি।’

মাথুর বললেন, 'আগে খেয়ে নিলে হতো না?'

খান মাথা নাড়লেন, 'মোটেই না। দয়া করে এই রিকোয়েস্টটা কোরো না। আগে চেক ইন করি।'

মাথুর ঘড়ি দেখলেন, 'ঠিক আছে। খিদে যত বাড়বে, তত ভালো।'

খান ফোনটা আবার হাতে নিয়ে অবিনাশকে মেসেজ করলেন, 'অনলাইন হলে ফোন করবেন। আর্জেন্ট।'

মাথুর সেটা দেখে আবার শিস দিলেন, 'লাভ হবে না। সম্ভবত এই সিমটা পাল্টেছে। ভাই, গাড়ি দাঁড় করিয়ে দাও। এখানে নেমে যাব।'

খান বললেন, 'লাগেজ?'

মাথুর ড্রাইভারকে বললেন, 'হোটেলের ঠিকানা দিয়েছি। লাগেজ হোটেলে নিয়ে গিয়ে জমা করে দিন।'

ড্রাইভার গাইগুই করছিল। মাথুর একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন, 'দিয়ে আসুন। কাজ আছে।'

ড্রাইভার আর কিছু বলল না। গাড়ি চলে গেল। খান বিরক্ত গলায় বললেন, 'তোমার জন্য আমি স্নান করতে পারলাম না। কী করবে এখন?'

মাথুর নাম্বার ডায়াল করলেন। ও প্রান্ত ফোন ধরতে বললেন, 'বিলাল? লোকেশন পাঠাচ্ছি। বাইকটা নিয়ে এসো। একটা ইঁদুর ধরতে যেতে হবে। দুজন দুটো বাইক নিয়ে আসবে। ফাইন।'

ফোন কেটে দিলেন মাথুর। খান বললেন, 'সিরিয়াসলি? বাইক লাগবে? বলিউডের হিরো তুমি?'

মাথুর বললেন, 'তুমিই তো বলো ইঁদুর যেখানে লুকোয় সেখানে চার চাকা যায় না। আবার আমাকে হিরোগিরির কথা বলছ?'

খান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। ফোন বেজে উঠল। দেখলেন, অবিনাশ ফোন করছে...।

৬৪

মানুষের একটা জায়গায় থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে যায়। তারও হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে বাকি জীবনটা এখানে কাটলেও খারাপ হতো না। কী আর হবে? বাজে কোনও রোগে মরে যাবে? তাই হবে! এর বেশি তো আর কিছু হবে না। তার যা জীবন, তাতে বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে খুব বেশি তফাত নেই। একটা সুতোর উপর দিয়ে হাঁটার মতো বেঁচে থাকাটা।

শুয়ে ছিল রুমা। সকাল হয়েছে। জরিনা একগাদা পরোটা নিয়ে এল, 'খাবা না?'

রুমা বলল, 'এতগুলো পরোটা কে খাবে?'

জরিনা বলল, 'খাও না। সাহেব টেকা দিয়া গেছে।'

রুমা পরোটা ভেঙে খেল। বাইরে থেকে একটা কোকিলের ডাক শোনা গেল। জরিনা হেসে ফেলল, 'দেখস? এই সময় কোকিল ডাকে নাকি। কুনো শয়তান পুলার কাণ্ড।'

রুমাও হাসল। কয়েক সেকেন্ড পরোটাটা একটু একটু করে খেয়ে বলল, 'আমি একটু বাজার যামু। কাজ আছে।'

জরিনা বলল, 'লোক আছে তো। তোমার যাওনের কী দরকার?'

রুমা বলল, 'ভালো লাগে বল, সারাদিন এক ঘরে! বোরখা পরে যাচ্ছি। তুই কাউকে বলিস না।'

জরিনা করুণ চোখে তাকিয়ে বলল, 'সাহেব জানলে আমারে মাইরা ফেলাইবানে।'

রুমা জরিনার হাত ধরল, 'তুই দরজায় খেয়াল রাখ। আমি তাড়াতাড়ি আসছি।'

জরিনা বলল, 'যাও। ঘুইরা আসো।'

রুমা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল। ঘরের ছেলেগুলো ছিল না। জরিনা বাইরেটা দেখে এসে বলল, 'যাও, ফাঁকা আছে। দেরি করবা না কিন্তু। আমি দেখতাসি।'

রুমা ধীরেসুস্থে বেরোল। গলির বাইরে গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট কানাগলিতে পৌঁছল। বাজারের মুখে একজন অন্ধ ভিখারি দাঁড়িয়ে আছে। রীতিমতো চিৎকার করে ভিক্ষা করছে সে। রুমা তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'মেহমান এলে আমাকে নিয়ে যাবে না। ভাড়াটে নেবে বলছে।'

'সে কী? কী হবে?' চিৎকার করতে করতেই হঠাৎ চুপ করে ভিখারি ফিসফিস করে কথাগুলো বলল।

রুমা বলল, 'কী হবে জানি না। আমি খবরটা দেওয়ার, দিয়ে দিলাম। এভাবে বেরনো রিস্ক আছে। সাদিক জানতে পারলে মেরে দেবে।'

'ঠিক আছে। যাও।'

ভিখারি আবার চিৎকার করতে শুরু করল। রুমা চারদিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে গেল। জরিনা চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। রুমাকে ঢুকতে দেখে তার ধড়ে প্রাণ এল, 'শিগগিরি ঢুইকা যাও।'

রুমা ঘরে ঢুকে বোরখা খুলে বসল।

জরিনা বলল, 'ভালো লাগে না, কও?'

রুমা বলল, 'হ্যাঁ। ভালো লাগে।'

জরিনা বলল, 'আমি একদিন পালাইয়া যাব। আমারে যাইতেই হইব।'

রুমা জরিনার দিকে তাকাল। ঠিকই তো। মেয়েটা এই নরকে পচে মরবে কেন? সে ঘাড় নাড়ল, 'যাস। তোর যেদিন ইচ্ছে হবে পালিয়ে যাস।'

জরিনা বলল, 'সাহেবরে চেনো তুমি? খুইজা পাইলে কী করবে জানো?'

রুমা বলল, 'তোরে কিছু করবে না মনে হয়।'

জরিনা ঠান্ডা গলায় বলল, 'মদ খাইয়া আইসা মারে আমারে। তুমি কও কিছু করবে না। তুমি সাহেবরে চেনো নাই। তুমি নতুন না এখন? তাই কিছু কয় না। পুরান হইলে তোমারেও ছাড়বে না।'

রুমা শিউরে উঠল। তাকে ছাড়বে না? সাদিকের ভেতরেও কি তবে দিব্যেন্দু জেগে উঠবে? প্রতিটা পুরুষের মধ্যেই কি দিব্যেন্দু আছে? সব কিছু হাতের বাইরে চলে গেলেই সেই পুরুষ জেগে ওঠে বুঝি? সে বলল, 'ঠিক আছে। ভাবিস না। যখন হবে, তখন দেখা যাবে।'

জরিনা বলল, 'আমার খুব ঘোরার শখ জানো। আমার বন্ধু আছে সুপ্তা। ও ইন্ডিয়া গেছিল। কলকাতায়। খুব মজা করসিল। আমি কলকাতা যামু।'

রুমা বলল, 'যাবি। আমরা দুজনেই যামু।'

জরিনা রুমাকে জড়িয়ে ধরল হঠাৎ করে, 'তুমি খুব ভালো। আমার আম্মুর মতো।'

রুমা কেঁদে ফেলল। এ কান্নাটা অনেকদিন ধরে জমে ছিল। জরিনার এই জড়িয়ে ধরাটুকুর জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল...।

৬৫

তার কপাল ভালো লুকা সাঁতরা তাকে তাড়িয়ে দেয়নি। হাতে-পায়ে পড়ে সুখেন তার শাস্তিটা মকুব করিয়েছে।

এলাকায় লুকার আনাগোনা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। শমিতার ঘরে মাঝে মাঝে কাউকে না কাউকে নিয়ে আসে লুকা। সুখেন দূর থেকে দেখে আর বিড়ি ফোঁকে। লুকার ব্যাপারে যত দূরে থাকা যায়, তত

মঙ্গল।

সব বড় বড় লোক ওর হাতের মধ্যে। ক্ষমতা পেয়ে গেলে সাধারণ মানুষ অবধি নিজেকে কী না কী ভাবতে পারে। সেখানে লুকা সাঁতরা তো এখন একটা বিরাট ব্যাপার! খুব বড় একটা নাম। গত তিন বছর ধরে নিজের পুজোও শুরু করেছে লুকা। সব দলের লোক আসে। এহেন ক্ষমতা যার আছে তার কাছে কেউ যায়? পাগল নাকি?

রাত বারোটা। লুকা বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছে। সুখেন প্রথমে ভেবেছিল খেজুর করবে, পরক্ষণেই দাঁড়িয়ে গেছে। লুকা এখন আর উঠতি না। প্রতিষ্ঠিত প্রভাবশালী। তার মতো লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে শমিতার ঘর পাহারা দেবে, এর থেকে বড় ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

শহরটা ধীরে ধীরে কঠিন ঠাই হয়ে যাচ্ছে ভেবে সুখেন বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল।

হঠাৎ দেখল একটা জিপ গাড়ি এসে দাঁড়াল। একজন লম্বা ঝকঝকে চেহারার লোক, আরেকজন একটু মোটাসোটা কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত লোক লুকার দিকে এগিয়ে এল। সুখেন ধীর পায়ে লুকার গাড়ির পেছনে গিয়ে আড়ি পাতল।

একজন হিন্দিতে বলল, 'অবিনাশ কোথায় আছে?'

লুকা পাত্তা দিল না। উত্তর না দিয়ে সিগারেট খেতে লাগল।

তিন চার সেকেন্ডের ব্যাপার!

গোটা এলাকা, সুখেন এবং অবশ্যই লুকাকে চমকে দিয়ে একটা বিরাশি সিক্কার চড় এসে লুকার গালে পড়ল।

উত্তেজনায় সুখেন আর লুকিয়ে থাকতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে দেখল লুকা রাস্তায় রীতিমতো গড়াগড়ি খাচ্ছে। লম্বা লোকটা স্পষ্ট বাংলায় বলছে, 'বাপেরও বাপ থাকে জানিস তো? আমরা তোদের সে বাপ। প্রশ্ন করছি, আর উত্তর দিচ্ছিস না? এত সাহস হয় কী করে? মাথুর, বেল্ট খুলবে নাকি?'

মাথুর বলল, 'না, দাঁড়াও।'

মাথুর এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে বসে পড়ে রাস্তায় পড়ে থাকা লুকার কলার ধরল, 'উত্তরটা দে।'

খবর হয়ে গেছিল বস্তির মধ্যে। লুকার চ্যালারা কারো না কারো ঘরে ব্যস্ত ছিল। খবর হাওয়ায় পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগে না। পড়িমরি করে সব দৌড়ে এল। ফুলকো লুচি তাওয়া থেকে নামানোর পর ফুটো করার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যেমন নেতিয়ে যায়, সুখেন দেখল লুকা সেভাবে নেতিয়ে গেছে। দুজনের দিকে সভয়ে তাকাচ্ছে। তার চ্যালারা ছুটে আসতে গেছিল, সভয়ে লুকা তাদের হাত তুলে বাধা দিয়ে বলল, 'ভাগ শালা। কেউ আসবি না। যা যা, পালা।'

লুকার চ্যালারা বুঝতে পারছে না, লুকা এত ভয় পেয়ে গেছে কেন।

খান বলল, 'কী বে, বলবি অবিনাশ কোথায় আছে?'

লুকা উঠে বসল রাস্তার উপর। দু'কানে হাত দিয়ে বলল, 'বিশ্বাস করুন স্যার, আমি কোনও দোষ করিনি। আমি তো আমার কাজ করছি।'

খান লুকার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'অবিনাশ কোথায় আছে বল। বিকেল থেকে ঘুরছি। আর তো পারা যাচ্ছে না।'

লুকাও ফিসফিস করে বলল, 'ট্যাংরায় আছে স্যার। ফারুকের কাছে।'

মাথুর বললেন, 'আজ থাকবে তো?'

লুকা বলল, 'আমায় নিয়ে চলুন। আমি দেখছি। আপনারা গেলে পালাতে পারে। আমি বুঝেছি আপনারা কারা স্যার। আমায় নিয়ে চলুন।'

সুখেন ভালো করে লুকার প্যান্ট দেখল। প্যান্টেই ছোটটা হয়ে গেছে কি না বুঝতে পারল না। খান আর মাথুর লুকার কলার ধরে গাড়িতে তুলে মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে চলে গেল। লুকার গাড়ি, আধ খাওয়া সিগারেট...সবই রাস্তায় পড়ে রইল।

সুখেন সিগারেটটা তুলে জামায় মুছে আগুন ধরাল।

লুকার মূল চ্যালা পাতা হতভম্ব মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সুখেন তার কাছে গিয়ে দাঁত বের করল, 'চিরকাল শুনে এসেছি বাপেরও বাপ থাকে। আজ সত্যি নিজের চোখে দেখলাম রে ভাই।'

পাতা বলল, 'এরা কারা সুখেনদা?'

সুখেন সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'বুঝতে পারলি না?'

পাতা বলল, 'না।'

সুখেন ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'মাঝে মাঝে ভগাদা তার ভক্তদের ডাকে এক আধ দিন সাড়া দেয়। লজ্জাও তো আছে বল। সব সময় কি বড়দের দেখলে চলে? আজ হয়তো সেরকমই একটা দিন। ভগাদা চোখ তুলে চেয়েছে। দেখ, সেরকম হলে তোকেও নিয়ে যেতে পারে।'

সুখেনের কথায় ভীষণ ভয় পেয়ে পাতা তৎক্ষণাৎ সে জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেল...।

৬৬

কখনও কখনও এমন ঝড় আসে, আগে থেকে কোনও পূর্বাভাস থাকে না। সাইক্লোন না, বা বড় কোনও ঝড় না। হুট করে হওয়া এমন একটা কালবৈশাখী, যেটা সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। এমনই একটা ঝড় হল। রুমা আগে থেকে বুঝতেও পারেনি।

সন্ধেবেলা চুপ করে শুয়ে ছিল। জরিনা বাইরে গেছে। হঠাৎ দরজা খুলে ছেলেটা ঢুকল।

ছেলেটাকে রুমা দেখেছে এই ঘরে ঘোরাফেরা করে, নাম শুনেছে আনিস, কিন্তু কথা হয়নি।

দরজা যে বন্ধ করে রাখতে হয়, সেটা একবারেই খেয়াল ছিল না তার। ছেলেটা দরজা খুলে ঢুকেই বন্ধ করে দিল।

রুমা সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে বলল, 'এ কী? বাইর হও।'

ছেলেটা দাঁত বের করল, 'ওই দ্যাহ, খানকির আবার শরম।'

রুমা চিৎকার করল, 'বেরোও।'

বাইরে গান চলছে জোরে। ছেলেটা হেসে লুঙ্গি খুলে ফেলে ঝাঁপিয়ে এসে তাকে ধরল, 'তাড়াতাড়ি ছাইড়া দিমু নে।'

রুমা ঠ্যালা দিয়ে ছেলেটাকে ফেলে দিল। ছেলেটা প্রস্তুত ছিল না, ভেবেছিল রুমা বাধা দেবে না। খেপে গিয়ে জামার পকেট থেকে একগাদা টাকা বের করে রুমার মুখে ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'ল। টেকা ল।'

রুমা ছিটকিনি খুলে বাইরে চলে গেল। ছেলেটা ল্যাংটো অবস্থাতেই বাইরে গিয়ে রুমার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে যেতে লাগল, 'মাগীর শরম লাগে? খানকির শরম, চ তোর কেমন শরম দেখুম।' বারান্দা ফাঁকা দেখে নিয়ে রুমা খুব আলতো করে ছেলেটার হাত ধরে ঘুরিয়ে ফুট তিনেক দূরে ছিটকে ফেলে দিল। ছেলেটা বারান্দায় গিয়ে পড়ল। কয়েক সেকেন্ড তার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল। রুমা বলল, 'ভাল্লাগসে?'

আনিস রাগে উন্মাদ হয়ে গেল। দ্বিগুণ বেগে পাগলা ষাঁড়ের মতো ছুটে এল রুমার দিকে। রুমা আনিসের মাথাটা ধরে সজোরে দেওয়ালে ঠুকে দিল।

মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেল আনিস, 'তোরে আমি দেইখা নিমু।'

ক্রমাগত তড়পাতে শুরু করল ছেলেটা।

রুমা সায়া থেকে একটা ছোট ছুরি বের করে আনিসের গলায় আড়াআড়ি চালিয়ে দিল।

আনিস একবারেই প্রস্তুত ছিল না। গলায় হাত দিয়ে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে শুরু করল সে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার দেহটা প্রাণহীন হয়ে গেল। রুমা পুরোটা দেখলোও না। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ছুরিটা লুকিয়ে ফেলল। উল্টোদিকের ঘর থেকে একটা মেয়ে বেরোল। আনিসকে পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করা শুরু করল।

চিৎকার শুনে বাইরে বেরিয়ে রুমাও কাঁদতে শুরু করল। অন্য ছেলেগুলো বাইরে ছিল। তারা চিৎকার শুনে ভেতরে ঢুকে আনিসকে পড়ে থাকতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। রুমা আতঙ্কিত মুখে বলল, 'সাহেবরে ফোন দাও। এইডা কী কইরা হইল?'

ছেলেগুলো হতচকিত হয়ে গেছে। যে মেয়েটা কাঁদছিল, তার মুখে হাত দিয়ে তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। একটা ছেলে হাত তুলে রুমাকে বলল, 'ঢুইকা যান। সাহেবরে বলতাসি। একদম চিল্লাইবেন না। এখানে পুলিশ আইলে হইব না। সাহেব আসুক, যা হইবে দেখা যাইব।'

সাদিককে ফোন করা হল। সাদিক কাছেই ছিল। চলে এল। হতভম্ব হয়ে আনিসকে পড়ে থাকতে দেখে জিগ্যেস করল, 'কে করেছে?'

একটা ছেলে জানাল আনিস তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ভেতরে গেছিল। তারপর কী হয়েছে কেউ জানেন না। সাদিক সন্দিগ্ধ গলায় বলল, 'তোরা জুয়া খেলছস, তারপর তোরাই ওরে মারছস। ভাবছস আমি বুঝি নাই, তাই না?'

'না বস। আমরা মারি নাই। খোদার কসম লাগে।'

সাদিক বলল, 'কিলিয়ার কর। ফেলায় আয় বডি। আমার আর কিছু জানার দরকার নাই। জ্বালাইবি না আমারে আর।'

রুমার দরজায় নক করল সাদিক।

রুমা দরজা খুলল। সে আগেই আনিসের দেওয়া টাকা লুকিয়ে ঘর পরিষ্কার করে ফেলেছিল। সাদিকের দিকে তাকিয়ে ভীত গলায় বলল, 'এসব কী হইল?'

সাদিক দরজা বন্ধ করে বলল, 'এখানে এই তো হয় জান। তোমার চিন্তার কিছু নাই। আমি আছি তো।'

রুমা সাদিকের বুকে মাথা দিয়ে প্রবল ভাবে কাঁদতে শুরু করল, 'আমার খুব ডর লাগতাছে।'

সাদিক রুমার কাপড় খুলতে শুরু করল। আদুরে গলায় বলল, 'ডর কী তোমার? আমি তো আছি। খানকির পোলারা নিজেরা নিজেরা খুনাখুনি কইরাই মরবে। এর আগেও এরা একটারে মারসে জুয়ার আসরে। তোমার চিন্তা নাই। তুমি আসো।'

রুমা শুয়ে পড়ল খাটে। সাদিককে শরীরে নেবার পালা শুরু হল...।

৬৭

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। খান জানলার বাইরে তাকিয়ে বললেন, 'অবিনাশের ফোনটা তুই ইউজ করছিস কেন?'

লুকা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমি কী করে জানবো বলুন তো ও কোথায় কী করে এসেছে? আমাকে ফোনটা দিয়ে বলেছিল ইউজ কর। দুবাই থেকে এনেছি।'

খান বললেন, 'দুবাই থেকে এনেছে? ওকে। গুড ইনপুট। এখানে কী চলছে?'

লুকা বলল, 'সেটা স্যার আপনারা অবিনাশকেই জিগ্যেস করে নিন।'

মাথুর বললেন, 'কেন? তোর কি কথা বলতে প্রবলেম আছে?'

লুকা বলল, 'স্যার আপনারা তো জানেন এই কাজগুলো আমি কারো নির্দেশে করি। নিজে থেকে কিছু করি না। আমরা ট্যাংরা এসে গেছি।'

মাথুর বললেন, 'একটু এদিক ওদিক দেখি। তারপর দেখছি তোদের এই ব্যবসার লালবাতি কীভাবে জ্বালাতে হয়। চল। অবিনাশকে ফোন কর।'

খান গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন। লুকা অবিনাশকে ফোন করল।

কথা বলে ফোন রেখে বলল, 'চলুন। নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে স্যার ছেড়ে দেবেন প্লিজ।'

খান বললেন, 'চল। তারপর দেখছি।'

ঘুপচি একটা ঘর। বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। লুকা চাবি খুলে দিল।

দরজা খুলে দেখা গেল অবিনাশ খাটে শুয়ে ফোনে গেম খেলছিল। সে ভাবতেই পারেনি দুজনে চলে আসবে। অবিনাশ পালালো না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

খান লুকার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাইরে অপেক্ষা কর।'

লুকা বাইরে চলে গেল।

খান ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে চেয়ার টেনে বসে বলল, 'খাটে বোস।'

অবিনাশ খাটে বসল। মাথুর আরেকটা চেয়ার টেনে বসলেন।

খান বললেন, 'কী হয়েছে তোর? ফোন লুকিয়ে রাখতে হচ্ছে, কোনও রিপোর্ট করছিস না, আমরা কিছুই জানতে পারছি না, কী হয়েছে ঠিক?'

অবিনাশ মাথা নিচু করে বসে ছিল। মাথুর বললেন, 'চড়-চাপড় মারতে হবে কথা বলানোর জন্য?'

অবিনাশ ফ্যাকাসে মুখে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোড সেভেন।'

খান আর মাথুর দুজনেই চমকে উঠলেন। খান বললেন, 'সিরিয়াসলি?'

অবিনাশ বলল, 'হ্যাঁ স্যার। আমার কিছু করার নেই। যা ইন্সট্রাকশন আছে, সেভাবেই চলতে হচ্ছে।'

খান মাথুরের দিকে তাকালেন। মাথুর বললেন, 'আমাদের কাছে এ ব্যাপারে কোনও মেসেজ আসেনি। আমরা কী করে বুঝব, তুই সত্যি কথা বলছিস?'

অবিনাশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে পকেট থেকে একটা ছেঁড়া পাঁচশো টাকার নোট এগিয়ে দিল। খান নোটটা নিয়ে ভালো করে দেখে মাথুরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন।

মাথুর উঠে দাঁড়ালেন, 'তাহলে তো আমাদের আর কিছু করার নেই।'

খান বললেন, 'খামোখা এতটা পথ এলাম। আগে জানতে পারলে কলকাতা আসতে হতো না।'

অবিনাশ বললেন, 'স্যার, আমাকে কি আর...'

খান বললেন, 'আমরা তোকে আর কিছু বলব না। চল, তুই যেভাবে কাজ করছিস, করে যা।'

দুজনে অবিনাশের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে লুকা উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। খান বললেন, 'তুই নিজের ব্যবস্থা করে নে ফেরার, আমাদের কাজ হয়ে গেছে।'

লুকা ঘাড় নাড়ল, 'ঠিক আছে স্যার।'

দুজনেই গাড়িতে উঠে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। খানিকক্ষণ যাওয়ার পর খান ড্রাইভারকে বললেন, 'আপনি গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসুন। আমাদের কথা আছে কিছু।'

ড্রাইভার তাই করল। গাড়ি ফাঁকা হতে খান বললেন, 'কোড সেভেন কলকাতায় অ্যাক্টিভেট হল আর তুষার স্যার জানেন না, এটা হতে পারে?'

মাথুর বললেন, 'হতে পারে। একটা আলোচনা চলছিল। বাংলাদেশ আর পাকিস্তান টেরিটরি আলাদা আলাদা দুটো এজেন্সি দেখবে। প্যারালাল অর্গানাইজেশন শুরু হয়েছে। বাধ্যতামূলক নয় যে আমাদের জানতেই হবে। ফোন কর।'

খান মাথা নাড়লেন, 'করছি। রাত দুটো বাজলেও কিছু করার নেই। জানিয়ে রাখি।'

ফোন করলেন খান। তুষার ঘুমন্ত গলায় ফোন ধরে বললেন, 'বলো।'

খান বললেন, 'কোড সেভেন অ্যাক্টিভেট হয়েছে স্যার। আমরা জানতাম না। আপনিও হয়তো জানতেন না।'

তুষার বললেন, 'আধ ঘণ্টা আগে জেনেছি। মিনিস্ট্রির অ্যাপ্রুভালও এসে গেছিল। আমাদের প্যারালাল অর্গানাইজেশন যারা ওদের মতো করে বাংলাদেশে কাজ করবে, আর আমরা তার অনেক কিছুই জানতে পারব না। হতে পারে বাংলাদেশে এখন যা হচ্ছে, সেটা ওরা জানে, আমরা জানি না। আমাদের জানার প্রয়োজন আছে নাকি সেটাও দেখতে হবে।'

খান কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, 'তাহলে কি আমাদের টেরিটরি ভাগ হয়ে গেল স্যার? আমাদের আর বাংলাদেশ দেখতে হবে না?'

তুষার বললেন, 'লিটারালি তাই দাঁড়ায়। তোমরা ফিরে এসো। কাল অফিসে কথা হচ্ছে। গুড নাইট।'

ফোন কেটে গেল।

খান চিন্তিত গলায় বললেন, 'বাংলাদেশে তাহলে কারা অপারেট করছে, কী করছে, এর কিছুই আর আমরা জানতে পারব না। বুঝলে?'

মাথুর বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'এত ছুটোছুটিতে আমার আর এবার কলকাতার বিরিয়ানি খাওয়া হল না। বাদ দাও, চলো, ফিরি।'

খান জানলা থেকে গলা বের করে ড্রাইভারকে ডাকলেন, 'চলে আসুন। এয়ারপোর্ট।'

গাড়ি এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিল...।

প্লট ২। অপারেশন ট্রেইটর



একবছর আগের একদিন

নতুন দিল্লি। রাত বারোটা। পালিকা বাজার পেরিয়ে লোকটা খানিকটা হেঁটে একটা গলির ভেতর প্রবেশ করল।

খানিকটা হাঁটার পর গলির শেষে একটা ছোট দরজা। লোকটা দরজা খুলে একটা নেমে যাওয়া সিঁড়ি দেখতে পেল। অভ্যস্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। লোকটা খানিকটা উত্তেজিত। বেশি উত্তেজিত হলে তার চোখ পিটপিট করে। এখন সেরকমই একটা কিছু হচ্ছিল তার মধ্যে। হাঁটছে বটে, একইসঙ্গে চোখ পিটপিটও করে যাচ্ছে।

ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে সিঁড়িটা নেমেছে। সেখানেই চারজন বসে আছে। তাকে দেখে একজন বলে উঠল, 'পাঁচ মিনিট লেট স্যার।'

লোকটা বলল, 'মাঝে মাঝে সব কাজ ভুলে রাতের শহরটা দেখতে হয়। এত মেকানিকাল আমি হয়ে যাইনি।'

'আপনি ভালো মুডে আছেন উস্তাদ। খবরটা ভালোই মনে হচ্ছে। তাই না?'

লোকটা বলল, 'মন্ত্রীসাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে বোঝালাম বাংলাদেশে কেন আমার ফুল কন্ট্রোল চাই। আমি আমার মতো করে কাজ করব। আই এস আই যেভাবে কাজ করবে, আমাদের সেটার সঠিক কাউন্টার করতে হবে। মিনিস্ট্রি আমাদের অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিয়েছে। ঢাকায় আমরা যেভাবে খুশি অপারেট করতে পারব। কাউকে কিছু জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এবার আমরা আমাদের মতো কাজ শুরু করতে পারি।'

ঘরের বাকি চারজন উল্লাস করে উঠল। লোকটা একটু হাসল, 'উল্লাসের সময় নেই। কাজ শুরু করতে হবে। এজেন্ট রেডকে অ্যাক্টিভেট কর। সেন্ড হিম সিগন্যাল।'

একজন চমকে উঠল, 'রেড? ওকে তো কোনও রকম কাজে না নেওয়ার নির্দেশ আছে স্যার।'

লোকটা বিরক্ত গলায় বলল, 'ছিল। এখন নেই। এখন আমি যা বলব তাই হবে। বললাম তো, আমি বুঝে নেব। বাকিটা পরে দেখা যাবে।'

'ওকে স্যার।'

এতক্ষণে যেন লোকটা ঠান্ডা হল। চোখ পিটপিটানিও বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের বাকিরা সেটা বুঝলেও সে ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করল না। পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখল শুধু। লোকটাকে অত কথা বলার সাহস তাদের নেই...

১

শেয়ালদা নেমে রাণা ক্যাব নিল। সেরকমই নির্দেশ ছিল। ভি আই পি রোডে ম্যাপ অন করে দিল। তার বরাবরই মাথা ঠান্ডা। যে ধরনের কাজ সে করে, তাতে মাথা ঠান্ডা রাখতেই হয়।

রাস্তাঘাটে জ্যাম। এই জন্য রাণার কলকাতা পছন্দ হয় না। তার মসৃণ রাস্তা পছন্দ। যাতায়াত হতে হবে নিশ্চিন্তের। যে রাস্তায় বাধা আসবে, তার সে রাস্তা পছন্দ নয়। বিরক্ত মুখে বসে রইল রাণা। ক্যাব ড্রাইভার বক বক করতে আর পানের পিক ফেলতে ভালোবাসে। রাণার সঙ্গে কিছুক্ষণ বক বক করার চেষ্টা করে বুঝল রাণা কথা বলতে উৎসাহী নয়। তখন সে তার বন্ধুস্থানীয় একজনকে ফোন করে বক বক শুরু করে দিল।

লোকেশনে পৌঁছে রাণা ক্যাব ছেড়ে দিল। পরপর চারটে আঠেরো তলা বিল্ডিং। এ, বি, সি আর ডি। চারটে বিল্ডিং। রাণা মোবাইল খুলে আরেকবার ঠিকানা দেখে নিল। সি বিল্ডিং চারশো তেরো নাম্বার রুম। নিজের মনেই সে একবার বলে নিল, 'ওকে। চাপ নেই।'

সিকিউরিটি গেটে আটকাল। রাণা আই কার্ড দিয়ে নাম নথিভুক্ত করল। এই বিল্ডিং-এর এগারোতলায় রুবেল পাল নামে একজনের ফ্ল্যাটে যাবে লিখল। তেমনই নির্দেশ আছে। রাণাকে বলা হয়েছে, রুবেল পাল গত তিন মাস ধরে এই বিল্ডিং-এ ভাড়া নিয়ে আছে। অসুবিধে হবার কথা নয়।

সিকিউরিটি রুবেল পালকে ফোন করে জিগ্যেস করল, রাণাকে যেতে দেবে নাকি। রুবেল হ্যাঁ বলতেই সিকিউরিটি রাণাকে এন্ট্রি দিয়ে দিল।

লিফটে উঠে রাণা মাস্ক পরে নিল। মাস্ক না পরলেও হয়। কাজটা করে সে আট ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশে ঢুকে যাবে, আগামী এক বছর তার আসার কোনও প্রয়োজন নেই, তবু পরল। একটা পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়ে তার মা উঠল ফার্স্ট ফ্লোরে। বাচ্চাটা রাণাকে দেখে হাসল। রাণা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লিফট চার নম্বরে দাঁড়াতেই রাণা লিফট থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল। বলা আছে লিফট থেকে নেমে ডান দিকে যেতে হবে। রাণা তাই গেল।

ঠিক বলা হয়েছিল। ডানদিকে প্রথম ফ্ল্যাটটাই চারশো বারো, তারপর আরেকটু যেতেই চারশো তেরো পেয়ে গেল।

এসব সময়ে রাণার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় না। আগে হলে বাড়ত। আজকাল বাড়ে না। এই জন্যই তার ডিমান্ড এত বেশি। হালকা একটা শ্বাস ফেলে রাণা কলিং বেল টিপল।

সেকেন্ড ত্রিশেক পরে দরজাটা খুলে গেল। কিন্তু কেউ বেরোল না। রাণা সতর্ক হয়ে দরজা ঠেলল। ঘরে ঢুকতেই দেখল মেঝেতে একটা লাশ পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘরটা।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

রাণা চমকে পাশে তাকিয়ে দেখল তার দিকে একটা রিভলভার উদ্যত হয়ে আছে। সে ঘাবড়ে গেল না। এটা প্রত্যাশিত ছিল। দরজা খোলা থাকার অর্থ আগে থেকে কেউ এসে গেছিল। সে লোকটার কথা অনুযায়ী দরজা বন্ধ করে দিল।

'বোস।'

রাণা সোফায় বসল। লোকটা তার থেকে একটু দূরে একটা চেয়ার নিয়ে বসল। ছ'ফুট দু'তিন ইঞ্চি লম্বা হবে। টানটান চেহারা। বয়স পঞ্চাশের বেশিই হবে। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। লোকটা পায়ের উপর পা তুলে বলল, 'কত টাকা দিচ্ছে তোমায় এই অ্যাসাইনমেন্টটায়?'

রাণা বলল, 'তিন লাখ।'

লোকটা মুখে চুকচুক শব্দ করে বলল, 'এটাই এখানকার সমস্যা। এরা খুব কম টাকা দেয়।'

রাণা বলল, 'আপনি কোথাকার?'

লোকটা বলল, 'আমি এখন পাটায়া থাকি। এই যে, মেঝেয় পড়ে আছে হুসেন, আমার বহুদিনের টার্গেট ছিল। ওর জন্যই আমি এ দেশে এসেছিলাম। শুনলাম কী সব পেটি গ্যাংওয়ারে জড়িয়ে পড়েছিল। এর অপোজিট টিম তোমাকে পাঠিয়েছে। ওরা জানেই না হুসেন আসলে কী মাল।'

লোকটা জোরে হেসে উঠল। রাণা বলল, 'কী মাল?'

লোকটা বলল, 'ভালো দাম পেলে এরা বাপকেও বেচে দেয়। দেশ-টেশের সেন্টিমেন্ট এদের একবারেই নেই। হুসেনকে মারলে তোমার পুণ্যই হতো। তোমার কপাল খারাপ, ওকে আমি মারলাম।'

রাণা বলল, 'আপনি কী করে জানলেন আমি আসব?'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'তুমি বুদ্ধিমান। তোমার হবে। রাণা দাস, বাবার নাম পরাগ দাস, আদি বাড়ি ত্রিপুরায়, এ রাজ্যে ২০০২-এ বাবার সঙ্গে চলে আসা, তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেও বেকার, তারপর হঠাৎই অপরাধজগতে প্রবেশ। এখন অবধি তেরোটা নিখুঁত অপারেশন করেছ। গুড, ভেরি গুড।'

রাণা অবাক হল। প্রাণপণে সেটা ঢাকার চেষ্টা করে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি এগুলো জেনে গেলেন কী করে?'

লোকটা মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব এনে বলল, 'ওসব হয়ে যায়। আমায় সব খোঁজখবর রাখতে হয়। যাক গে, তোমায় টাকা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। তোমার অ্যাকাউন্টে আমি অলরেডি তিন লাখ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমাকে যারা রিক্রুট করেছিল, তাদের কেউ তোমাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করবে না।'

রাণা বলল, 'যে কাজ আমি করিনি, সে কাজের টাকা আমি নিই না।'

লোকটা হাসল, 'গুড বয়। আমি জানি তোমার এই ব্যাপারটা আছে। এই যে মাটিতে পড়ে আছে লোকটা, যাকে আমি আমার রিভলভার দিয়ে পরপর পাঁচটা গুলি করেছি, ওর এসব ছিল না। কলকাতায় বসে আই এস আইকে ইনফরমেশন দিয়ে যাচ্ছিল। তুমি জানো তো হোয়াট ইজ আই এস আই?'

রাণা বলল, 'পাকিস্তানের ইন্টেলিজেন্স। না জানার কিছু নেই।'

লোকটা বলল, 'গুড। এই জন্য এই লাইনে শিক্ষিত ছেলে দরকার। শিক্ষিত না হলে এই লাইনে নামাই উচিত না। যত আজে বাজে পাবলিকে চারদিক ভরে গেছে।'

রাণা উঠল, 'আমি এবার যাই। এখানে বসে থেকে কী করব?'

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে রাণার দিকে রিভলভার তাক করল, 'উহুহু, এ ভুল কোরো না। আমি না বললে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে যেও না। কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে সেটা আমার ভাল্লাগবে না। তুমি যে কলেজে গ্র্যাজুয়েশন করছ বাবা, সে কলেজের আমি মালিক। আমি না বললে তুমি এ ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোবে না। ইন ফ্যাক্ট বেরোনোর কথাই ভাববে না।'

রাণা বিনা বাক্যব্যয়ে বসে পড়ল। লোকটা বলল, 'তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে রাণা। এতগুলো খুন করেছ, অথচ তোমার রেকর্ড ক্লিয়ার। ভেরি ইম্প্রেসিভ। ভেরি মাচ ইম্প্রেসিভ। আমি অনেক দেখেশুনে তোমাকে রিক্রুট করার কথা ভেবেছি।'

রাণা বলল, 'ওরকম হলে আমি অনেক আগেই কোথাও না কোথাও ঢুকে যেতাম। আমি ওভাবে কাজ করি না।'

লোকটা বলল, 'আহ্...তুমি কী করে ভেবে নিচ্ছো আমি তোমার মতামত জানতে চাইছি? চাইছি না। আমি বলছি আমি ঠিক করেছি আমি তোমাকে রিক্রুট করব। ব্যস। তোমার হাতে আর কোনও অপশন নেই। তোমার বাবা নেই, ফ্যামিলি নেই, বিয়ে করোনি, এর থেকে ভালো আর কিছু হতেই পারে না।'

রাণা উঠে দাঁড়াল, 'আপনি আমাকে গুলি করতে চাইলে করে দিন। কিন্তু এসব কাজ আমি করি না। আমি আমার নিজের মর্জিতে চলি।'

লোকটা বলল, 'সে চলো। তোমাকে যেখানে পাঠানো হবে, তুমি নিজের মর্জিতেই চলবে। তবে যাবার আগে জেনে যাও, এ কাজটা তোমাকে দেশের জন্য করতে হতো। আজে বাজে কাজ না। ফর দ্য কান্ট্রি। কাল তুমি কী করবে তুমি কি জানো? এই যে টাকাগুলো পাও, এদিক সেদিক খরচ করে আসো, এসব করে কী লাভ হবে তোমার? এই পৃথিবীতে এভাবে উদ্দেশ্যহীনভাবে বেঁচে থেকে কি আদৌ কোনও লাভ আছে? তোমার মনে হয় না, দেশের জন্য তুমি কিছু করতে পারতে?'

রাণা ভ্রু কুঁচকে বলল, 'দেশের জন্য?'

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, দেশের জন্য। করবে?'

রাণা বলল, 'কী কাজ? কত টাকা পাবো?'

লোকটা বলল, 'তুমি রাজি?'

রাণা বলল, 'আমি জানি না। আমি কাজের ডিটেলসটা চাইছি।'

লোকটা কয়েক সেকেন্ড রাণার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। তুমি বেরিয়ে যাও এখন। রাত আটটার সময় নিকো পার্ক বাস স্ট্যান্ডে চলে এসো।'

রাণা বলল, 'আর যদি না যাই?'

লোকটা ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বলল, 'এসব বাজে প্রশ্ন করার মতো বোকা তো তুমি নও। এতক্ষণে তোমার বোঝা উচিত ছিল আমি কী ধরনের লোক। বোঝোনি?'

রাণা লোকটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, 'বেরোলাম।'

লোকটা হাসিমুখেই বলল, 'আমি খুব পাংচুয়াল। দেরি কোরো না। আমাকে যেন তোমাকে খুঁজে না আনতে হয়। বয়স হচ্ছে। এখন ওসব ঝক্কিতে যেতে চাই না।'

২

সন্ধে সাতটা বাজে। ট্যাক্সিতে চুপ করে বসে ছিল রাণা। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে।

ট্যাক্সিওয়ালা অধৈর্য হয়ে বলল, 'দাদা আমাকে ছেড়ে দিন না! কেন শুধু শুধু বসিয়ে রেখেছেন?'

রাণা ঘড়ি দেখে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আমাকে নিকো পার্কের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যান।'

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'ওদিকে যাব না। আগে বলবেন তো! নেমে যান।'

রাণা বলল, 'নো রিফিউজাল ট্যাক্সি। আমাকে বোকা পেয়েছিস? চুপচাপ চল, নইলে তোর কপালে দুঃখ আছে।'

ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সি থেকে নেমে গিয়ে রাণার দিকের দরজা খুলে বলল, 'নাম, নাম বলছি।'

রাণা রিভলভার বের করে ট্যাক্সিওয়ালাকে দেখাল, 'তুই আমাকে চিনিস না, আমিও তোকে চিনি না। তুই জানিস না ঠিক এই জায়গায় আমি এটা চালিয়ে দিয়ে চুপ চাপ গা ঢাকা দিয়ে দিতে পারি। যেখানে যেতে বলছি, চল। নইলে তোর কপালে দুঃখ আছে। সেকেন্ডবার বললাম। আর বলব না।'

ট্যাক্সিওয়ালা সুড়সুড় করে ট্যাক্সিতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিল।

রাণা সিগারেট ধরিয়ে ব্যাঙ্কের অ্যাপ খুলল। লোকটা তিন লাখ বলেছিল, অ্যাকাউন্টে চার লাখ টাকা ঢুকেছে। ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ অ্যাকাউন্ট ব্যাল্যান্সের দিকে তাকিয়ে রইল সে। ট্যাক্সিওয়ালা একটা সিগনালে গাড়ি দাঁড় করিয়েই দরজা খুলে দৌড়ল। একজন পুলিশের সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে। রাণা নামল না। চুপ করে সিগারেট টেনে যেতে লাগল। পুলিশটা ভ্রু কুঁচকে গাড়ির দিকে এগিয়ে এসে তাকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলল। রাণা নামল।

পুলিশ অফিসার বলল, 'আর্মসটা দেখি।'

রাণা পকেট থেকে রিভলভার বের করে বলল, 'খেলনা রিভলভার স্যার। ভাইপোর জন্য নিয়ে যাচ্ছি।'

পুলিশ অফিসার বলল, 'এটা দিয়ে আপনি ভয় দেখাচ্ছিলেন ওকে?'

রাণা বলল, 'কী করব স্যার? নো রিফিউসাল লেখা, অথচ যাবে না বলছে। কোথাও কিছু পাওয়া যায় না, মাথা এমন গরম হয়ে গেছিল যে ওকে এটা দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছি।'

ট্যাক্সিওয়ালা তাকে মারতে চলে এল। পুলিশ অফিসার তাকে ধমকে সরিয়ে দিল। বলল, 'এটা যে আপনি করলেন, আপনার জেল হতে পারে জানেন?'

রাণা বলল, 'দরকারের সময় এরা যে রিফিউজ করে দেয়, তাতে এদের কি কিছু হবে না স্যার? আমার জরুরি দরকার ছিল অথচ আধঘণ্টা ধরে একটা ক্যাব বা ট্যাক্সি কিচ্ছু পাচ্ছি না। আমি কী করতাম?'

ট্যাক্সিচালক লাফঝাঁপ করছিল, 'আমি তোকে কিছুতেই নেবো না। তুই যেখানে খুশি গিয়ে মর। আমি নেই।'

পুলিশ অফিসার রাণাকে বলল, 'শুনুন, আপনি অন্য কোনভাবে চলে যান। ও মনে হয় না আপনাকে আর নেবে।'

রাণা বলল, 'আমাকে নিকো পার্কে পৌঁছতেই হবে। আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন তবে?'

অফিসার বলল, 'হ্যাঁ। আমাদের গাড়ি ওদিকেই যাবে। আপনাকে নামিয়ে দিচ্ছি। চলুন। ওকে আপনি ছেড়ে দিন।'

রাণা বলল, 'ঠিক আছে। কত হয়েছে?'

রাণা ট্যাক্সিচালকের দিকে তাকাল। ট্যাক্সিচালক বলল, 'লাগবে না তোর টাকা, যা এখান থেকে।'

রাণা একটা পাঁচশো টাকার নোট পকেট থেকে বের করে ট্যাক্সিচালকের দিকে ছুড়ে মারল। নোটটা রাস্তায় পড়ে গেল।

রাণা বলল, 'ভাড়াটা। নিয়ে নিন।'

ট্যাক্সিচালক ঝুঁকে টাকাটা নিল। পুলিশ অফিসার বলল, 'চলুন।'

রাণা পুলিশের জিপে উঠল। অফিসার গাড়িতে উঠে হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি যা তা লোক মশাই। খেলনা রিভলভার নিয়ে ঘুরছেন?'

রাণা বলল, 'খেলনা কিনেছিলাম। এভাবে কাজে লেগে যাবে বুঝিনি।'

অফিসার বলল, 'সত্যি, কতরকমের লোক যে ঘুরে বেড়ায়। আপনার কথা আমার বহুদিন মনে থাকবে।'

নিকো পার্কের সামনের বাস স্ট্যান্ডে সাড়ে সাতটায় নামল রাণা। পুলিশের জিপটা বেরিয়ে গেল।

রাণা সিগারেট ধরাল। ফোন বাজছে। ধীরাজ শর্মা ফোন করেছে।

রাণা ধরল, 'হ্যাঁ।'

ধীরাজ বলল, 'কীরে, কাজটা করার পর জানালি না তো? টিভি দেখে জানতে হচ্ছে। তোর টাকা লাগবে না?'

রাণা বলল, 'না। টাকা পেয়ে গেছি।'

ধীরাজ অবাক হয়ে বলল, 'মানে? কে টাকা দিয়েছে তোকে?'

রাণা বলল, 'ও আছে। আপনি জেনে কী করবেন?'

ধীরাজ বলল, 'কী বলছিস তুই? আমি তোকে এত কাজ দিয়েছি, তুই এখন আমাকে গরম নিচ্ছিস?'

রাণা বলল, 'ফ্যামিলি রিলেশন তো নেই ধীরাজ ভাই। কাজ বলেন, কাজ করি। এখানে গরম ঠান্ডার কী আছে?'

ও-প্রান্ত খানিকটা চুপ করে গেল। তারপর বলল, 'পুলিশে সব দিয়ে দেব। তখন বুঝবি! বেশি বেড়ে গেছিস তুই। তোর ডানা ছাটার টাইম হয়ে গেল।'

রাণা 'বেস্ট অফ লাক', বলে ফোন কেটে দিল। ধীরাজ রেগেমেগে আবার ফোন করা শুরু করেছে। রাণা পাত্তা দিল না। ফোন কেটে দিল।

ঠিক রাত আটটায় বাস স্ট্যান্ডের সামনে একটা এস ইউ ভি এসে দাঁড়াল। একটা কাচ নেমে গেল। ড্রাইভিং সিটে রাণা সকালের লোকটাকে দেখতে পেল। সে গাড়িতে উঠে লোকটার পাশে বসল। গাড়ি স্টার্ট নিল।

লোকটা বলল, 'ধীরাজকে রাগিয়ে দিলে? পরে ওকে দরকার হতে পারে।'

রাণা অবাক হয়েও সামলে নিল। তার কল শুনছিল লোকটা। তবে সকালেই মনে হয়েছিল এর অনেক ক্ষমতা আছে। অবাক হবার কিছু হয়নি। সে বলল, 'আমায় কী করতে হবে বলুন।'

লোকটা গাড়ির এসির তাপমাত্রা কমিয়ে দিল, হিমশীতল হয়ে গেল গাড়ির ভেতরটা। বলল, 'এত কথা জেনে কী করবে তুমি রাণা? কোনও পিছুটান নেই, টাকার চিন্তা করতে হবে না, একটা সুযোগ পেয়েছো জীবনটাকে পাল্টে ফেলার, এত প্রশ্ন করে কী লাভ হচ্ছে?'

রাণা বলল, 'আমার ধোঁয়াশায় থাকতে পছন্দ হয় না। আমি সবটা জানতে চাই। কী কাজ, কোন ধরনের রিস্ক জড়িয়ে আছে তাতে, সব জানতে চাই।'

লোকটা গাড়ির মিউজিক বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'গান শোন আপাতত। বলছি।'

রাণা চুপ করে গেল। এখন বলতে চাইছে না যখন, তখন খুঁচিয়ে লাভ নেই। কিছুক্ষণ পর একটা শপিং মলের পার্কিং স্পেসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে লোকটা বলল, 'একটা খুন করতে হবে। গুলি করবে, চলে আসবে।'

রাণার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল, 'সেই একই কাজ। আগে বললেই হতো।'

লোকটা বলল, 'ঢাকায়।'

রাণা বলল, 'ইম্পসিবল। ও দেশে আমি কিছু করি না। আপনি ও দেশের কাউকে ধরুন।'

লোকটা বলল, 'কাজটা আমাদের করতে হবে। আমাদের এজেন্সিকে। তুমি ছাড়া আমার হাতে এই মুহূর্তে আর কেউ নেই।'

রাণা বলল, 'আমি ছাড়া? সকালে আমাকে পেলেন, বিকেলে আমি আপনার এজেন্সির লোক হয়ে গেলাম?'

লোকটা হাসল, 'সাত মাস আগে ভুবনেশ্বরে হোটেল লিস্টারে তুমি তারেককে উড়িয়েছিলে। তখন থেকে তোমার উপরে আমার নজর আছে। আমাদের পুলিশ তোমার ডিটেলস অনেক আগেই আমার কাছে পাঠিয়েছিল। আমি চাইলে অনেক দিন আগেই তুমি শ্রীঘরে থাকতে। শুধু আমি চাইনি বলে হয়নি। আর কিছু জানতে চাও?'

রাণা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। ওই হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ আমি নষ্ট করে দিয়েছিলাম।'

লোকটা তার ফোন বের করে একটা ভিডিও চালিয়ে দিল। রাণা দেখল লিস্টারের রুমে ঢুকতে তাকে দেখা যাচ্ছে। লোকটা বলল, 'ব্যাক আপ ফুটেজটা ওড়াতে পারনি। ব্যাড লাক। সে ঠিক আছে, তুমি কাজটা না করতে চাইলে কোরো না, আমি তোমাকে ফাঁসাব না, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে সাজেশন দেব এটা তোমার খুব ভালো কাম ব্যাক হতে পারে। তুমি যে কাজ করো, যে-কোনওদিন তোমাকে পুলিশ কুকুরের মতো গুলি করে মারবে। তার পরিবর্তে তুমি একটা সম্মানজনক পুনর্বাসন পেতে পারো। ডোন্ট মিস দিস চান্স রাণা।'

রাণা শ্বাস ছাড়ল। বলল, 'ডিটেলস দিন।'

লোকটা বলল, 'গুড বয়। তোমাকে একজনকে সরাতে হবে। আমাদের নিজেদের লোক।'

রাণা বলল, 'নিজেদের লোককে সরাতে হবে, সেজন্য আমাকে রিক্রুট করছেন? কেন? আপনারা করছেন না কেন?'

লোকটা বলল, 'আমি কাউকে বিশ্বাস করছি না বলে। আমি শুধু তোমাকে বিশ্বাস করছি।'

রাণা বলল, 'বুঝলাম। আপনি নিশ্চিত, আমাকে কাল কেউ পাঁচ লাখ টাকা দিলে আমি অন্য দিকে চলে যাব না?'

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত তুমি যাবে না। তুমি অনেকটা সিনেমার নায়কের মতো। যে কাজ একবার করবে বলে ঠিক করে নাও, সেটা করেই ছাড়ো। এছাড়া তুমি খুনি হতে পারো, দেশকে ভালোবাসো। জাতীয় সংগীত বাজলে উঠে দাঁড়াও।'

রাণা বলল, 'সেটা ছোটবেলার অভ্যেস। ওসব আমি আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে যাব না। তাছাড়া আপনি যে এ দেশকে রিপ্রেজেন্ট করছেন, তার কোনও প্রমাণ আমি পাইনি।'

লোকটা পকেট থেকে একটা ছোট ব্যাগ বের করে তার দিকে এগিয়ে দিল, 'পাসপোর্টটা নাও। ভিসা করানো আছে। এখন থেকে তোমার নাম গৌতম বসু। নামটা মনে করে নাও। কাজ সেরে এই ব্যাগে থাকা ছোট ফোনটায় একটাই নাম্বার আছে। সেটায় ফোন করবে। ওরা তোমাকে এ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। বাকিটা আমি বুঝে নেবো।'

রাণা বলল, 'ইনফরমেশন ক্লিয়ার নেই। আপনার কোনও কথাই ক্লিয়ার নয়। আমি টার্গেটকে খুঁজব কী করে? দ্বিতীয়ত আমি মারব কী দিয়ে? আর্মস?'

লোকটা বলল, 'গুড কোয়েশ্চেন। ব্যাগের মধ্যে একটা স্মার্টফোন আছে। ঢাকায় পৌঁছে ওই স্মার্টফোনে একমাত্র সেভড নাম্বারে ফোন করবে। তোমাকে কী করতে হবে, ওখান থেকে ইন্সট্রাকশান দিয়ে দেওয়া হবে।'

রাণা বলল, 'আমি এখনও বুঝতে পারছি না আমাকে কেন প্রয়োজন হচ্ছে।'

লোকটা বলল, 'ওয়েলকাম টু আওয়ার টিম। বাকি কথা পরে হবে। চলো, ঢাকার ফ্লাইটের জন্য তোমাকে আর আধঘণ্টার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে। আর দেরি করা যাবে না।'

রাণা বলল, 'কাজটা না হলে কী হবে?'

লোকটা বলল, 'আমি যখন বুঝে যাব বা প্ল্যান চেঞ্জ করব, তোমাকে তখন দেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে দেব। এছাড়াও বরিশালে তোমার আত্মীয় থাকে, যাদের বাড়িতে পালানোর প্ল্যান করেছিলে। খুব সমস্যা হলে সেখানে গা ঢাকা দিয়ে দেবে।' রাণা মৃদুস্বরে বলল, 'হু।'

লোকটা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলল, 'ইয়োর কান্ট্রি নিডস ইউ রাণা। খুব বড় অপারেশন হতে যাচ্ছে এটা। তোমাকে পারতেই হবে।'

রাণা উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পর সে এয়ারপোর্টে প্রবেশ করল।

লোকটা রাণাকে নামিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল।

৩

ইমিগ্রেশন পেরিয়ে বেরিয়ে এসে রাণা লোকটার দেওয়া ফোন সুইচ অন করল। ফোন বুকে থাকা নাম্বারটা ডায়াল করতেই ও প্রান্তে ফোন রিসিভ হয়ে গেল, 'এসে গেছেন?'

রাণা বলল, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। মাল নিয়ে নিয়েছেন?'

'মাল নেই কিছু।'

'বাহ্। তাহলে তো খুব ভালো। দু'নম্বর গেট দিয়ে বেরিয়ে আসুন। আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

রাণা বেরোল। একজন যুবক বলল, 'ও গৌতমদা, আসুন আসুন। আমার সঙ্গে আসুন।'

কিছুক্ষণ পর পার্কিং-এ পৌঁছল তারা। ছেলেটা বলল, 'উঠুন উঠুন। অনেকটা যেতে হবে।'

রাণা বলল, 'আপনার নাম?'

ছেলেটা বলল, 'অমল। অমল সরকার। উঠুন উঠুন, গাড়িতে উঠুন। অনেক কাজ আছে।'

রাণা চুপ করে গাড়িতে উঠে বসল।

'এখানে খুব জ্যাম হয়।' অমল বলল।

রাণা বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

অমল বলল, 'কেন? উস্তাদ বলেনি কিছু?'

অমল গাড়ি চালাচ্ছে। একটা গান চালিয়ে দিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না জীবনে তার কোনও চিন্তা আছে। রাণা বলল, 'উস্তাদ মানে?'

অমল বলল, 'যে আপনাকে ঢাকা পাঠিয়েছে।'

রাণা কী বলবে বুঝতে পারল না। সে কী বলবে? তাকে তো অনেক কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। কী বলবে তাও জানে না। চুপ করে থাকতে হবে। সেটাই মঙ্গল।

অমল তাকে আরেকবার খোঁচালো, 'ও দাদা। উস্তাদ কিছু বলেনি?'

রাণা বলল, 'না। আমাকে কিছু বলেনি।'

অমল বলল, 'তাহলে কথা বলে নিন। আমি গাড়ি দাঁড় করাচ্ছি।'

অমল গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। রাণা বিস্মিত হয়ে অমলের দিকে তাকাল। অমল বলল, 'আমার সামনে কথা বলতে অসুবিধে হলে আমি নেমে যাচ্ছি। কথা শেষ হলে ডেকে নেবেন। সিগারেট টেনে আসি।'

সত্যি সত্যি অমল নেমে গেল। রাণা তার ফোন বের করে লোকটাকে ফোন করল। একবার রিং হতেই ফোন ধরল লোকটা, 'তুমি এই সিমটা এখনই ফেলে দেবে। ইউজ করবে না। ইন ফ্যাক্ট আমাকে আর ফোনই করবে না।'

রাণা বলল, 'টার্গেট কে? বলা যাবে?'

লোকটা হাসল, 'ধরে নাও, তুমি এখন যার সঙ্গে যাচ্ছ, সেই।'

রাণা চমকে উঠল, 'মানে?'

লোকটা বলল, 'এরকমই তো হয়। চাকরিতে ছাঁটাই হওয়া লোকটা চিঠি পাওয়ার আগে অবধি জানতে পারে না তার চাকরি চলে গেছে। তার জায়গায় যে লোকটা রিক্রুট হয়েছে, নিজের অজান্তে সে নতুন লোকটাকে সবকিছু শিখিয়ে দিয়েছে এর মধ্যেই। অমলের থেকে সবকিছু শিখে নাও। তারপর সুযোগ বুঝে কাজটা করে ফেলো। তুমি তো ঢাকা চেনো। তোমার ঢাকায় সড়গড় হতে বেশি অসুবিধে হবার কথা নয়।'

রাণা বলল, 'মানেটা কী? আমায় কি এখানে থাকতে পাঠানো হয়েছিল? কাজটা সেরে ফেরার কথা বলেছিলেন। আমি এখানে থেকে যাব নাকি?'

ও-প্রান্ত থেকে ঠান্ডা গলায় উত্তর এল, 'প্ল্যান চেঞ্জ হয়েছে। ইন্ডিয়ায় থেকে করবেটা কী বলো তো? দেশের কাজ করো, জীবনে কোনও কিছুর অভাব হবে না।'

রাণা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, 'আপনি নিশ্চিত অমল ট্রেইটর? ওকে মারতেই হবে?'

লোকটা বলল, 'সেটা আমি বুঝব। আমি তোমাকে যে কাজে পাঠিয়েছি, মনে রেখো সে কাজটাই তোমার ফাইনাল ডেসটিনেশন। অমলের থেকে যতটা জানার জেনে কাজটা শেষ করে দাও।'

রাণা বলল, 'আমি কী জানব? আমি কি এসব কাজ কোনওদিন করেছি নাকি?'

লোকটা বলল, 'জেনে যাবে। ওসবে কোনও চিন্তা নেই। নাও ডু ইয়োর জব। সিমটা এখনই ডেস্ট্রয় করো।'

রাণা বলল, 'আমি কি ওকে শেষ করার আগে আরেকবার আপনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নেবো?'

লোকটা বলল, 'আমার অত সময় নেই। কী করবে, নিজে বুঝে করবে। আর যদি ঢাকা পুলিশ বা যে কেউ তোমার সম্পর্কে কিছু জানতে পারে, আমরা কিছু জানি না। আমি তোমাকে চিনি না।'

রাণা বলল, 'আমি খুব বড় ভুল করেছি আপনার কথা শুনে। আপনার কথা শোনা আমার একদম উচিত হয়নি।'

লোকটা হেসে বলল, 'বেস্ট অফ লাক। ডেস্ট্রয় দ্য সিম।'

রাণা একটু থমকে গিয়ে বলল, 'আর আমাকে মারতে কবে লোক পাঠাবেন?'

লোকটা বলল, 'আশা করি কাউকে পাঠাতে হবে না। তুমি পারবে। আমি জানি। বেস্ট অফ লাক।'

ফোন কেটে গেল। রাণা চুপ করে বসে থেকে সিমটা ফোন থেকে বের করে নষ্ট করে দিল।

অমল সিগারেট টানছে। রাণা চুপ করে অমলকে দেখতে লাগল। সুধাকর দাসকে মারার কথা মনে পড়ে গেল। মারার আগে লোকটার কাছে লাইটার চেয়েছিল সে। সুধাকর রাগী গলায় বলেছিল, লাইটার হবে না। লাইটার দেওয়ার কাজ না তার।

লাইটার দিলে হয়তো সুধাকরের প্রতি কিছুটা মায়া হতো তার। না দিয়ে ভালোই করেছে। সুধাকরের শরীরটা রেল লাইনের উপর ফেলে এসেছিল রাণা। কাজটা শেষ করে দু'মাস গোয়াতে ছিল।

কাচে টোকা মারল অমল। ইঙ্গিতে জানতে চাইল কথা হয়েছে নাকি। রাণা হ্যাঁ সূচক ঘাড় নাড়ল।

অমল গাড়িতে উঠে বসে বলল, 'কী বলল?'

রাণা বলল, 'আপনার সঙ্গে থেকে কাজ শিখতে বলছে।'

অমল শিস দিয়ে উঠল, 'তাহলে তো ভালোই হল। একজন পার্টনার পেলাম। একা একা সত্যি ভালো লাগে না।'

রাণা বলল, 'কী কাজ আছে এখানে?'

অমল বলল, 'কিছুই নেই। দু-চারজনের বাড়ি যাওয়া। কথা বলা। খাওয়া। ঘুমোনো। কোনও কাজ নেই।'

রাণা বলল, 'এই উস্তাদের নাম কী?'

অমল একটু চমকাল, 'সে কী! আপনাকে কেউ বলেনি, উস্তাদের নাম নেওয়া যাবে না? কিছু জানতে চাওয়া যাবে না?'

রাণা বলল, 'না।'

অমল বলল, 'তাহলে জেনে নিন। ওটাই ফার্স্ট লেসন।'

রাণা বলল, 'এখন কাকে টার্গেট করতে হবে?'

অমল বলল, 'সাদিককে।'

রাণা অবাক হল, 'সাদিক কে? আপনি আমাকে তুমি বলতে পারেন।'

অমল বলল, 'ওকে। সব একদিনে বুঝে যাবে? সাদিক ওয়াই। আমাদের পরের টার্গেট ধরো এক্স। এখানে অনেক এক্স ওয়াই-এর ব্যাপার আছে।'

রাণার মাথা ঝিমঝিম করছিল। এই বুঝে নেওয়ার পদ্ধতিটা বেশ বিরক্তিকর লাগছে তার। সে বলল, 'ওয়াইটা কে?'

রাস্তায় ভীষণ জ্যাম হয়ে গেছে। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে অমল বলল, 'ভুবনেশ্বরে হোটেল লিস্টারে তুমি তারেককে উড়িয়েছিলে না? সাদিক হল তারেকের ভাই।'

রাণা চমকে উঠল, 'আপনি কী করে জানলেন আমি তারেককে উড়িয়েছি?'

অমল হাসল, 'ওটা আমার ইন্সট্রাকশনেই হয়েছিল।'

রাণা রাস্তার দিকে তাকাল। সব কিছুর সঙ্গেই কি সব কিছু মিলে যায়? তারেককে ওড়ানোর দরকার ছিল বলে ওরা তাকে রিক্রুট করেছিল। আবার হোটেল লিস্টারের সিসিটিভি ফুটেজও ওরা রেখে দিয়েছে তাকে ব্ল্যাকমেল করবে বলে। বৃত্ত মেলানোই ওদের কাজ? নাহ্। এত ভেবে লাভ নেই। দেখা যাক, সময় তাকে কোথায় নিয়ে যায়। বেঁচে থাকাটাই একটা যন্ত্রণা তার কাছে। যদি এরা তাকে মেরেও ফেলতে চায়, ফেলুক। কী আর হবে তাতে? জীবন একটা ওভার রেটেড জিনিস। অকারণে সেটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও অর্থ হয় না। তার চেয়ে অমল কী করছে, সেটাই দেখা যাক।

অমল বলল, ‘সাদিকের বাড়িতে আমার মিটিং আছে আজ। সাদিক একটা প্রোজেক্ট করছে। সে ব্যাপারেই মিটিং। তুমি আমার বন্ধু। কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছ। এখানে কাজ খুঁজছ। আমি তোমাকে ওদের কাছে আমার বন্ধু হিসেবে নিয়ে যাচ্ছি।’

রাণা বলল, ‘ওরা ব্যাক গ্রাউন্ড চেক করবে না?’

অমল বলল, ‘করে ফেলবে। চাপের কিছু নেই। তোমার কভার রেডি আছে। দেখা যাবে।’

রাণা বলল, ‘আমাদের কী কী জানতে হবে?’

অমল বলল, ‘এক্স লোকটাকে কারা ফান্ড করছে? আই এস আই করছে না অন্য কেউ করেছে? ওদের রুট কী হতে পারে? কোন কোন শহর?’

রাণা বলল, ‘তারেক কী করত?’

অমল বলল ‘ইন্ডিয়ায় বসে আই এস আইকে হেল্প করতো। ইউ ডিড এ গ্রেট জব।’

রাণা শ্বাস ছাড়ল। তারেকের ব্যাপারে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ভুবনেশ্বরের সুবল মোহান্তি। দু-দিন খোঁজ নিয়েছিল, তৃতীয় দিন অপারেশনটা কমপ্লিট করেছিল।

অমল বলল, ‘তুমি কাচ্চি খাও তো? আজ কাচ্চি খাওয়াব তোমায়। নাকি ভেজটেজের ব্যাপার আছে? বৃহস্পতিবার, শনিবার নিরামিষ খেতে হবে, এরকম কোনও ব্যাপার আছে নাকি?’

রাণা বলল, ‘খাই, আমি সব খাই। আমার ওসব ব্যাপার নেই।’

অমল খুশি হল, ‘গুড। এদেশে ওসব খাওয়ার সমস্যা হলে ভুগতে হতো। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।’

রাণা নিশ্চিন্ত হতে পারল না। অমল ঠিক কী বিশ্বাসঘাতকতা করছে যার জন্য তাকে শেষ করতে হবে?

অমল বেশ খুশি মনে গাড়ি চালাচ্ছে। শহরের তুমুল জ্যাম পেরিয়ে অবশেষে একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে পৌঁছল তারা।

অমল বলল, ‘ফ্রেশ হয়ে নাও। আমি খাবার ব্যবস্থা করছি।’

কিছুক্ষণ পর অমল খাবার নিয়ে এল। গরম গরম বিরিয়ানি প্লেটে ঢেলে বলল, ‘বসে পড়, বসে পড়।’

দুজনে বসে গেল। খেতে খেতে রাণা বলল, ‘এক্স যে লোকটা, মানে আমাদের টার্গেট যে, সে ঠিক কী করে?’

অমল খেতে খেতে হেসে ফেলল, ‘একদিনেই সব শিখে নেবে দেখছি। এত তাড়া কীসের? ধরো, এক্স বিভিন্ন শহরে থাকে। এক জায়গায় থাকে না। ঘুরে বেড়ায়। মূলত মিডল ইস্ট কান্ট্রিগুলোতে ওর অবাধ বিচরণ। ধরো পাকিস্তানে থাকে। শেষ দেখা গিয়েছিল কায়রোতে। তার আগে দুবাইয়ের একটা ক্রিকেট ম্যাচে বেটিং করিয়েছিল।’

রাণা বলল, ‘তার মানে ও ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীরা হঠাৎ করে ব্লাস্ট করাতে যাবে কেন?’

অমল খুশি হল, ‘গুড কোয়েশ্চেন। আবার ব্যাডও। তোমাকে আরেকটু তলিয়ে ভাবতে হতো। ইন্ডিয়াতে এক একটা ব্লাস্টের বা টেররিস্ট অ্যাটাকের সুদূরপ্রসারী ফলাফল থাকে। পার্লামেন্ট অ্যাটাক হোক, তাজ অ্যাটাক হোক কিংবা পুলওয়ামা। হয়তো ওরা এমন কোনও অ্যাটাক করতে চাইছে, যার ফলে ওদের দরকার পড়ে।’

রাণা বলল, ‘এক্সকে ফান্ড করতে অর্গানাইজেশন লাগছে কেন? এক্সের নিজস্ব ইন্টারেস্ট নেই তাতে?’

অমল বলল, ‘আছে। তবে লক্ষ্য একই থাকলে এরা দু-চারটে ফান্ডিং পার্টনার ঠিকই জুটিয়ে ফেলে। খেলার মাঠে দেখো না, খেলে একজন, মূল স্পন্সর এক থাকলেও অনেক ছোট ছোট স্পন্সর থাকে। যত গুড়, তত মধু। বাই দ্য ওয়ে, তোমার দরকারি কয়েকটা জিনিস আমি গুছিয়ে রেখে দিয়েছি। যন্তরটা সব জায়গায় নেওয়ার দরকার নেই। আমি বলে দেব, কখন ক্যারি করতে হবে।’

রাণা মাথা নাড়ল, ‘ঠিক আছে। আপনার এখানের এস্টাব্লিশমেন্ট কস্ট কে পাঠায়?’

অমল বলল, 'কে পাঠাবে? আমাকেই রোজগার করে নিতে হয়।'

রাণা বলল, 'সোজা পথে, না বাঁকা পথে?'

অমল হাসল, 'ডিপেন্ডস। যখন যেভাবে সম্ভব হয়। তবে যাই করবে, কিছুতেই এক্সপোজ হবে না। মাথা ঠান্ডা করে, সিক্রেটলি করতে হবে। এখানে বিপদে পড়লে কেউ বাঁচাবে না তোমায়। নিজের দেশ সবার আগে হাত তুলে নেবে। সেরকম হলে আই এস আই-এর হাতেও তুলে দিতে পারে। আই এস আই-এর টর্চার খুব ইনোভেটিভ হয়। ওর থেকে মনে হয় কুম্ভীপাক নরক বেটার জায়গা।'

রাণা বলল, 'আপনি পাকিস্তান গেছেন?'

অমল বলল, 'গেছি।'

রাণা বলল, 'আপনি ওদের ভাষা জানেন?'

'হ্যাঁ জানি। জানতে হবে। তোমাকেও জানতে হবে। এদেশেও বাংলাভাষার অসংখ্য ভাগ আছে। চট্টগ্রামে এক রকম, নোয়াখালীতে একরকম, আবার বরিশালে আরেকরকম। শিখে নিতে হবে।'

রাণা মাথা নাড়ল, 'শিখে নেবো।'

অমল খুশি হল, 'গুড। খাওয়া হয়ে গেলে প্লেট বেসিনে নিয়ে গিয়ে ধুয়ে রেখো। এখানে কাজের বুয়া নেই। আমাদেরই সব করতে হবে।'

অমলের খাওয়া হয়ে গেছিল। সে প্লেট নিয়ে উঠে গেল। রাণার অস্বস্তি হচ্ছিল। লোকটা, যাকে অমল উস্তাদ বলে ডাকছে, তাকে এদেশে পাঠিয়ে দিল। সে সব জায়গার ভাষাও জানে না ঠিক করে। অমল এতদিন ধরে এখানে কাজ করে যাচ্ছে। রাণার কোনও ট্রেনিংও নেই। ঠিক কী হিসেবে লোকটা তাকে অমলের বদলি হিসেবে এখানে পাঠিয়ে দিল? ভাবতে হবে। না ভাবলে কোনও হিসেবই মেলাতে পারা যাবে না।

অমলের ফ্ল্যাটটা ছোট হলেও ছিমছাম। অমল নিজেই গুছিয়ে রাখে সব কিছু। লোকটার কথা অনুযায়ী সে যদি অমলকে মেরেও ফেলে, তারপর তাকে বরিশালে চলে যেতে হবে। এখানে থাকতে পারবে না। উফ্! কী একটা জালে জড়িয়ে পড়ল! যতক্ষণ না পুরো ছবিটা স্পষ্ট হচ্ছে, ততক্ষণ অস্বস্তিটা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না তার।

৪

বিরাট একটা বাড়ি। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভালো। একটা সুদৃশ্য ঘরে বসানো হল। রুমান নামে এন্ট্রি করেছে অমল। গৌতম নামে রাণা। এসির তাপমাত্রা কম। ঘর তীব্র শীতল হয়ে গেছে।

'বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাই নাই আশা করি।'

সাদিক ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল অমল। সাদিককে কর্পোরেট বড় কর্তার মতো দেখতে। ঝকঝকে চেহারা। রিমলেস চশমা পরে আছে।

অমলের দেখাদেখি রাণাও উঠে দাঁড়াল। সাদিক রাণাকে দেখে ভ্রু কুঁচকাল। অমল বলল, 'আমার কলকাতার দোস্তো। একটা কেচ্ছা করে বর্ডার পেরিয়ে পালিয়ে চলে এসেছে।'

সাদিক সোফায় বসল, বলল, 'বলেন কী? কেচ্ছা করেছে? কী কেচ্ছা?'

অমল বলল, 'বোঝেনই তো। জোয়ান বয়েস। এই বয়সে যা হয়।'

সাদিক হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'রক্ত গরম। কী বলেন? গরম রক্তের অনেক সমস্যা। ঠিক আছে, চিন্তার কিছু নাই, আমি আপনার দোস্তোর ব্যবস্থা করে দিমু নে। সব গরম ঠান্ডা করার ব্যবস্থা আছে বুঝলেন

মিয়াঁ? চিন্তার কিছু নাই। কোক খাবেন?' দরজার দিকে তাকিয়ে সাদিক গলা তুলল, 'এই আসগর, দুই খান কোক নিয়ে আয়।'

অমল বলল, 'সাদিকভাই, আমি আপনার প্রোজেক্টের জন্য ভাবছিলাম রাজশাহী যাব। ওখানে কিছু লোককে আমি চিনি। ওরা আমাদের কাজে আসতে পারে।'

সাদিক বলল, 'ঠিক আছে। আমার গাড়ি নিয়া যান। আমি ড্রাইভারের ব্যবস্থা করে দেব।'

অমল বলল, 'না, না। গাড়ি নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। বাসে যেতে হবে। গাড়ি নিয়ে গেলে অনেকের চোখে পড়ে যাব।'

সাদিক ক্যালেন্ডার দেখল, 'কবে যাবেন আপনি? দশ তারিখ কিন্তু আমাকে ফোন করবেন না। ওদিন একটা মিটিং করতে হবে। সারাদিন আমায় পাবেন না।'

অমল মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। সে নিয়ে ভাবছি না। আপনার দোয়া থাকলেই হবে।'

সাদিক রাণার দিকে তাকাল, 'আপনার নাম কী?'

রাণা গলা খাকরে বলল, 'গৌতম।'

সাদিক রাণাকে আরেকবার খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'ক'দিন থাকবেন এ পারে? কোন প্ল্যান করেছেন?'

রাণা ইতস্তত করে মাথা নাড়ল, 'না। সেরকম কিছু ভাবিনি...।'

অমল রাণার কথার মাঝখানেই বলে উঠল, 'আমি এ জন্যই ওকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছিলাম। মানে বুঝতেই পারছেন, বেঁচে তো থাকতে হবেই। কিছু কাজ যদি পাওয়া যেত।'

সাদিক বলল, 'হইয়া যাইব। কিন্তু ইন্ডিয়া ফিরে আমারে ভুললে চলবে না। মনে রাখতে হবে। কী মিয়াঁ? মনে রাখবেন তো আমারে?'

রাণা হাসার চেষ্টা করল, 'আপনি এত উপকার করছেন, আমি কী করে আপনাকে ভুলে যাব সাদিকভাই?'

একটা মোটামতো ছেলে কোক নিয়ে এসে টেবিলে রাখল। সাদিক বলল, 'আপনারা যারা কলকাতার মানুষ, তারা খুব তাড়াতাড়ি মুখ মুছে ফেলেন, বুঝলেন ভাই! এ দেশে এসে আতিথেয়তা নিয়ে যায়, ও দেশে গেলে ভুলে যায়। কতবার হয়েছে এখানে কত আদর করলাম, ও আল্লা, কলকাতায় গিয়ে দেখি আমারে চিনতেই পারে না। ঠিক আছে, ব্যাপার না, আমি ওসব নিয়ে ভাবি না। আপনি রুমানভাইয়ের সঙ্গে আইছেন যখন, আপনি আমারও দোস্তো। আপনার দায়িত্ব আমি নিলাম। রুমানভাই, আপনার দোস্তোকে প্রোজেক্টে নিয়ে নিন। একটু ঘোরাঘুরির কাজ আছে। পারবেন না মিয়াঁ?'

রাণা ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ পারব।'

সাদিক খুশি হল, 'বাঃ। তাহলে তো ভালোই হল। চিন্তা নেই আর। কী রুমানভাই, আপনিই তো বিশ্বস্ত লোক খুঁজছিলেন, ভালোই হল।'

রাণা বলল, 'আমাকে কী করতে হবে?'

সাদিক বলল, 'রুমান ভাই বলে দেবে। তবে মিয়াঁ কাজের মাঝপথে ফিইরা যামু বলে কাঁদলে কিন্তু হইব না। এ কাজে সময় লাগব। আপনি না পারলে আগে থেকে বইলা দিয়েন।'

রাণার পায়ে আলতো করে চিমটি কাটল অমল। রাণা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'না না। আমি থাকবো। কাজ করে তারপরেই না-হয় ফেরার কথা ভাবব।'

সাদিক খুশি হল, 'বাহ্। তাহলে তো খুবই ভালো।'

রাণা কৌতূহলী গলায় বলল, 'কিন্তু কাজটা কী?'

সাদিক হাসল, 'সময়ে সব বলব দাদা। এখন আপনার গরম রক্ত। সেটার তো ব্যবস্থা করি আগে। আসগর, শুনছস? শুইনা যা!'

আসগর এসে দাঁড়াল...।

৫

গরম লাগছে। লতিফ চৌধুরী পান খাচ্ছে। কষ গড়িয়ে পানের রস পড়ছে। তার দাড়ি মেহেন্দি করা। কোত্থেকে একটা বলিউডি গান বাজছে।

লতিফ চৌধুরী চিৎকার করল, 'এইসব হারাম গান বন্ধ কর। বন্ধ কর। কতবার বলছি এসব গান চালানো এইখানে নিষেধ।'

লতিফের ছেলে সফিক এসে বাবার কাছে বসল। 'আব্বা।'

লতিফ বলল, 'কও। তোমার আর কাম কী? সারাদিন ঘরে শুইয়া থাকো।'

সফিক বলল, 'আব্বা, সাদিক ভাই আসবে বলছে। ফোন দিছিল।'

লতিফ বলল, 'কখন আইবে?'

সফিক বলল, 'সকাল দশটায়।'

লতিফ ঘড়ির দিকে দেখল, রাগী গলায় বলল, 'এখন দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট আছে। তোমারে কখন ফোন দিছিল?'

সফিক বলল, 'কাল রাইতে।'

লতিফ রাগী চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাইর হও। বাইর হও।'

সফিক লজ্জিত মুখে বলল, 'টেকা লাগবে আব্বা।'

লতিফ বলল, 'কী কামে লাগবে?'

সফিক বলল, 'আম্মা কইসে।'

লতিফ পকেট থেকে টাকা বের করে ছুঁড়ে মারল।

বাইরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। লতিফ উঠে দাঁড়াল, 'তুই যা। আমি দেখতাসি। যা যা।'

সফিক দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাদিক ঘরে ঢুকে লতিফকে কদমবুসি করে সালাম করল।

লতিফ খুশি হয়ে প্রত্যুত্তরে সালাম জানিয়ে বলল, 'কী দরকার ছিল তোমার আসার? আমারে বললেই পারতা! আমি চইলা যাইতাম।'

সাদিক বলল, 'আসার দরকার ছিল। সরকার থেকে আবার একটা কমিটি বানাইছে রাজাকারদের তালিকা তৈরির জন্য। অন্য কেউ থাকলে সমস্যা ছিল না। শেখের বেটি আছে না? শেখের বেটির নিজস্ব রাগ আছে রাজাকারদের বিরুদ্ধে।'

লতিফের মুখ শুকিয়ে গেল, 'আবার? আগেরবার ফাঁকি দেওয়া গেছিল। এবার কী হবে? আমার বয়স হইসে। এই বয়সে টানাটানি করবে নাকি?'

সাদিক বলল, 'করবে না। আমার এক দোস্তোরে বলা আছে। ও সব দেখবে। ও আবার আপনার খুব বড় ভক্ত। দেখা করতে আইসে।'

লতিফ বলল, 'কই?'

সাদিক ডাকল, 'রুমান। আস।'

ঘরে অমল প্রবেশ করল। লতিফের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করল।

সাদিক বলল, 'খুব ভালো ছেলে, বুঝলেন? তালিকা তৈরির কাজ ওরেই দেওয়া হইসে। রুমান। আমার পরিচিত।'

রুমান বলল, 'আপনার কথা অনেক শুনছি। কত গ্রামে আপনি তখন পাকিস্তানি সেনা লইয়া গেছেন।'

লতিফের মুখে আলাদা আভা চলে এল, 'তা আর কী কই? আমি ছিলাম বইলা গ্রামের পর গ্রাম মালাউন পালাইসিল। তাও পারে নাই। কম করসি?'

সাদিক বলল, 'আমাদের লক্ষ্য একই আছে। আমরা আবার পাকিস্তান দেখতে চাই আমাদের দেশে। আমরা চাই তার লক্ষ্যে চাচা আপনি আমাদের নেতৃত্ব দেন। আমাদের শিক্ষা দ্যান। পথ দেখান। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

সাদিক আবেগে কেঁদে ফেলল লতিফের হাত ধরে।

লতিফ বলল, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ। কোনও খবর আইসে?'

সাদিক অমলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাইরে যাও।'

অমল সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাদিক বসে বলল, 'খবর আছে। বড় মিয়াঁভাই আসবেন।'

লতিফের মুখ খুশিতে ভরে উঠল, 'মাশাল্লাহ। কবে আসবেন?'

সাদিক বলল, 'জানাবো। সব জানাবো। আমরা এবার আমাদের লক্ষ্যে সফল হবই। অনেক মালাউন আছে এখন সরকারের কান ভারী করছে। ইন্ডিয়া চেষ্টা কইরা যাইতাসে। আমরা এখনই আমাদের কাজ না করতে পারলে সমস্যা বাড়বে জনাব।'

লতিফ বলল, 'জানি তো। আমি সেই কবে দিয়া বলতাসি। মিয়াঁ ভাই আইলে কিন্তু আমারে ডাকবা। আমি কথা কমু। কতদিন উর্দু কই না। আহা, কী সুমিষ্ট ভাষা। প্রাণের ভাষা।'

সাদিক বলল, 'সেদিন নিকটে চইলা আইসে। বেশিদিন আমাগো অপেক্ষা করতে হবে না। সব ব্যবস্থা হইয়া যাইব। আপনি কিন্তু রুমানের লগে কন্ট্যাক্ট রাখবেন। মাঝে মাঝে ফোন দিবেন। এখন সময় ভালা না। কত লোকের লগে ঝামেলা লাগে। ও ভুইলা গেলেও আপনি ভুলবেন না। আমি যাই চাচা।'

লতিফ ঘাবড়ে গিয়ে সাদিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আবার ভুলবে ক্যান?'

সাদিক বলল, 'কথার কথা চাচা। আপনি কন্ট্যাক্ট রাইখেন।'

লতিফ ব্যাজার গলায় বলল, 'ঠিক আছে। রাখব।'

৬

সাদিকের গাড়িটা জাহাজের মতো বড়। আসগর দরজা খুলে দিয়ে তাকে বসাল। নিজে রাণার উল্টোদিকে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

রাণার অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। আসগর একটাও কথা বলছে না। চুপ করে বসে আছে।

রাণা জানলার বাইরের ঢাকা শহরটাকে দেখতে লাগল। সাদিক যেন একপ্রকার জোর করে তাকে পাঠিয়ে দিল। এখন এই বিকেলবেলাতেই পাঠিয়ে দিল? অদ্ভুত!

সোনাগাছিতে রাণার একটা বাঁধা মেয়েছেলে আছে। তারা। যাওয়ার আগে ফোন করে যায়। তারা আর কাউকে ঘরে ডাকে না। একবার তারাকে নিয়ে দীঘা গেছিল রাণা। তারা খুব খুশি হয়েছিল। সন্ধেবেলাতেও সমুদ্রে স্নান করার জন্য বায়না ধরেছিল।

অদ্ভুত দিন কাটে তারার সঙ্গে। এখানে, ঢাকায় এসে আবার সেরকম একটা মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হবে? জীবনটা ভারি অদ্ভুত। কখন কোন চমকের সামনে নিয়ে এসে দাঁড় করায়, কেউ জানে না।

একটা গলির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আসগর দরজা খুলে বলল, 'চলেন।'

রাণা গাড়ি থেকে নামল।

আসগর হাঁটতে শুরু করল। রাণা তার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল।

একটা ছোট গলিতে ঢুকল আসগর। চারদিকে এত ভিড়, অথচ এই গলিটায় একটা লোকও নেই। খানিকটা হাঁটার পর বুঝল এটা আসলে একটা কানা গলি। গলিটা একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। আর যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই একটা দরজা।

আসগর এগিয়ে গিয়ে দরজায় দুবার নক করল। দরজা খুলে গেল। আসগর রাণার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'যান।'

রাণা চারদিকে দেখল। কেউ কোথাও নেই। কেউ তাকে দেখছে না। সে ভিতরে প্রবেশ করল। আসগর বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সে। সামনে আরেকটা দরজা। রাণা এগিয়ে দিয়ে দরজায় নক করল।

একটা কমবয়সি মেয়ে দরজা খুলে বলল, 'আসেন।'

রাণা বলল, 'আপনি?'

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে বলল, 'আমাকে আপনি বলার দরকার নাই।'

রাণা অপ্রস্তুত হল। সে বলল, 'জল খাওয়াবেন?'

মেয়েটা আবার হেসে বলল, 'পানি বলেন। জল বলেন ক্যান?'

রাণা ঘাড় নাড়ল, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাকে পানি দিন।'

মেয়েটা বলল, 'আসেন, ভিতরে আসেন।'

একটা ছোট ঘরের ভিতর ঢুকল। মেয়েটা রিমোট দিয়ে এসি চালিয়ে দিল। বলল, 'ভাইজানের গরম লাগে বুঝি?'

রাণা বলল, 'তোমার নাম কী?'

মেয়েটা বলল, 'আমি জরিনা। সাকিনা আমার আপা। আপনের কেমন মাইয়া পছন্দ? বুড়ি না ছুড়ি?'

রাণা গলা খাকড়াল। কী বলবে বুঝতে পারছে না সে। দরজা খুলে আরেকজন মেয়ে ঢুকল। জরিনার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, 'তুই যা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে যা।'

জরিনা থতমত খেয়ে, 'জি আপা' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটা রাণার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে বলল, 'এসব করতে আপনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে?'

রাণা চমকে মেয়েটার দিকে তাকাল, 'কে আপনি?'

'সাকিনা। কেন, রুমান কিংবা অমল কি কিছুই বলেনি আমার সম্পর্কে?'

রাণা মাথা নাড়ল, 'না। বলেনি কিছু। তাছাড়া সাদিক আমাকে হঠাৎ করে এখানে পাঠিয়েছে। তার আগে আমাকে কোনও কথা বলার সুযোগও পায়নি।'

সাকিনা সিগারেট বের করল। রাণাকে বলল, 'ফুঁকবেন?'

রাণা মাথা নাড়াল, 'না।'

একটা ফোন বাজতে শুরু করল। সাকিনা ফোনটা ধরেই অবিকল জরিনার মতো খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, 'বল জান, মেহেমান এসে গেছে তো, মেহেমানকে আমি দেখছি। তোমায় কিচ্ছু ভাবতে হবে না। ভাবার কিছু নাই। উম্মা।'

ফোনে বড় একটা চুমু খেয়ে ফোন কেটে দিল সাকিনা। রাণার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘প্রথম যখন এলাম, বলতো তুমি শুধু আমার, আর কাউকে তোমাকে দেব না। সময় পাল্টে গেল। এখন আমাকে শেয়ার করা যায়। শুয়োর! শুনুন, আপনাকে বলছি’, কড়া গলায় বলল সাকিনা, ‘আপনাকে এখানে ঘুরতে পাঠানো হয়নি।’

রাণার মাথা গরম হল, ‘তাহলে কী করতে পাঠানো হয়েছে? আমার কী করার ছিল যদি আমাকে এখানে পাঠিয়ে দেয়?’

সাকিনা বলল, ‘সেটাই তো খেলা। উস্তাদ আমাকে বলে দিয়েছে আপনাকে অমলের সঙ্গে থাকতে হবে। একা থাকতে দেবেন না ওকে। কিছুতেই যেন আপনাকে ঝেড়ে ফেলতে না পারে। আপনাকে এখানে পাঠিয়ে ও সাদিকের সঙ্গে কোথায় গেছে জানেন?’

রাণা বলল, ‘আমি আজকে এসেছি। আমি কি ম্যাজিক জানি নাকি? সময় লাগবে তো!’

সাকিনা চিন্তিত মুখে রাণার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘হায়! আমাদের হাতে এই জিনিসটিই মোটে নেই!’

রাণা বলল, ‘অমল কী করেছে?’

সাকিনা কাঁধ ঝাঁকাল, ‘আমি কিচ্ছু জানি না। উস্তাদ আপনাকে এটা বলতে বলেছে, বলে দিলাম।’

রাণা আরও দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ল...।

৭

আধঘণ্টা পর রাণা ঘর থেকে বেরোল। জরিনা যেমন শুরুতে এসেছিল, তেমনই এসে খিলখিল করে হেসে বলল, ‘ভাইজান, সব ঠিক আসে তো?’

রাণা উত্তর দিল না। ঘরের বাইরে বেরোতে জরিনা দরজা বন্ধ করে দিল। আসগর বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

রাণা বেরোতে আসগর হাঁটতে শুরু করল। রাণা আসগরের পিছন পিছন হাঁটতে লাগল। ভিড় গলির মুখে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আসগর দরজা খুলে দিল।

রাণা গাড়িতে উঠে অবাক হয়ে গেল। গাড়িতে সাদিক বসে আছে। সে অবাক হলেও মুখে বিস্মিতভাব দেখাল না।

সাদিক হাসল, ‘কেমন ভাই? সাকিনা খুশি করতে পেরেছে তো?’

আসগর গাড়িতে উঠল না। গাড়ি চলতে শুরু করল।

রাণা মাথা নাড়ল, ‘হ্যাঁ। সাকিনা খুব ভালো।’

সাদিক বলল, ‘একদম জোশ, তাই না?’

রাণা বলল, ‘হ্যাঁ, একদম জোশ।’

সাদিক অদ্ভুতভাবে হাসল, ‘আপনি রুমানভাইয়ের দোস্তো মানে আমারও দোস্তো। ইন্ডিয়ায় কী করসিলেন আপনি? পালায়ে আসতে হইল কেন?’

সাদিক বেশ অদ্ভুতভাবে কথা বলে। কখনও পুরো বাঙাল ভাষায় কথা বলে, কখনও শান্তিপুরি বাংলায়। রাণা বলল, ‘ঝামেলা হয়ে গেল। মেয়েঘটিত।’

সাদিক বলল, ‘ভাইয়া মনে হয় কথা বলতে ভালোবাসেন না। কম কথা বলেন, তাই না?’

রাণা বলল, ‘রুমান কোথায়?’

সাদিক বলল, ‘আমার বাসাতেই আছে। আমি ভাবলাম আপনার সাথে একবার দেখা করে আসি। মানে মেহমান তো আপনি। আমরা আবার মেহমানদের জন্য জানও দিতে পারি। কোক খান ভাই। অনেক পরিশ্রম হয়েছে।’

গাড়ির ভেতর থেকে একটা কোকের বোতল রাণার দিকে এগিয়ে দিল সাদিক। রাণা ইতস্তত করে বোতলে এক চুমুক দিল।

সাদিক বলল, ‘এই যে ঢাকা শহর দেখছেন না ভাই, আমি এই শহরে যখন এসেছিলাম আমার পকেটে কত টেকা ছিল জানেন? পঞ্চাশ টেকা। কী করি নাই? ভিক্ষা করসি, ট্রেনে পকেটমারি, দোকানে কাজ...কী করি নাই? সব করসি। সময় পাল্টায় ভাই। কিন্তু সময় কী দিতে পারে না জানেন? বলেন তো?’

রাণা সাদিকের দিকে তাকিয়ে রইল। উত্তর দিল না। কী বলবে বুঝতে পারছিল না।

সাদিক নিজেই বলে চলল, ‘সময় একজন বন্ধু দিতে পারে না ভাই। বন্ধু খুব কঠিন জিনিস। রুমানভাইয়ের সঙ্গে খুব বেশি দিন হয় নাই আলাপ হয়েছে, কিন্তু রুমানভাইরে আমি আমার দোস্তো বইলা ভাবি। রুমানভাইয়ের প্রবলেম, আমার প্রবলেম। নইলে আমার খাস জায়গায় শুরুতেই আমি আপনারে লইয়া আসি? আপনিই বলেন?’

গাড়ি ফাঁকা রাস্তায় উঠেছে। সাদিক চেঁচিয়ে ড্রাইভারকে বলল, ‘ভালো গান চালা। ও রুস্তম। ভালো গান চালা।’

রাণা সতর্ক হল। সাদিক কি অন্য কিছু প্ল্যান করছে? অহেতুক আজেবাজে কথা বলে যাচ্ছে। অমলের কথা শুনে তো মনে হয়নি তার সঙ্গে সাদিকের এত বন্ধুত্ব হয়ে গেছে?

সাদিক গানের তালে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, ‘কাজের কথায় আসি গৌতম ভাই। ফাউ প্যাঁচাল পাইড়া যাইতাসি। কুনো মানে হয় না। আপনারে প্রথম দেইখাই আমার ভালো লাইগা গেছে। তাই বলছি। আমি একটা ছোট সিন্ডিকেট খুলসি। কিছু জিনিসপত্র, এদেশ থেকে আমরা বিভিন্ন দেশে পাঠামু, আবার ও সব দেশ থিকাও নিয়া আসতে হইব। তার মধ্যে ইন্ডিয়াও আছে ভাই। কিন্তু আপনি ওদেশে এখন যাইতে পারবেন না, আমি বুঝি। তাই আপনারে ইন্ডিয়ায় পাঠাবো না।’

রাণা বলল, ‘স্মাগলিং-এর কাজ?’

সাদিক বলল, ‘ওরকমভাবে বলবেন না ভাই। স্মাগলিং আবার কী কন? এখনকার দিনে সব পথই এক। যে পথে টেকা আসে, সেই পথই ঠিক। খারাপ ভালো ভাইবেন না ভাই। আমার আপনাকে পছন্দ হইসে। রুমান ভাইয়ের মতো আপনিও আমার সাথে কামে আসেন ভাই।’

রাণা সাদিকের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কী কাজ করতে হবে?’

সাদিক বলল, ‘ঘুরতে হইব। আজ সিঙ্গাপুর, কাল ব্যাংকক, পরশু দুবাই। ঘুরবেন মনের সুখে, এদিক সেদিক যাবেন। একটা কাগজ দিলে, সেটা নিয়া চইলা আইলেন। এই তো কাম। এর বেশি কিছুই করতে লাগব না।’

রাণা বলল, ‘তার জন্য ধরা পড়লে কী হবে?’

সাদিক খুব খুশি হল যেন। দুলে দুলে হাসল। হাসতেই হাসতেই বলল, ‘আপনারে তো আমি সোনা দিমু না। হিরাও দিমু না। এক খান কাগজ। কাগজের জন্য আপনারে কেউ ধরবে না। নিশ্চিন্ত থাকেন।’

রাণা অবাক হল, ‘শুধু কাগজের জন্য ট্রাভেল করতে হবে? আর কিছু না?’

সাদিক বলল, ‘না। আর কিছু না ভাইজান। শুধু কাগজ। রুমানভাই আপনেরে কি খাওয়াইসে? লাচ্ছি খাবেন?’

রাণা মাথা নাড়ল, ‘নাহ্। ওসব খাব না এখন। আপনি কোক খাওয়ালেন তো। তাতেই হবে।’

সাদিক বলল, 'আপনি আমার এখানে জয়েন করেন ভাই। এই দেশে লোকের কমতি নাই। কিন্তু একটা মাইনসের মধ্যে দুইটা জিনিস এক লগে পাওয়া যায় না। বিশ্বস্ত মানুষ আছে। কিন্তু তার মধ্যে লুকস নাই ভাই। লুকস বোঝেন তো? এই আসগররে যদি আমি ব্যাংকক পাঠাই, ওরে তো পুলিশে ধইরা আগে পিটাইবে তার পর বাকি কথা শুনবে। তাই না?'

রাণা তীক্ষ্ণচোখে সাদিকের দিকে তাকিয়ে রইল। সাদিকরা কী জিনিস দেওয়া নেওয়া করে?

তাকে প্রথম দেখাতেই এত পছন্দ হয়ে গেল যে তাকে নিতে চলে এল? শুরুর দিকে হলে রাণা ভাবত, তার তখন মাথা পরিষ্কার ছিল। মানুষ মেরে মেরে এখন আর বেশি ভাবতে ইচ্ছে করে না। শুধু মনে হয়, ঘরে ফিরে কখন ঘুমোবে। এপাশ ওপাশ করে শোবে। টিভি দেখবে। এই মানসিকতা থেকেই লিস্টার হোটেলের ভুলটা হয়ে গেছে। বোঝে সে। হয়তো আরও অনেক ভুল হতো। ঢাকায় যদি কাজ করতে গিয়ে মরেও যায়, কোনও খেদ থাকবে না। বেঁচে থেকে খুব বেশি লাভ নেই। মরে গেলে যাবে। অত বুদ্ধি খাটাতে যাবে না।

৮

সাদিকের প্রাসাদে গাড়ি এসে দাঁড়াল। সাদিক বলল, 'আসেন ভাই। রাতে না খাওয়াইয়া আপনাকে ছারুম না।'

রাণা দেখল আসগর দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে চলে এসেছে? অদ্ভুত ব্যাপার তো!

অমল ড্রইংরুমে ক্রিকেট ম্যাচ দেখছিল। তাকে ঢুকতে দেখে হাসল, 'কী, সব ঠিক আছে তো?'

রাণা মাথা নাড়ল। সাদিক বসল। সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'দোস্তোরে কইলাম রুমানভাই। আমি ইন্ডিয়ায় যাওয়ার জন্য জোর করুম না। আমার জন্য মাঝে মাঝে ব্যাংকক, দুবাই, কলম্বো যাইতে হইব। আপনি তো যান, ভাইরে বোঝাইয়া কন না।'

রাণা বিরক্ত মুখে অমলের দিকে তাকাল। অমল বলল, 'যাবে যাবে। গৌতমের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। আপনি অত ভাবছেন কেন? এর পরে দোস্তো আমার কলকাতা ফিরতেই চাইবে না, দেখবেন।'

সাদিক বলল, 'তাই তো চাই। আমার কাছে থাকলে চিন্তার কিছু নাই ভাই।'

অমল উঠে দাঁড়াল। টিভির পাশে সাদিকের সঙ্গে তারেকের ছবি। অমল বলল, 'অনেকবার বলেছি, আবারো বলছি, আপনাদের দেখলে যমজ লাগে ভাই।'

সাদিক বলল, 'বড় ভাইজান থাকলে কি এখন এত হেডেক নিতে হইতো রে ভাই? সব একাই সামলাইয়া রাখত।'

রাণার মনে পড়ে গেল। তারেক প্রচুর মদ খেয়ে ছিল সেদিন। কলিং বেল টিপতে চিৎকার করতে করতে দরজা খুলল। রাণা দেরি করেনি। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুণে গুণে চারটে গুলি করে বেরিয়ে চলে এসেছিল। সাইলেন্সার থাকায় কেউ শব্দ পায়নি। লাশটা লুটিয়ে পড়েছিল মেঝেতে। লিস্টার ছোট হোটেল। স্টাফরা তখন ডিনার করছিল। কাজটা করে চুপচাপ হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসেছিল সে।

তারেকের সঙ্গে সাদিকের চেহারার অনেক মিল আছে। সাদিক ধরাগলায় বলল, 'আমার যাওয়ার কথা ছিল জানেন মিয়াঁ? ভাইজান বলল তোর যাওয়ার দরকার নেই। তুই ভুবনেশ্বর চিনবি না। আমি আর জোর করি নাই। আমারও ভয় ছিল। ভাইজান হয়তো বুঝতে পারসিলো। তাই আমারে না পাঠায়ে নিজে গেছিল।'

অমল আড়চোখে রাণার দিকে তাকাল। সাদিক সিগারেট ফেলে সোফায় এসে বসল। অমলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাইরে বলেন মিয়াঁ। আমার বিশ্বস্ত লোক দরকার। টেকার বিষয়ে চিন্তা করতে বারণ

করেন।'

অমল বলল, 'করবে তো! গৌতম করবে। কী রে গৌতম, সাদিকভাই এত আদর করে বলছে, তুই করবি না?'

রাণা মাথা নেড়ে বলল, 'করব।'

সাদিক খুব খুশি হল। ছুটে এসে রাণার হাত ধরে বলল, 'শুক্রিয়া ভাই। আপনারে অনেক শুক্রিয়া। ইলিশ খাবেন ভাই?'

রাণা মাথা নাড়ল, 'আপনি যা খাওয়াবেন সাদিকভাই।'

সাদিক রাণাকে জড়িয়ে ধরল।

সাদিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠেই রাণা বলল, 'এটা কী হল? আপনি কি এখন এই কাজই করছেন? স্মাগলার হয়ে গেছেন?'

অমল অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে বলল, 'ও ইনফরমেশন আদান প্রদান করে। কোনরকম অনলাইন সিস্টেমে সাদিক বিশ্বাস করে না। ওই কাজ না করলে আমি কী করে জানতাম ওরা ইন্ডিয়াতে কী প্ল্যান করছে?'

রাণা বলল, 'ব্যাকগ্রাউন্ড চেক ছাড়া ও আমাকে নিচ্ছে কেন?'

অমল বলল, 'আমার জন্য নিয়েছে। আমার ট্র্যাক রেকর্ড বেশ ভালো। এগারোটার উপর দেশ ঘুরে এলাম সাদিকের কল্যাণে। ও আমার মুখের কথা বিশ্বাস করেছে। পরে চেক করবে হয়তো। তবে তার আগে আমাদের কাজ হয়ে যাবে।'

রাণা বলল, 'আমার সব অদ্ভুত লাগছে। আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে মাঝখান থেকে কোনও সিনেমা দেখতে শুরু করেছি।'

অমল বলল, 'কেন? তোমার তো এতক্ষণে অনেকটাই সড়গড় হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এরকম বললে কী করে হবে? আমাদের কাজ খুবই সিম্পল। সাদিক একটা চুনোপুটি। ও যার যার কথা শুনে কাজ করে, আমাদের সেগুলো খুঁজে বেড়াতে হবে। আর তাদের পেয়ে গেলে...'

রাণা বলল, 'কী করতে হবে? মেরে দেব?'

অমল শিস দিয়ে উঠল, 'মারতে পারলে আর কিছু চাই না।'

৯

বৃষ্টি নেমেছে। গাড়ির জানলার বাইরে তাকিয়ে রাণা বলল, 'আপনি যে দেশগুলোতে গিয়ে সাদিককে হেল্প করছেন, এটা উস্তাদ জানে?'

অমল বলল, 'উস্তাদ সব জানে। না জানিয়ে আমি এ কাজ করব কেন?'

রাণা কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

অমল বলল, 'কী হল? কী বলতে যাচ্ছিলে?'

রাণা বলল, 'কিছু না।'

অমল বলল, 'এ দেখি মেয়েদের মতো করো। মেয়েরাও এরকম করে। কথা বলতে গিয়ে বলে কিছু না।'

রাণা বলল, 'আমার একটা রিভলভার লাগবে। কিছু বুলেট।'

অমল বলল, 'পেয়ে যাবে। সময়মতো সব পেয়ে যাবে। সাদিকের বাড়িতে ওসব নিয়ে গেলে ধরা পড়ে যাবার চান্স আছে। ওই চান্স নেওয়া যাবে না।'

রাণা বলল, 'সাদিকের এদিক সেদিক পাঠানোর স্বভাবটা ভালো লাগছে না। ও যদি রিস্কি কোথাও পাঠিয়ে দেয়?'

অমল বলল, 'পাঠাতেই পারে। এভ্রিথিং ইজ পসিবল। সে কাজে অস্তর লাগলে ও-ই তোমাকে দিয়ে দেবে। আমরা যে কাজে নেমেছি, সে কাজে নামার আগে ভাবতে হয়। নামার পরে ভেবে লাভ নেই। তুমি ঠান্ডা মাথার খুনি, তুমি খুন করার পরে কি ভেবেছ কাজটা ঠিক হয়নি? সেটা ভাবলে কি বেঁচে থাকতে পারতে?'

রাণা চুপ করে গিয়ে জানলার বাইরে তাকাল। প্রথম খুন করার আগে কি সে কোনওদিন ভাবতে পেরেছিল এ জন্মে সে একজন মানুষকে মারতে পারবে? নিজের মতোই হাত চোখ কান ওয়ালা একটা লোক, তার হাতে মরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে, দৃশ্যগুলো কতদিন তাকে ঘুমোতে দেয়নি। জাগিয়ে রেখে দিয়েছে রাতের পর রাত। ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে এসেছে। যেটা ইচ্ছে, সেটা করতে পেরেছে। একটার পর একটা পাপবোধ তাকে বিদ্ধ করে গেছে।

শক্ত না থাকলে সবার আগে নিজেকে মরতে হবে। সেটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যাবে না। আদিম মানুষ একে অপরকে মেরেই বেঁচে থাকত। তাকেও বেঁচে থাকতে হবে। তাকে গুরুত্ব পেতে হবে। প্রতিটা মানুষ তাকে গুরুত্ব দেবে। মরতে যেমন ভয় পাবে না সে, একইভাবে যতদিন বেঁচে থাকবে, কারো উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকবে না। কাউকে ভয় পেয়ে বেঁচে থাকবে না।

অমলের গাড়ি ফ্ল্যাটের পার্কিং-এ দাঁড়াল। অমল গাড়ি লক করে বলল, 'পেছনে একটা টয়োটা গাড়ি ফলো করছিল লক্ষ করেছ?' রাণা দেখল সাদা রঙের গাড়িটা বেরিয়ে চলে গেল। সে বলল, 'সাদিক পাঠিয়েছিল?'

অমল বলল, 'সাদিক তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করে দেখবে। মুখে দোস্তো দোস্তো করবে, কিন্তু ঠিকই সব যাচাই করবে। চিন্তা নেই। তোমার কভার ঠিকঠাক সাজানো আছে। চলো।'

অমলের ফ্ল্যাটে ঢুকল দুজনে। অমল দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালাল। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল বের করে গ্লাসে ঢেলে গ্লাস নিয়ে সোফায় বসল, 'কঠিন খেলা চলছে। কে জিতবে কেউ জানে না।'

রাণা বলল, 'হারলে কী হবে?'

অমল তার দিকে তাকাল, 'কী হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

রাণা বলল, 'বাইরের দেশগুলোতে যখন পাঠায়, সে কাগজ থেকে ব্লাস্টের লোকেশন সম্পর্কে কিছু লেখে না?'

অমল ঘাড় নাড়ল, 'লেখে। কোডে লেখে। যেমন এই মুহূর্তে কোচিতে ওদের একটা স্লিপার সেল জেগেছে। আসামেও। এই দুই সেলের জেগে ওঠার কোড ওই কাগজ থেকেই গেছে। কাগজগুলো রিমোটের কাজ করে। ব্যাংককের কোনও এক দেহপসারিণী একটা মিসড কল মেরে একটা স্লিপার সেলের ঘুম ভাঙিয়ে দিতে পারে। ইন্টারেস্টিং না?'

রাণা বলল, 'হুঁ। উস্তাদকে ফোন করেন কখন?'

অমল বলল, 'দরকার পড়ে না। রোজ রোজ ফোন করবই বা কেন? তাছাড়া যখন তুমি বাইরের কোনও দেশে থাকবে, তখন তোমার মালিক তুমি নিজেই। অন্য কারো নির্দেশের অপেক্ষায় থাকলে চলবে না। তোমার মাথায় একজন বন্দুক ধরে আছে, আর তুমি তখন দিল্লিতে ফোন করে জিগ্যেস করবে এখন তোমাকে কী করতে হবে? নাহ্, এসব ওভাবে চলে না। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে শেখো। নিজের রুটির ব্যবস্থাও নিজে করবে। বুঝলে?'

রাণা বলল, 'হুঁ।'

১০

'তুই আমাকে চিনিস না। তাও গুলি করে দিলি? তোর একবারও মনে হল না, কাজটা ঠিক হচ্ছে না? টাকা পেলে তুই সব করে দিবি? এভাবে তুই আমাকে খুন করে ফেললি?'

ধড়মড় করে উঠে বসল রাণা। আজ তারেক দুঃস্বপ্নে হানা দিয়েছিল। এভাবেই কেউ না কেউ হানা দিয়ে রাতের ঘুমটার দফারফা করে দেয়। ঘাম হচ্ছে রীতিমতো। রাণা উঠে ফ্রিজ থেকে জলের বোতল নিয়ে অনেকটা জল খেয়ে নিল। অস্বস্তি হচ্ছে।

ঘড়ি দেখল। রাত তিনটে বাজে। বাংলাদেশি সময় রাত তিনটে মানে ভারতে এখন রাত আড়াইটা। সময়ের দিক থেকে বাংলাদেশ আধ ঘণ্টা এগিয়ে আছে। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রাণা। রাস্তার গাড়ি চলাচল এখন নেই। মাঝে মাঝে ছুটকো-ছাটকা এক-আধটা গাড়ি যাচ্ছে। এ কথাটা আজকাল প্রায়ই মনে হয় তার। এত এত গ্রহ আছে চারদিকে। অথচ এই পৃথিবীতে সে একটা মানব জন্ম পেয়েছে। কাজ না পেয়ে সে কী করে? আরেকটা মানুষকে খুন করে! খুন করতে তার হাত কাঁপেনি কোনদিন। আগুপিছু কোনদিন ভাবেনি।

তবে আজকাল রাতের মধ্যে সেই লোকগুলো হানা দেয় কেন? ঘুমোতে দেবে তো! ঘুমটা তো তার দরকার!

ব্যালকনির দরজাটা চোখে পড়ল। রাণা দরজা খুলে ব্যালকনিতে গেল। চেয়ার রাখা আছে। ক্লান্ত শরীরে একটা চেয়ারে বসল সে। সামনের রাস্তায় বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। শহরে জায়গা এতটাই অপ্রতুল যে মানুষ রাস্তাতেই গাড়ি রেখে দেয়।

হঠাৎ রাণা নড়ে-চড়ে বসল। একটা কালো গাড়ির ভেতর লাইটার জ্বালিয়েছে কেউ। সিগারেট ধরাল। এই গাড়ির ভেতরে লোক আছে? এই ফ্ল্যাটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছে কেন? সাদিকের লোক কি এখনও এখানে আছে? গাড়িটার দরজা খুলে গেল। রাণা অবাক হয়ে দেখল, গাড়ি থেকে অমল নামছে। তার মানে অমল এতক্ষণ গাড়িটায় ছিল?

রাণা যে ব্যালকনিতে আছে সেটা দেখেনি এখনও। অমল নামতেই গাড়িটা চলে গেল। অমল চোখের আড়াল হতে সঙ্গে সঙ্গে রাণা ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে ব্যালকনির দরজা বন্ধ করে ছোট ঘরে ঢুকে গেল। বাইরের দরজা খোলার শব্দ হল। ঘরের ভেতর অমলের চলে যাবার শব্দ।

রাণা চুপ করে শুয়ে পড়ল। এত রাতে অমল বাইরে গেছিল? চোখ খুলে ভাবতে ভাবতেই কখন যেন দুচোখে ঘুম নেমে এসেছিল তার।

ঘুম ভাঙল অমলের ডাকে, 'আরে ভাই ওঠ, আর কত ঘুমোবে? সকাল ন'টা বেজে গেল তো!'

ধড়মড় করে উঠে বসল রাণা। ন'টা বেজে গেল? অদ্ভুত তো! বহুদিন ন'টা অবধি ঘুমোয়নি সে। তবে কি পথের ক্লান্তিতেই, রাতে ঘুম ভাঙার পর এতক্ষণ ঘুমোল?

অমল বলল, 'ফ্রেশ হয়ে নাও। ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করছি।'

রাণা বলল, 'কোথাও বেরোবেন?'

অমল বলল, 'হ্যাঁ...বেরোব। তোমাকেও নিয়ে যাব। কয়েকটা জায়গা চিনতে হবে তোমাকে। ইন কেস, ইমারজেন্সি সিচুয়েশন অ্যারাইভস...' অমলের ফোন শব্দ করে উঠল।

অমল সচকিত হল, 'কেউ আসছে। সেন্সর বেজে উঠল।' অমল ফোনের স্ক্রিনে দেখে অবাক হয়ে গেল, 'সাদিক আসছে। এখানে চলে এল?'

কলিং বেল বেজে উঠল। অমল দ্রুতপায়ে গিয়ে দরজা খুলল। দরজায় আসগরকে নিয়ে সাদিক দাঁড়িয়ে আছে। হাসিমুখে বলল, 'এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম রুমানভাই, ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাই।'

অমল বলল, 'আসুন আসুন, ভিতরে আসুন।'

সাদিক আসগরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই গাড়িতে গিয়ে বোস।' আসগর একটাও বাক্যব্যয় না করে চলে গেল। সাদিক ঘরে ঢুকে সোফায় বসে বলল, 'গৌতমভাইয়ের পাসপোর্ট করাইতে হবে রুমানভাই। আমার একখান পার্সেল আনাইতে হইব।'

রুমান বলল, 'হ্যাঁ, আমি ওকে সেই কথাই বলছিলাম কাল রাতে।'

সাদিক রাণার দিকে তাকাল, 'আপনার কোন নাম পছন্দ ভাই? আপনি বলেন। যে নাম বলবেন, সেই নামে পাসপোর্ট বানায়ে দিমু।'

রাণা বলল, 'আপনার যে নাম পছন্দ আপনি সেটাই দিন।'

সাদিক অমলের দিকে তাকাল, 'দেখলেন মিয়াঁ, কী কয়? এই জন্যই ভাইরে আমার পছন্দ হইসে। কইরা দি তাইলে আমার খুশিতে?'

রুমান বলল, 'করে দিন। কোনও ব্যাপার না।'

১১

পড়ন্ত বিকেলের আলো পড়ছে কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে।

আলম হোসেন সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বসে আছে। স্নান করবে ভেবে এসেছিল। আর ইচ্ছে করেনি। সারাদিন বসেই কেটে গেল। মুখটা কেমন টক টক লাগছে। অ্যাসিড হয়েছে বোধহয়। অ্যাসিড হলে এরকম টক ভাব আসে।

দূরে একজন হেঁটে আসছে। তার দিকে চোখ পড়ায় আলম সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়াল। বিরক্ত মুখে সেদিকে চেয়ে রইল। ঈষৎ হেলে হাঁটা লোকটা সরাসরি আলমের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আদাব।'

বিরক্তভাব কিছুতেই যাচ্ছিল না আলমের। সে বলল, 'এখানে কী মরতেও আসতে দেবে না? কী হয়েছে?'

লোকটা বলল, 'সিগারেট এনেছি। নেবেন সাহেব?'

আলম বলল, 'দাও।'

লোকটা সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে উর্দু লেখা দেখে আলম বালিতে আবার বসে পড়ে বলল, 'বোস।'

লোকটা আলমের পাশে বসল।

আলম বলল, 'কোথায় গেছিলে রিয়াজ?'

রিয়াজ বলল, 'এক জায়গায় গেলে তো বলব। শুরুতে ডাকল করাচীতে। গিয়ে শুনি হুজুর লাহোর চলে গেছেন। আমি ছুটলাম লাহোরে। সেখানেও নেই। তারপর মুজফফরাবাদে গিয়ে দেখা হল।'

আলম প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। সিগারেটে লম্বা টান মেরে বলল, 'কী আদেশ এল?'

রিয়াজ বলল, 'আর না ঘুমিয়ে থাকার আদেশ এল।'

আলম মাথা নাড়ল, 'আচ্ছা। তুমি সমুদ্রে স্নান করবে? সাগর পারে আইসা তোমার মাতাল মাতাল লাগে না?'

রিয়াজ বলল, 'না। লাগে না। যতক্ষণ আমার ভাইরা কষ্টে আছে, ততদিন আমার কিছুই লাগে না।'

আলম বলল, 'আহ্। তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছ। তোমাকে এত উত্তেজিত হতে আমি বলিনি। আমি শুধু বলেছি স্নান করতে ভালো লাগে নাকি?'

রিয়াজ রাগী গলায় বলল, 'না, লাগে না। আমার কিছুই ভালো লাগে না। তবে মুজফফরাবাদ থেকে আমাকে একটা বিষয়ে জানতে চেয়েছে।'

আলম জোরে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কী?'

রিয়াজ বলল, 'সাদিক সেখ কক্সবাজারে একজন জেনানা নিয়ে এসেছিল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সে কোথায় আছে?'

আলম কয়েক সেকেন্ড থমকে গিয়ে আবার সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'সেটা আমি কী করে জানব? তুমি জানো না, ওরা এখানে কী হারাম কাজকর্ম করতে আসে?'

রিয়াজ বলল, 'আমি সব জানি। এও জানি সাদিক আপনার কাছে এসে ওঠে। আপনার বাসায় থাকে। এই এলাকার সব কিছু আপনার নখদর্পণে। তার পরেও সে মেয়ে গুম হয়ে গেল কী করে?'

আলম বলল, 'জানি না। আমাকে জরুরি কাজে চিটাগাং যেতে হয়েছিল সেদিন। সিসিটিভিতেও কিছুই পাওয়া যায়নি।'

রিয়াজ বলল, 'সিসিটিভি খারাপ ছিল। তাই না?'

আলম বলল, 'হ্যাঁ। খারাপ ছিল। ঠিক করা হয়েছে। আর আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, একটা বেশ্যা মারা যাওয়ার জন্য মুজফফরাবাদ এত চিন্তায় পড়ে গেছে কেন?'

রিয়াজ বলল, 'সেটাও জানতে পারবেন খুব শিগগিরি। তবে এর মধ্যে যদি আপনার কোনও ইনভলভমেন্ট পাওয়া যায়, তাহলে আমি জানি না আপনাকে কুরবানি হওয়া থেকে বাঁচাতে পারব কিনা।'

আলম রেগে গেল, 'তুমি আমাকে হুমকি দিচ্ছ? তোমার তো সাহস কম না'!

রিয়াজ বলল, 'আমার সাহস কমই। আমি শুধু আমার কম সাহসের কথাগুলোই আপনাকে বললাম সাহেব। আপনি জানেন, ওরা কী করতে পারে। সাদিক সেখ জেনানার বুকে মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে পারে, হুজুর কিন্তু তা করে না। তারা রেগে আছে। সাদিকের উপরে যতটা রেগে আছে, তার থেকে অনেক বেশি আপনার উপর রেগে আছে।'

আলমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। সে বলল, 'আমি কিছু জানি না বিশ্বাস করো। আমি চিরকাল হুজুরের পায়ের তলায় পড়ে আছি। আমি কোনও দোষ করব না।'

রিয়াজ বলল, 'সাদিকের এক নতুন পাখি এসেছে। তাকে চেনেন তো?'

আলম ঘাড় নাড়ল, 'ন-না...না। আমি চিনি না।'

রিয়াজ ঠান্ডা চোখে আলমের দিকে তাকিয়ে থাকল। আর কিছু বলল না। সমুদ্র থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া আসছে। তা সত্ত্বেও আলম দরদর করে ঘামতে শুরু করল...

১২

রাণার একটা অস্বস্তি হচ্ছে। প্রবল অস্বস্তি। কিন্তু কী হচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। বিরক্তিও লাগছে। সে কেন সাদিকের কথা শুনবে? অথচ না শুনে চললেও যে সমস্যা আছে, তা বোঝা যাচ্ছে।

সাদিক বলল, 'আজ যাইতে পারবেন গৌতমভাই?'

রাণা অবাক হল, 'আজকেই?'

সাদিক বলল, ‘হ্যাঁ। রাতের ফ্লাইট আছে ভাই। কুয়ালালামপুর। কী আছে কন? প্লেনে উঠবেন। পৌঁছাইবেন, থাকবেন, খাইবেন, খাম নেবেন, চলে আসবেন। আমি ভাবতেছিলাম রুমানভাইরে কমু, তারপর মনে হইলো এইডা ছোট কাজ। আপনার বিসমিল্লাহও হইয়া যাইব।’

রাণা অমলের দিকে তাকাল। অমল বলল, ‘আপনি না সাদিকভাই, শুধু চমক দেন। কাল বললেই পারতেন। তাহলে দোস্তো তৈরি হবার সময় পাইত। আসগররে পাঠায়ে দেন না।’

সাদিকের চোয়াল শক্ত হল। পরক্ষণেই হালকা গলায় জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, ‘আরে না রে ভাই। এক লাইন ইংলিশ বলতে আসগর হাইগা দিবো নে। আমার তো ওই ইংলিশ বলার লোকেরই অভাব। বোঝেন না মিয়াঁ?’

রাণা বলল, ‘ঠিক আছে। আপনি আমার পাসপোর্ট আর ভিসার ব্যবস্থা করে দিন। আমি ঘুরে আসব।’

সাদিক খুশি হয়ে বলল, ‘এই তো চাই। আপনি আমার লগে চলেন। আমার বাসায় থেকে আপনাকে তৈরি করায় দি।’

অমল বলল, ‘দুপুরে যাব তো ভাই। গৌতমভাইরে নিয়েই যাব। আপনি ব্যস্ত হবেন না।’

সাদিক বলল, ‘ব্যস্ত কী আর সাধে হই রে ভাই? একটার পর একটা কাজ যখন তখন চইলা আসে। আমার আর কী দোষ? দোস্তো সবে আইলো, কোথায় দেশ ঘুরামু, তা না, পাঠাইতে হইতাসে। আপনে ফিরে আসেন, আপনেরে নিয়া আমি কক্সবাজার যামু। সাকিনা ক্যান, সাকিনার থিক্যাও ভালো ভালো জিনিস নিয়া যামু।’

সাদিক চোখ মেরে উঠে দাঁড়াল, ‘রুমানভাই, ভাইরে নিয়া চলে আসবেন কিন্তু। খুব দরকার। আজ যাইতেই হইব।’

অমল বলল, ‘আপনি বললেন, সেটা হুকুম। নিশ্চিন্তে যান। আমরা দুপুরের মধ্যে চলে যাব।’

সাদিক বেরিয়ে গেল। অমল চিন্তিত হয়ে বসে পড়ে রাণাকে বলল, ‘তুমি পারবে?’

রাণা বলল, ‘ওর এত ইম্পরট্যান্ট কাজ, আমাকে কী করে বিশ্বাস করছে?’

অমল বলল, ‘বিশ্বাস করছে না। কাজটা এমন, যে তুমি ধরা পড়লে ওর ডিজওন করতে অসুবিধা হবে না। দিস ইজ এ ব্যাড সিচুয়েশন। উস্তাদের সঙ্গে কথা বলে নেবে?’

রাণা মাথা নাড়ল, ‘না। দরকার নেই। উনি কী বলবেন? সাদিককে যখন দরকার, তখন ওর কাজটা করব।’

অমল বলল, ‘ব্যাপারটা অত সোজা না। কাজ করার মধ্যেও অনেক সমস্যা আছে। জানিয়ে করতে হবে এ কাজ। সাদিক ইজ ভেরি ডিস্টারবিং। পিছনে লেগে আছে এঁটুলির মতো। তুমি ফ্রেশ হয়ে এস। আমি উপরমহলে কন্ট্যাক্ট করি।’

রাণা ফ্রেশ হয়ে এল বাথরুম থেকে।

অমল বলল, ‘সাদিকের কথা শুনে চলার ইন্সট্রাকশান এসেছে তোমার কাছে। যেরকম বলবে, সেরকম করতে হবে।’

রাণা বসল। বলল, ‘ঠিক আছে। আমি তৈরি।’

অমল বলল, ‘জিগশ পাজল দেখেছ? একটা একটা করে জুড়তে হয়। সাদিক একটা একটা করে লিংক জুড়ছে। এখন ওদের ঘুঁটি সাজাতে অসুবিধা হচ্ছে। প্রথমত, কাশ্মীরে কড়াকড়ি অনেক বেড়ে গেছে। ঠিক করে টেরর ফান্ডিং করতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, ডিজিটালাইজেশন বাড়ছে, সিসিটিভির যুগ চলে এসেছে। ওরা ফোনে কন্ট্যাক্ট করতেও ভয় পাচ্ছে। এখন ব্যাক টু ওল্ড এজে চলে গেছে সব। আগেকার দিনে ঘোড়ায় করে খবর দিতে যেত। এখন ধরে নাও সেই প্রচলনটাই আবার শুরু হয়েছে। সাদিক আমাদের ঘোড়া

হিসেবে ব্যবহার করছে। যেই মুহূর্তে ওরা আমাদের অরিজিন জানবে, আশা করি বুঝতে পারছ তখন কী হতে পারে!'

রাণা বলল, 'কিন্তু এসব কাজে এক্সটেনসিভ ব্যাকগ্রাউন্ড চেকিং করে ওরা। আপনি এত বিশ্বস্ত হলেন কী করে?'

অমল বলল, 'সময় লেগেছে। সেভাবে কভার তৈরি করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে একটাই অ্যাডভান্টেজ ছিল আমার। সাদিকের এ কাজ করার মতো লোক নেই। বিশ্বাস একদিনে তৈরি হয় না। ওই বাড়িটা তৈরি করতে প্রতিটা ইট মূল্যবান। তুমি যেমন প্রথমেই ওর কাছে চলে গেছ, আমি পারিনি। সময় লেগেছে। এখন টার্গেটের এত কাছে এসে গেছি, আর রিস্ক নেওয়ার কথা ভাবতে পারছি না।'

রাণা মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। দেখা যাক কী হয়...।'

১৩

জাহির হোসেন বসে আছেন ওয়েটিং রুমে। টিভি চলছে। এসির তাপমাত্রা শীতলতম। জাহিরের ঠান্ডা লাগছে। অ্যালার্জি হয়েছে। নাক কুঁচকে হাঁচি আসতে পারে যেকোনও সময়। জাহির এটাই ভয় পাচ্ছেন। একবার হাঁচি দিতে শুরু করলে হাঁচি আসতেই থাকবে। একটার পর একটা হাঁচি শুরু হয়ে যাবে। সেটা যদি ম্যাডামের ঘরে ঢোকার পর শুরু হয়ে যায়, তাহলে বিপদের শেষ থাকবে না।

জাহির প্রাণপণে অন্য কথা ভাবছেন। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট টিম খেলতে এসেছে। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের খেলা আছে। জাহির ভাবছেন, কী কী করলে শ্রীলঙ্কাকে হারানো যেতে পারে। মাথায় অন্য কথা এলে হাঁচিটা ডিরেইল হবার চান্স থাকে।

এত চেষ্টা করেও অবশ্য কোনও লাভ হল না। জাহিরের হাঁচি শুরু হল। ভয়াবহ হাঁচি। একটার পর একটা হয়েই যাচ্ছে। রুমাল বের করলেন। নাক দিয়ে শব্দ আটকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

'আপনি মাস্ক পরে আসেন।'

ম্যাডামের আপ্তসহায়ক এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায়। জাহির উঠলেন। মাস্ক পরে নিলেন। হাঁচিটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

ফাইল হাতে জাহির বড় ঘরটায় ঢুকলেন। দেওয়ালে জাতির পিতার ছবি টাঙানো। জাহির কয়েক সেকেন্ড দেখলেন।

'এস। খুব ব্যস্ত হয়ে এসেছ বুঝতে পারছি। অ্যালার্জির খবর কী তোমার?' ম্যাডাম সস্নেহে বললেন।

ম্যাডাম বসতে বলেননি, জাহিরের খেয়াল ছিল না। আগে বসে পড়েছিলেন। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ালেন, 'এক্সট্রিমলি সরি ম্যাডাম, আপনি বসতে বলেননি, তাও বসে পড়লাম।'

ম্যাডাম বললেন, 'ধুর, তুমি আমার সাথে ফর্মালিটি করছ কেন? বোস বোস। লজ্জা দিও না। কী খবর এনেছ বল।'

জাহির বললেন, 'ম্যাডাম করিডর থার্টি টু নড়বড় করছে। খবর ভালো না।'

ম্যাডাম চিন্তিতমুখে বললেন, 'সে কী?'

জাহির বললেন, 'হ্যাঁ ম্যাডাম। অনেক অনুপ্রবেশকারী আসছে শোনা যাচ্ছে।'

ম্যাডাম বললেন, 'পাকিস্তানিই তো? মিডল ইস্ট কিংবা সিরিয়ার লোক না তো?'

জাহির বললেন, 'না ম্যাডাম। আইসিস আছে, তবে স্লিপার সেল হিসেবে। এখানে আই এস আই-ই অপারেট করে যাচ্ছে। রাজাকার বিরোধী লিস্ট তৈরি করার খবরটাও বেরিয়ে গেছে। কোনও খবরই চাপা

থাকছে না আর কী!'

ম্যাডাম বললেন, 'যা করতে হয় করো। ভোটের অজুহাতে এ হবে আমি জানতাম। কোনটাই ভাবিনি, এমন নয়।'

জাহির বললেন, 'বিরোধী পক্ষ ভোট চায়। তাদের দিকে পাল্লা ভারি। সেটাও একটা সমস্যা।'

ম্যাডাম বললেন, 'ভোট চায়, ভোট হবে। চিন্তার কিছু নেই। আমার কথা হল, এসবের অজুহাতে আবার একটা হোলি আরটিজান হবার ঝুঁকি আমি নিতে পারব না।'

জাহির বললেন, 'লড়াই জারি আছে ম্যাডাম। তাছাড়া আপনার সিকিউরিটিও জোরদার করার ব্যাপারে বলে দিয়েছি।'

ম্যাডাম বললেন, 'ওসব ভয় পাই না। যার পরিবারের বেশিরভাগ মানুষ রাজাকারদের হাতে মরেছে, সে যখন আবার একই পথে এসেছে, তার অত ভয় মানায় না।'

জাহির বললেন, 'না ম্যাডাম, থ্রেট আছে। আমি রিস্ক নেব না।'

ম্যাডাম হাল ছেড়ে দিলেন, 'ঠিক আছে। তুমি তোমার মতো করে এগিয়ে যাও। প্রয়োজনে ব্যাপকহারে ধরপাকড় শুরু করো। র আর কিছু ইনপুট দিয়েছে?'

জাহির বললেন, 'না। তবে অন্য একটা জায়গা থেকে শুনেছি, র-এর অন্য একটা উইংস এখন এ-দেশে অপারেট করছে। তারা অন্য ধরনের। নিষ্ঠুর টাইপ।'

ম্যাডাম ভ্রু কুঁচকালেন, 'নিষ্ঠুর টাইপ মানে?'

জাহির বললেন, 'যেন তেন প্রকারেণ কাজ আদায় করাটাই ওদের লক্ষ্য। এথিকস মানে না। এই ইউনিট নিয়ে ঝামেলা আছে। এরকম কোনও ইউনিট ঢাকায় সক্রিয় হওয়া আমাদের জন্য সুবিধের হবে না।'

ম্যাডাম মাথা নাড়লেন, 'ইন্ডিয়ার সঙ্গে কথা বলছি। আমরা তো আলোচনার দরজা সব সময় খোলা রেখেছি। এখানে ওদের সমস্যা হবার কথা না। কথা কি?'

জাহির হাসলেন, 'না ম্যাডাম।'

ম্যাডাম বললেন, 'নিজের খেয়াল রাখো।'

জাহির ঘাড় নাড়লেন, 'জি ম্যাম।'

জাহির উঠতে যাচ্ছিলেন, ম্যাডাম বললেন, 'সাদিক শেখ নামে কাউকে চেন?'

জাহির থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'না ম্যাডাম।'

ম্যাডাম কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকে। এস। খোদা হাফেজ।'

১৪

এহসান খান। রাণার পাসপোর্টের নাম। এই নামে ভিসাও করে দিয়েছে সাদিক। কী করে করেছে সেটা জানা সম্ভব না। তবে দুরুদুরু বক্ষে রাণা আবিষ্কার করল সব মসৃণভাবে হয়ে গেল। প্লেনে বসে সে দেখল পাঁচটা সিট দূরে আসগর বসে আছে। সে অবাক হল। এ কথা তো ছিল না। কথা ছিল কাজ হয়ে গেলে সে ফিরে আসবে। সাদিক আবার আসগরকে পাঠাল কেন?

বিরক্ত মুখে আসগরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। আসগর তার দিকে তাকাল না। মাথা নিচু করে ঘুমনোর ভান করছে।

রাণার মনে হল, অমল আর সাদিক আসগরের মাধ্যমে তাকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করছে না তো? নাহ্, যা হবে দেখা যাবে। বিমান সেবিকাদের ইন্সট্রাকশান অনুযায়ী বেল্ট বেঁধে নিল সে।

প্লেন যখন টেক অফ করল, তখন ঢাকার সময় রাত সাড়ে বারোটা। কুয়ালালামপুর পৌঁছতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে। রাণা চোখ বুজল।

ঘুমের মাঝে অবশ্য একবার সে দেখে নিল আসগরও ঘুমোচ্ছে। ঘুমোতে ঘুমোতে পাশের প্যাসেঞ্জারের গায়ে পড়ে যাচ্ছে।

কুয়ালালামপুর পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল। পাসপোর্টটা আরেকবার দেখে নিল রাণা। এখানে তো আর ঢাকার পুলিশ নেই! সাদিকের লোকজনও নেই। এখানে ধরা পড়লে সমস্যা হবে। মরতে ভয় পায় না সে, তবে আজীবন কোনও বদ্ধ কুঠুরিতে আটক হয়ে থাকতে তার আপত্তি আছে।

মজার ব্যাপার হল, কুয়ালালামপুরেও কোনও অসুবিধা হল না। ইমিগ্রেশন পেরিয়ে সে দিব্যি এয়ারপোর্টের বাইরে বেরোতে পারল। লাইনে আসগর অনেকটা পেছনে ছিল। আসগর বেরোনোর আগেই সে বেরিয়ে গেল।

সাদিক বলে দিয়েছিল ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে চেক ইন করতে। রাণা একবার ভাবল আসগরের জন্য অপেক্ষা করবে।

পরক্ষণে সে প্ল্যান ক্যান্সেল করল। আসগর যদি তাকে ফলোই করে, তাহলে সাদিকের সেটা তাকে বলা উচিত ছিল। বলেনি যখন, তখন আসগর কী করবে, সেটা দেখার দায়িত্ব তার নয়। তড়িঘড়ি একটা ক্যাবে উঠে বলল, 'আমাকে কাছাকাছি কোনও একটা পিসিওতে নিয়ে চলো।'

কুয়ালালামপুর আধুনিক শহর। দিনের ব্যস্ততা এখনও শুরু হয়নি। ক্যাব ড্রাইভার একটা পিসিওর সামনে দাঁড়াতে ক্যাব থেকে নেমে লোকটার নাম্বারে ফোন করল সে। রিং হতেই ও-প্রান্ত থেকে ফোন ধরল লোকটা, 'স্পিকিং।'

রাণা বলল, 'সাদিক আমাকে কুয়ালালামপুর পাঠিয়েছে।'

'জানি। অমলের সঙ্গে কথা হয়েছে।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। অমল এত অসংখ্য ব্যাপারে জড়িয়ে আছে, আমাকে ঠিক কোন পথে এগোতে হবে, কত তাড়াতাড়ি সব কিছু জানতে পারব, তার কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সেটাই স্বাভাবিক। ওখান থেকে কখন বেরোবে?'

'একটা ঠিকানা দিয়েছে। দুপুরে ওই ঠিকানা থেকে একটা খাম নিয়ে ফিরব। এর মধ্যে সাদিক ওর একটা সাগরেদকে পেছন পেছন পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'ও কি এখনও তোমাকে ফলো করছে? ফোন করতে দেখছে?'

'না। ওকে কাটিয়ে চলে এসেছি। তবে আমি কোন হোটেলে যাব, ও জানে। আমায় কি এভাবেই এ দেশ সে দেশে ঘুরে বেড়াতে হবে?'

'তোমার যতক্ষণ না মনে হচ্ছে তুমি প্রস্তুত, ততক্ষণ তাই করতে হবে। আর যেকোনও আনপ্রোটেক্টেড নাম্বার থেকে এভাবে ফোন করার দরকার নেই।'

'শুনুন শুনুন।'

'বলো।'

'মাঝরাতে অমল বেরিয়েছিল। একটা গাড়ি এসেছিল।'

'ওকে। বাই।'

রাণা বিরক্ত হয়ে ফোন কেটে দিল। লোকটা ইচ্ছে করে তাকে এরকম একটা পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছে। ক্যাবে উঠে বসে সে বিরক্ত গলায় ড্রাইভারকে বলল, 'হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল।'

বস্তি অঞ্চলে হোটেলটা। সরু রাস্তার পাশে স্যাঁতস্যাঁতে একটা ছোট হোটেল।

রিসেপশনে তার পাসপোর্ট দেখাতে ঘরের কার্ড পেয়ে গেল রাণা। ছোট একটা ঘুপচি হোটেল। ঘরগুলো অপরিষ্কার।

বিরক্ত মুখে ঘরে ঢুকে সোফায় বসল সে। দুপুর অবধি অপেক্ষা করতে হবে।

টিভি আছে। বেশ কিছুক্ষণ টিভি দেখল সে। সকাল দশটা নাগাদ ফোনে মেসেজ টোন বেজে উঠল।

ঠিকানা এসেছে। শ্বাস ফেলল সে। যাক, দুপুর অবধি অপেক্ষা করতে হবে না।

হোটেল রুম তালা বন্ধ করে রাস্তায় নামল রাণা। ঠিকানাটা বার্ড পার্কের টিকিট কাউন্টারের দেওয়া হয়েছে।

রোদ উঠছে। তবে আকাশে বেশ খানিকটা মেঘ আছে। বৃষ্টি হতে পারে। রাণা চারদিকে দেখল।

কোনও বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে যদি তাকে নজরে রাখে, তাহলে সেটা দেখা সম্ভব না। রাণা ঠিক করল আসগরকে খুঁজে সময় নষ্ট করবে না।

ইদানীং তার সঙ্গী আগ্নেয়াস্ত্রটিকে বড় মিস করছে রাণা। যন্ত্রটা সঙ্গে না থাকলে নিরাপত্তাহীনতা চলে আসে। সঙ্গে থাকলে মনে হয় সে যা ইচ্ছে করতে পারে। কেউ তাকে আটকাতে পারবে না।

হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাব ড্রাইভারকে জিগ্যেস করল, বার্ড পার্ক যাবে নাকি। ড্রাইভার বলল, গাড়িতে উঠে বসতে। রাণা গাড়িতে উঠে বসল।

তার ফোনে আরেকটা মেসেজ এল। মেসেজে শুধু লেখা, ৩ নাম্বার বেঞ্চ, কোড তাজমহল।

রাণা শ্বাস ছাড়ল। কী কুক্ষণে যে এসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল সে।

বস্তি পেরোতেই আবার ঝাঁ চকচকে শহরের রাস্তায় নামল গাড়িটা। কোনও শহরেরই বাইরের রূপ দেখে বোঝা যায় না, সে শহরের বস্তিবাসীরা কীভাবে জীবনধারণ করছে। ঝাঁ চকচকে শহুরে আলোর তলায় ঢাকা পড়ে থাকে এসব অন্ধকারময় রাস্তাগুলো।

রাণার হঠাৎ করে মনে হল, সে যদি এই শহরে হারিয়ে যায়, তাহলে সাদিক বা উস্তাদ কিংবা অমল, কেউই তাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু সে এখানে বেঁচে থাকবে কী করে? কিচ্ছু চেনে না সে। সাদিক নিশ্চয়ই এর পরে তাকে এমন কোনও শহরে পাঠাবে যেখানে সে অনায়াসে হারিয়ে যেতে পারে।

এরকম কোনও শহরে তাকে গা ঢাকা দিতে হবে। দেশপ্রেমী হোক কিংবা দেশদ্রোহী, এদের ধরার কাজ তার নয়। সে পারবে না। এই দু-তিন দিনেই কেমন অস্বস্তি লাগছে। এরকম জীবন সে চায় না। চায়ওনি কোনওদিন।

বার্ড পার্কের সামনে পৌঁছতে এগারোটা বেজে গেল।

টিকেট কাউন্টারের সামনে পর পর পাঁচটা বসার বেঞ্চ আছে। প্রত্যেকটাতেই নম্বর দেওয়া। রাণা মেসেজটার কথা মাথায় রেখে তিন নম্বর বেঞ্চে বসল। বাকি কোনও বেঞ্চেই কেউ বসেনি। টিকেট কাউন্টারে ট্যুরিস্টদের লাইন শুরু হয়েছে।

প্রায় ছ ফুট লম্বা এক বোরখা পরিহিতা মহিলা তার পাশে এসে বসে বলল, 'মহল।'

রাণা কোনও কিছু না ভেবেই বলল, 'তাজমহল।'

মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। কোনও খাম বা কিছু ফেলে গেল না। রাণা কী করবে বুঝতে না পেরে ফলো করল।

একটা লাল রঙের সেডান দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। মেয়েটা সেটায় উঠে দরজা খোলা রেখে দিয়েছে। কিছু না ভেবে রাণা সেটায় উঠে পড়ল। মেয়েটা প্রায় তার গায়ের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

গাড়ি স্টার্ট হল। রাণা প্রস্তুত ছিল না একবারেই। মেয়েটা হ্যান্ডব্যাগে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট বোতল বের করে রাণার মুখে কিছু একটা স্প্রে করতেই রাণা জ্ঞান হারাল।

১৫

'উঠো বিসি, টাইম হো গয়া, উঠো।' চোখে জলের ছিটে দিলে কেউ। রাণা কোনমতে চোখ খুলল।

সামনে অপরিচিত একজন লোক বসে আছে। তার পাশে আসগর।

লোকটা উর্দুতে বলল, 'অনেক বেশি সাবধানে থাকতে হবে। দু'মিনিটের মধ্যে ধরা পড়ে গেলে তুমি।'

রাণা বলল, 'আপনি কে?'

লোকটা বলল, 'বাঃ। যার কাছে এসেছ, তাকেই চেনো না?'

রাণা বলল, 'আমি জানতাম না আমাকে কার কাছে পাঠানো হয়েছে। আমাকে শুধু বলা হয়েছিল একটা পার্সেল নিয়ে ফেরত যেতে হবে।'

লোকটা আসগরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসব লোক জোগাড় করে সাদিক?'

আসগর দুলে দুলে হাসছে। বোঝা যাচ্ছে তার বেশ রগড় হয়েছে।

রাণার রাগ হচ্ছিল। যদিও সে শান্ত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

লোকটা বলল, 'যাও। ফ্লাইটের টাইম হয়ে গেছে। একটা কাজও যদি ঠিক করে করতে পারে। বুরবক।'

এবারও রাণা নিজেকে সামলাল। কোনওমতে উঠে দাঁড়াল। লোকটা একটা ছোট ব্যাগ বের করে রাণার দিকে এগিয়ে দিল, 'পাসপোর্ট, টিকেট সব আছে। যাও। আমার একটু দেখার দরকার ছিল সাদিকের লোক কতটা সতর্ক। আমার দেখা হয়ে গেছে।'

রাণা ব্যাগ নিয়ে আসগরের দিকে তাকাল। আসগর অন্য দিকে তাকিয়ে আছে।

রাণা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল এটা আসলে একটা হোটেল রুম। ঘুম ঘুম ভাব আসছে একটা। না দাঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে ক্যাবে উঠে বলল, 'এয়ারপোর্ট।'

গাড়ি চলতে শুরু করলে সে প্রাণপণে নিজেকে সামলাল। ইচ্ছে হচ্ছে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে লোকটাকে উড়িয়ে দেয়। এত সাহস! ওকে টেস্ট করছিল!

মাঝরাতে ঢাকা পৌঁছল সে। অমল দাঁড়িয়ে ছিল এয়ারপোর্টে। গাড়িতে উঠতেই বলল, 'কী হল?'

রাণা বলল, 'আমাকে গাড়িতে তুলে বেহুঁশ করে দিয়েছিল। পরে জানা গেল সেটা নাকি আমাকে টেস্ট করার জন্য করেছে। আমার কী করা উচিত এখন?'

অমল হাসল, 'রাগ হচ্ছে?'

রাণা বলল, 'সেটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। আচমকা অপমান করার অধিকার তো কারো নেই, তাই না?'

অমল বলল, 'ওদের অনেক অধিকার আছে। যত তাড়াতাড়ি জেনে নিতে পারো, তত ভালো। পার্সেল কোথায়?'

রাণা বলল, 'আমাকে কিছু দেয়নি তো! আসগরকে দিয়েছে।'

অমল অবাক হয়ে বলল, 'তোমাকে দেয়নি? উফ্...ওটা তো তোমার কাছেই থাকার কথা ছিল! এই পার্সেলেই তো সব শহরগুলোর মধ্যে লিংকের কাজ করত।'

রাণা বলল, 'আমায় অজ্ঞান করে দিয়েছিল। জ্ঞান ফিরতে ব্যাগ ধরিয়ে দিল...' বলতে বলতে টনক নড়ল রাণার। তড়িঘড়ি হ্যান্ডব্যাগ বের করল। একটু ঘাঁটতেই একটা খাম পাওয়া গেল। বলল, 'পেয়েছি।'

অমল খুশি হল, 'গুড। দাঁড়াও।'

রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল অমল। খামটা হাতে নিয়ে সন্তর্পণে খুলল।

জোরে জোরে পড়ল, 'মার্ক সেভেন ফাইভ ডট।'

তারপর সেটা বার বার আওড়াতে থাকল, 'মার্ক সেভেন ফাইভ ডট...মার্ক সেভেন ফাইভ ডট।'

রাণা অবাক হয়ে বলল, ‘এটা কী?’

অমল বলল, ‘কোড। এখন মুখস্ত করে নিই। বাড়ি গিয়ে ঠান্ডা মাথায় ডিকোড করব। দাঁড়াও। খামটা আবার আগের মতো করে দি।’ অত্যন্ত সন্তর্পণে খামটা বন্ধ করল অমল।

রাণা বলল, ‘মালয়েশিয়ায় কে থাকে? আমি একদিন না একদিন ওর হিসেব করব। আমাকে অজ্ঞান করবে কেন?’

অমল বলল, ‘হিসেব সবার হবে রাণা। তার জন্য সঠিক সময় আসবে। আপাতত জেনে রাখো মালয়েশিয়ায় তোমার সঙ্গে যার দেখা হয়েছিল, তার নাম জামিল পাশা। ইন্ডিয়ার মোস্ট ওয়ান্টেড টেরোরিস্ট। বেশ কয়েকটা ব্লাস্টে অভিযুক্তের তালিকায় ওর নাম আছে। সাদিক জামিলের কাছে শিশু। ভুল বললাম। শিশু বললেও কম বলা হবে। জামিল হিউম্যান ট্রাফিকিঙে যুক্ত। শিশু হোক, মেয়ে হোক, ওর কোনও মায়া-দয়া নেই।’

রাণা জানলার বাইরে তাকাল। এতদিন এ ধরনের লোককে সে না জেনে মারত। এখন সব জানার পর মনে হচ্ছে কবে মারতে পারবে...!

১৬

ঢাকা ব্যাব দফতর

নির্মল সরকার কম্পিউটারে গেম খেলছে। ফোন বাজল। ধরতেই গলা ভেসে এল, ‘আমার চেম্বারে এস।’

নির্মল গেম বন্ধ করে তাড়াতাড়ি আনোয়ার আলির চেম্বারে গিয়ে নক করল।

আনোয়ার বললেন, ‘এস।’

নির্মল চেম্বারে ঢুকল। আনোয়ার বললেন, ‘কক্সবাজারে একটা লাশ পাওয়া গেছে। আলম হোসেন নাম।’

নির্মল বলল, ‘হ্যাঁ স্যার শুনেছি।’

আনোয়ার বললেন, ‘যে বুলেটটা ইউজ হয়েছে, সেটা মামুলি বুলেট না। এ দেশের ছোটখাটো গ্যাংস্টারদের পক্ষে এ রিভলভার ইউজ করা সম্ভব না। অটোমেটিক জিনিস। সাইলেন্সার আছে। বুঝলে?’

নির্মল বলল, ‘নরওয়ের একটা মডেল আছে স্যার। ওটা ইউজ করেছে তার মানে।’

আনোয়ার মাথা নাড়লেন, ‘হ্যাঁ, তাই দাঁড়ায় বটে। তা তুমি আমাকে একটা কথা বলো, এই আলম কত বড় গ্যাংস্টার ছিল যে তাকে মারতে এত দামি রিভলভার ইউজ করা হল?’

নির্মল বলল, ‘ছোটখাটো কাজ করত স্যার। লোকাল লোক। মূলত টেক্সটাইলের ব্যবসা করত।’

আনোয়ার বললেন, ‘সেটা তো পানির উপরিভাগ। তলদেশে কী আছে, সেটাও তো দেখতে হবে। রেকর্ড ক্লিন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু হতে পারে সে গভীর পানির মাছ।’

নির্মল বলল, ‘ঠিক স্যার। আমাকে কী করতে বলছেন স্যার?’

আনোয়ার বললেন, ‘ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে যাতায়াত করা গাড়িগুলোর ডিটেলস বের করে ফেলো, আলমের বংশলতিকা। কতক্ষণ লাগবে?’

নির্মল বলল, ‘একদিন।’

আনোয়ার মাথা নাড়লেন, ‘না। একদিন না। বহিঃশত্রুর আক্রমণের কেস যদি হয়, তবে আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। উই হ্যাভ টু অ্যাক্ট অ্যাজ আরলি অ্যাজ পসিবল।’

নির্মল বলল, ‘ওকে স্যার।’

আনোয়ারের চেম্বার থেকে ব্যাজার মুখে বেরোল সে। আজ তাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি ছিল। দীপা বসে থাকবে। দীপাকে ফোন করতে ইচ্ছে করছে না এখন। ফোন করলেই গম্ভীর হয়ে যাবে। ওর মুড অফ হয়ে যাবে। দীপার মুড অফ হলে মাথা ধরে যায়, সে আরেক সমস্যা।

আইটি ডিপার্টমেন্টে ফোন করে সিসিটিভি ফুটেজ আনাল সে। কাজ করতে করতেই অবশ্য অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল নির্মল। দীপাকে না জানালেও সমস্যা হতে পারে। তৈরি হয়ে বসে থাকবে।

দীপার কথা ভাবতে ভাবতে একটা সময় ফুটেজে মগ্ন হয়ে গেল সে। ঢাকা 'ভ ৩৪১২' নম্বরের একটা গাড়ি সৈকতের বাইরের রাস্তায় ভোরবেলা ঘোরাফেরা করছে। এইটুকুই দেখা যাচ্ছে। ভেহিকেলসে নাম্বারটা পাঠিয়ে দিল নির্মল।

আলমের ফোন রেকর্ড বের করল সে। তেমন কিছুই নেই।

'স্যার, খুব কম ফোন করত আলম। আজকালকার দিনে কেউ এত কম ফোন করে নাকি কে জানে!'

'বিদেশে ফোন গেছিল?'

'না। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় ও স্যাটেলাইট ফোন ইউজ করত।'

অবাক হয়ে আনোয়ার বললেন, 'বলো কী? এটুকু ব্যবসায়ী, সে স্যাটেলাইট ফোন ইউজ করতে যাবে কেন? ওসব কারা ইউজ করে জানো তো?'

নির্মল বলল, 'স্যার যাকে খুন করতে বিদেশি বুলেট ব্যবহার হয়, সে চোখের আড়ালে অনেক কিছুই করতে পারে। এতে তো অবাক হবার মতো কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না।'

আনোয়ার চিন্তিতমুখে নির্মলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গন্ধটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে তোমার?'

নির্মল বলল, 'হ্যাঁ স্যার। তদন্ত শুরু করা উচিত। একে সুবিধার লাগছে না।'

আনোয়ার বললেন, 'কী করতে বলছ তুমি?'

নির্মল বলল, 'লোকাল থানা আপাতত ওর পরিচিতদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আমরা যদি সন্দেহজনক কিছু দেখি, তখন তাদের তুলে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা ঠিক হবে।'

আনোয়ার বললেন, 'তাই করো। দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

নির্মল বলল, 'ওকে স্যার।'

আনোয়ার সাহেবের চেম্বার থেকে বেরিয়ে নির্মল দীপাকে ফোন করল। দীপা ফোন রিসিভ করল না।

নির্মল ঠোঁট কামড়ে আবার তার ডেস্কে গিয়ে বসল। আজ রাতে আর তার বাসায় ফেরা হবে না। অনেক ভেবে দীপাকে মেসেজ করেই দিল সে।

আলমগির একটু দূরে বসে ছিলেন। নির্মলকে দেখে বললেন, 'কী হল? টেন্সড মনে হচ্ছে?'

নির্মল লাজুক হাসল, 'দাম্পত্য কলহ।'

আলমগির বললেন, 'স্বাভাবিক, ছুটি নেওয়া হয় না। এ তো হবেই। বেশ কয়েকটা সন্ত্রাসীকে টার্গেটে রেখেছি আমরা। সব ক'টা না ধরলে ছুটিও পাবে না।' কপট দুঃখ দেখিয়ে হাসলেন আলমগির।

১৭

'আমি মাফ চাইতাসি ভাই। আমি বুঝি নাই জামিলভাই রাইগা যাইব।'

সাদিক যেভাবে তাকে কথাটা বলল, তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয়। রাণা বলল, 'ঠিক আছে। আপনি কী করবেন?'

আসগরকে ডাকল সাদিক। লোক দেখানো বকাবকি শুরু করে দিল। আসগর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মিনিট পরে সাদিক বলল, 'ভাইজান, আজ বিশ্রাম করেন, সারাদিন আমি আর জ্বালামু না। আর কিছু টেকা রাখেন।'

একটা মোটা খাম রাণার দিকে এগিয়ে দিল সাদিক। রাণা খামটা নিল।

সাদিক বলল, 'বোঝেনই তো মিয়াঁ, আমাগো কামে বিশ্বস্ত লোকের দরকার হয়। আপনার তো তাও ভালো। আসগররে জামালভাই যা করসিলো, তা যদি আপনারে বলি, আপনি তো হয়রান হইয়া যাইবেন। ইলেকট্রিক শক দিসিল ভাই।'

শরীর দুলিয়ে হেসে উঠল সাদিক।

অমল বলল, 'ভাই আমরা তাহলে উঠি। অনেক রাত হয়েছে।'

সাদিক ভ্রু কুঁচকে বলল, 'সে কী ভাই, খাইয়া যাইবেন না? খাইয়া যান। না খাইলে এত রাতে কোথায় খাবার পাইবেন? এই আসগর, তোর ভাবিরে বল বিরানি গরম করতে। খাইয়া না গেলে হয় কন? চলেন, টেবিলে চলেন।'

অমল বলল সে খেয়ে এসেছে। সাদিক জোর করে রাণাকে নিয়ে গেল। বিরিয়ানি বিন্দুমাত্র গরম করে দেয়নি। ফ্রিজ থেকে বেরোনো ঠান্ডা বিরিয়ানি। রাণা খানিকটা খেয়ে ফেলতে যেতেই সাদিক বলল, 'খাইয়া নেন ভাই। খাবার ফেলাইতে নাই।'

রাণার অস্বস্তি লাগছিল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল সে। বেসিনে মুখ ধুতে ধুতে দেখল সাদিক তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'ভাই, সিক্রেট কামে বাইরে যাইতাসেন। মাইয়া ছেলে দেখলেন, পিছন পিছন চইলা গেলেন, এভাবে কী হইব? শেখেন, ভালো কইরা কাম শেখেন।'

রাণার মাথা গরম হচ্ছিল। সে কিছু বলল না। সাদিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অমলের গাড়িতে উঠে সে রাগে ফেটে পড়ল, 'আপনি ইচ্ছে করে আমাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, তাই না? আমাকে হ্যারাস করতে?'

অমল অবাক হল, 'সে কী? কেন?'

রাণা বলল, 'সেটা আমি কী করে জানবো? আপনি ওকে বলে দিতে পারতেন আমি যাব না।'

অমল বলল, 'আমি তো চেষ্টা করেছিলাম। তুমি দেখেছিলে!'

রাণা গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আপনি আমায় একটা কিছু জোগাড় করে দিন। সাদিককে আমি উড়িয়ে দেব। ওকে দেখলে আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে।'

অমল হেসে ফেলল, 'আরে, এটা কি এত সোজা কোনও ব্যাপার? সাদিক কত বড় মাছ, সে খেয়াল আছে? মাথা গরম করলে এ কাজ কিন্তু ভীষণ কঠিন হয়ে যাবে।'

রাণা বলল, 'ও আমাকে টার্গেট করেছে। এমনভাবে ট্রিট করছে আমি যেন ওর বাবার চাকর।'

অমল বলল, 'সেটা তো ভালো। তার মানে ও তোমাকে বিশ্বস্ত ভাবছে। ওর সবথেকে কাছের চামচা আসগর। ওকে ও এতো বিশ্বাস করে যে যা ইচ্ছে তাই বলতে পারে, তুমিও সেরকম হয়ে যাচ্ছ।'

রাতের ঢাকা শহরে অমল গাড়ি চালাচ্ছিল। রাণা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, 'আমি এভাবে পারব না। আমার সমস্যা হয়। আসগর কোথায় থাকে? আমি আসগরকে ওড়াব। শুয়োরটা সব জেনে আমাকে ওই সিচুয়েশনে ফেলেছিল।'

অমল ব্রেক চেপে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। ঝাঁকুনি খেলো রাণা। অমল বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

রাণা বলল, 'মাথা খারাপ হয়নি। আমি এভাবেই কাজ করি। আসগরকে এই মুহূর্তে না ওড়াতে পারলে আমি কনসেনট্রেট করতে পারব না। আপনি জানেন ও কোথায় থাকে?'

অমল বলল, 'আজ হয়তো সাদিকের বাড়িতেই থাকবে। কাল পুরান ঢাকায় যেতে পারে।'

রাণা বলল, ‘আপনি লোকেশন কনফার্ম করুন। আমি ওকে ওড়াব।’

অমল রাস্তার দিকে মুখ করে কিছুক্ষণ বসে রইল।

রাণা অধৈর্য হয়ে বলল, ‘কী হল?’

অমল বলল, ‘ঠিক আছে। আসগরকে ওড়াতে পারো, তবে সাদিক জানলে কিন্তু তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না।’

রাণা বলল, ‘সেটা আমার উপর ছেড়ে দিন। আপনি ওকে লোকেট করুন।’

অমল মাথা চুলকোতে চুলকোতে হেসে ফেলল, ‘আচ্ছা পাগল পাঠিয়েছে তো উস্তাদ। বলে না মারলে কনসেনট্রেট করতে পারবে না। ঠিক আছে। দেখা যাক।’

১৮

ফ্ল্যাটে পৌঁছে অমল ঘড়ি দেখল, ‘সাড়ে তিনটে। তোমার যন্তরের ব্যবস্থা করি। তুমি রেস্ট নেবে, না যাবে?’

রাণা বলল, ‘যাব।’

অমল ফোন বের করল, ‘হ্যাঁ, আমি এসেছি।’

ফোন কেটে বলল, ‘চলো।’

দুজনে নামল। ফ্ল্যাটের উল্টোদিকে একটা বাইক দাঁড়িয়ে আছে। অমল সন্তর্পণে চারদিক দেখে বাইক আরোহীকে বলল, ‘আনসস?’

‘হ ভাই। এই যে।’

কাপড়ে মুড়িয়ে একটা রিভলভার অমলের হাতে তুলে দিল লোকটা। অমল সেটা নিয়ে বলল, ‘তুই যা। কাল আমারে খবর দিবি আসগর কোই আছে। ঠিক আছে?’

‘জি ভাই।’

ফ্ল্যাটে এসে অমল রাণার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি আরেকবার ভেবে নাও। দরকার হলে উস্তাদের সঙ্গে কথা বলে নাও।’

রাণা বলল, ‘এই ব্যাপারে আমি কারো সঙ্গে কথা বলব না।’

অমল কালো কাপড়ে মোড়া রিভলভারটা টেবিলে রেখে বসে রইল। মেসেজ টোন বাজল তার ফোনে। বলল, ‘আসগর বেরিয়েছে। মগবাজারের ফ্ল্যাটে যাচ্ছে সম্ভবত।’

রাণা বলল, ‘তাহলে এখনই যাব।’

অমল রাণার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ভোর হয়ে যাবে তো?’

রাণা বলল, ‘চলুন।’

অমল কাঁধ ঝাকালো ‘অ্যাজ ইউ উইশ। চল।’

গাড়িতে উঠে অমল তার ফোনটা গাড়ির ড্যাশবোর্ডে রেখে বলল, 'লাইভ লোকেশন আছে। চল।'

গাড়ি স্টার্ট করল অমল। রাণার মাথা গরম হয়ে আছে।

ঠিক এটাই হয় তার। একটা সময়ের পরে কাউকে না মারলে শান্তি হয় না। সাদিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে ট্রিগারড হয়ে আছে।

ড্রাইভ করতে করতে অমল ফোন করল কাউকে, 'একা আছে? মগবাজারে যাচ্ছে তো? ঠিক আছে। আমি ওর বিল্ডিং-এ যাচ্ছি।'

ফোন রেখে অমল বলল, 'সিসিটিভি নেই ও রাস্তায়। এটা বাঁচোয়া।'

রাণা চুপ করে বসে রইল।

বিল্ডিং-এর সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল অমল। ফোনে কথা বলে বলল, 'ফ্ল্যাটে ঢুকে গেছে। আমি গাড়ি রাখছি। চলো।'

গাড়ি রাস্তায় রেখে অমল বলল, 'ইয়াসমিন অ্যাপার্টমেন্ট। হ্যাঁ। এই বিল্ডিংটাই। থার্ড ফ্লোর। চলো।'

রাণা বলল, 'আপনি গাড়িতে থাকুন। ফ্ল্যাট নাম্বার বলুন শুধু।'

অমল বলল, 'পারবে?'

রাণা বলল, 'একাই করি এসব। নাম্বার?'

অমল হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'থ্রি এ। মাস্ক পরো। এই নাও।'

রাণা মাস্ক পরে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। সিকিউরিটি তাকে দেখে চিৎকার করতে গেল, রাণা তার মাথায় রিভলভারের বাট দিয়ে মারল। একটা ছোট শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল সে।

রাণা সিঁড়িতে উঠল। তার মাথায় রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। তিন তলায় উঠে ফ্ল্যাটের নাম্বার দেখল সে। থ্রি এ দেখে কলিং বেল টিপল। দরজা খুলল না। রাণা আবার কলিং বেল টিপল।

হালকা শব্দ করে দরজা খুলল এবার। বিরক্ত গলায় আসগর বলল, 'কোন হালার পু...'

কথা শেষ করতে পারল না আসগর। গুলি তার দু'চোখের মাঝের অংশের নিখুঁত জায়গায় গিয়ে লাগল। সাইলেন্ট রিভলভার বিন্দুমাত্র শব্দ করল না। আসগর লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। রাণা চুপ করে কয়েক সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে থেকে ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। সিকিউরিটির লোকটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে সে 'সরি' বলে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। অমল গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রেখেছিল। রাণা ওঠামাত্র সে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল।

রাণা চুপ করে গাড়িতে বসে আছে। অমল বলল, 'কমপ্লিট?'

রাণা বলল, 'হু।'

অমল বলল, 'আশা করব, সাদিক আমাদের ফলো করবে না। করলে...'

রাণা বলল, 'গুষ্টিসুদ্ধ উড়িয়ে দেব। ভয় পাবেন না।'

অমল আর কোনও কথা বলল না। চুপ করে গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগল।

'তোমার মাথা ঠান্ডা হয়েছে?'

ফ্ল্যাটে পৌঁছে প্রথম কথা বলল অমল।

রাণা বলল, 'স্নান সেরে এসে বলছি।'

অমল হাসল, 'যাও।'

সময় নিয়ে স্নান করল রাণা। এই সময়টা মাথা ঠান্ডা করার সময়। এরপর ঘুমোতে হবে। অন্তত সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুমোনোর পর তার জীবন রিস্টার্ট হবে। আসগরের দু'চোখের মাঝখানে গুলিটা চালানোর

বড্ড দরকার ছিল। সব থেকে ভালো হতো সাদিককে ওড়াতে পারলে। স্নান করতে করতেই লোকটার কথা মনে করার চেষ্টা করছিল সে।

লোকটা বলেছিল, অমল বিগড়েছে। অমল ঠিক কী বিগড়েছে? অস্পষ্ট কথা বলে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। কোনও একটা উদাহরণ দিয়ে বলা উচিত ছিল। সাকিনা কি জানবে? সাকিনার কাছে যাওয়াটা সম্ভব না। সাদিক সন্দেহ করবে।

ভাবতে ভালোও লাগছে না। আবার না ভাবলে হচ্ছেও না।

স্নান সেরে বেরিয়ে রাণা বলল, 'আমি ঘুমোব।'

অমল বলল, 'সাদিক ফোন করেছিল। আসগরের ব্যাপারটা বলল। আসগর একটা সময় ছিনতাইবাজদের দলে ছিল। সাদিক ওদের সন্দেহ করছে। আজ রাতের মধ্যে ঢাকা শহরের বেশ কয়েকটা ছিনতাইবাজের খবর হবার চান্স আছে। সো গুড জব।'

অমল হাসল। রাণা বলল, 'আসগরের রিপ্লেসমেন্ট কাকে নেবে সাদিক?'

অমল বলল, 'ওর কী লোকের অভাব আছে? কেউ না কেউ হয়ে যাবে। ওরাও জানে এ লাইনে লোক তৈরি করে নিতে হয়। যেভাবে তোমাকে তৈরি করতে চাইছে। একবার এ লাইনে ঢুকে গেলে কেউ আর ফিরতে পারে না। সাদিকদের মতো লোকেরা সমাজের জঞ্জাল।'

রাণা বলল, 'আমি ঘুমোই। সাদিক আজকে ফোন করবে না বলেছিল। আমাকে ডাকলে বলবেন, ঘুমোচ্ছে।'

অমল বলল, 'ঠিক আছে।'

রাণা তার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এই ঘুমটার জন্য তাকে কোনদিন নিজেকে সাধ্যসাধনা করতে হয়নি। কাজ শেষে ঘুমটা ভীষণ দরকার।

১৯

বেলা বারোটা নাগাদ রাণা উঠে বসল। আসগর যেভাবে তার পেছন পেছন যায়, দুঃস্বপ্নেও সেভাবেই এসেছিল। শুধু তার দুই ভ্রু-র মাঝে বুলেট বসে আছে। শরীর থেকে রক্ত বয়ে চলেছে। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জলের বোতল নিয়ে জল খেল। অমল টিভি দেখছে। বলল, 'নিউজ চ্যানেলে আসগরকে দেখাচ্ছে। হাই ফাই ব্যাপার হয়ে গেছে।'

রাণা টিভির সামনে বসল। রাস্তায় অবরোধ হচ্ছে। 'বিশিষ্ট সমাজসেবী' আসগর মিয়াঁর খুনের ঘটনায় শোকের আবহ। সে হেসে ফেলল। অমল চিন্তিত গলায় বলল, 'হেড অফিস বিরক্ত হয়েছে। আসগরকে সরানোর ফলে সাদিক যদি ব্যাকফুটে চলে যায়, তাহলে সমস্যা হতে পারে।'

রাণা বলল, 'আপনার কী মনে হয়? সাদিক অপারেশন শিফট করবে?'

অমল বলল, 'জানি না। তবে সাদিকের বাড়ি যাওয়া দরকার। আমরা এখানে বসে থাকলে ওর সন্দেহ হতে পারে। শোকের আবহ, চুপ করে গিয়ে বসে থাকলে ভালো হয়।'

রাণা বলল, 'গেলে যদি আবার নতুন কাজ দিয়ে দেয়?'

অমল বলল, 'সেটা না গেলেও দিতে পারে। কাজের সঙ্গে ওদের কোনও খাতির নেই। কী করবে? যাবে?'

রাণা বলল, 'চলুন।'

অমল বলল, 'খেয়ে নিই চলো।'

খেয়ে নিয়ে দুজনে বেরোল।

সাদিকের বাড়ি পৌঁছে দেখল পরিবেশ থমথমে। সাদিক পান খাচ্ছিল মুখ লাল করে। তাদের দেখে জড়ানো গলায় বলল, 'বসেন মিয়াঁ। খানকির পুলাগুলানরে পাইলে আমি কুত্তার মতো মারব। আসগর ছিল আমার ডান হাত, আসলে ছোট ভাইয়ের থেকেও বেশি।'

রাণা শান্ত মুখে বসল। অমল বলল, 'আসগরকে মারলো কেন সাদিকভাই?'

সাদিক বলল, 'শালার টাকার লোভ তো কম না ভাই। আমার লগে কাজ করত, আবার অন্যদিকেও তো সব কাম ছাড়ে নাই। সাউগার ভাই সোহেলের লগে কাম করত। কক্সবাজার গেসে। ওইডারে আনানোর ব্যবস্থা করসি। সব বাইর হইব। আপনি খালি দেইখা যান।'

অমল বলল, 'আপনার তো সমস্যা হয়ে গেল ভাই। আসগর না থাকলে এত কাজ করবেন কী করে?'

সাদিক বলল, 'না সে ঠিক আছে। কাসেম আছে। ওরে দিয়াই কাম চালাইতে হইব। আমার চিন্তা অন্য মিয়াঁ। আসগরের কাছে আমাগো পাসপোর্টগুলান ছিল। কাল গৌতমভাই যে পাসপোর্টে গেছিল, সেটাও ওর কাছে ছিল। পুলিশ এখন ঘর তল্লাশি করতে গিয়া ওইগুলান পাইলে বিপদ। আসগর কোই রাখতো সেসব, আমি তো জানি না।'

অমল বলল, 'সেরকম হলে আমাদের গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে ভাই। আর তো কিছু করার নেই।'

সাদিক বলল, 'এখন যা কাম চলে, তাতে আপনার কি মনে হয় আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকলে হইবে? আমি তো ভাবতাসিলাম গৌতমভাইরে কাল কলম্বো পাঠামু, গেল সেসব প্ল্যান!'

অমল বলল, 'ঠিক আছে। মাথা ঠান্ডা করেন ভাই। এক দুটো দিন যেতে দিন। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সাদিকের ফোন বেজে উঠল। সাদিক ফোন তুলে উত্তেজিতভাবে ঘরের বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, 'সোহেল কিছু জানে না। বলে ওর লগে আসগরের তো কোনও ঝামেলাই নাই। উল্টে আসগরের লগে ওর ইন্ডিয়া যাবার কথা ছিল। না ভাই, আমারও মনে হইতাসিলো, সোহেল আসগররে মারবে না।'

অমল বলল, 'তাহলে কে মারবে?'

সাদিক গম্ভীর মুখে বসে রইল, 'কম পাপ তো করে নাই। কোথায় কী কইরা রাখসে সেটা দেখতে হইব। বেশিদিন লাগব না, বাইরাইয়া যাইব। আমারে কলম্বো ম্যানেজ করতে হইব ভাই, নইলে দুঃখ আছে। যদি পুলিশ পাসপোর্ট না পাইয়া থাকে, তাইলে গৌতমভাইরে কাল যাইতে হইব। আর যদি পাইয়া থাকে তাহলে তার ব্যবস্থা কী, দেখি। আপনি যাইতে পারবেন রুমানভাই?'

অমল বলল, 'হ্যাঁ। কেন পারব না?'

সাদিক চিন্তিতমুখে রাণার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কেমন বাজে ব্যাপার বলেন গৌতমভাই। ছেলেটা কাল গেল, রাতে ফিরাই খুন হইয়া গেল। যে খানকির পুত এইটা করসে, সে জানে না কী করসে। ঠিক আছে। দেখা যাইব, ছাড় সে পাবে না।'

রাণা বলল, 'ছাড়া উচিতও না। আসগরই আমাকে প্রথম সাকিনার কাছে নিয়ে গেছিল।'

সাদিক খুশি হল, 'ও মিয়াঁ, আপনার দেখি আবার সাকিনার কথা মনে পইড়া গেল। আবার যাইতে ইচ্ছা করে নাকি?'

রাণা মাথা নাড়ল, 'না, না। সেরকম কিছু না।'

সাদিক বলল, 'আমি তো বুঝছি। আপনার রক্ত গরম মিয়াঁ। কখন যাইবেন বলেন, আমি ব্যবস্থা কইরা দিমু নে।'

রাণা বলল, 'না না ভাই, এখন এখানে এই অবস্থা, এই পরিস্থিতিতে ওসব থাক।'

সাদিকের ফোন বাজছিল আবার। সাদিক ফোন ধরল, 'জি মিয়াঁ, জি, হ, ঠিক আসে। আচ্ছা। ঠিক আছে।'

ফোন রেখে সাদিক বলল, 'অগো বিল্ডিং-এর সিকিউরিটির জ্ঞান ফিরসে। সে বলতাসে লোকটারে দেখতে পায় নাই। মুখোশ পইরা ছিল। হালার পুত। আসগররে ওই ফ্ল্যাট কিইনা দেওয়াই আমার ঠিক হয় নাই। কত দাম জানেন ওই ফ্ল্যাটের? তার দিয়া ও যদি এইখানে থাকতো, সেইটাই ভালো হইত।'

কাসেম এসে দাঁড়াল। সাদিক বলল, 'কী হইল?'

কাসেম বলল, 'পুলিশ আইসে।'

সাদিক তাদের দিকে তাকাল, 'দ্যাখসেন মিয়াঁ, এবার ওগোও খাওন লাগব। আপনারা বসেন। আমি দেইখা আসি।'

সাদিক উঠে গেল।

অমল বলল, 'সাদিক প্রবল চাপে পড়ে গেছে দেখছি।'

রাণা বলল, 'ওকে আসগরের কাছে না পাঠানো পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

অমল হেসে ফেলল, 'এত মাথা গরম তোমার?'

রাণা বলল, 'কাসেম কোথায় থাকে?'

অমল রাণার দিকে হাঁ করে তাকাল, 'কাসেমের সঙ্গে তো তোমার ঝামেলা নেই?'

রাণা বলল, 'আমার সাদিককে দেখলেই মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে।'

অমল বলল, 'ঠিক আছে। ফিরে আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি। দরকার হলে তোমার সঙ্গে উস্তাদের কথা বলিয়ে দিচ্ছি।'

আধঘণ্টা ধরে পুলিশ সাদিককে জিজ্ঞাসাবাদ করল। সাদিক এসে গুম হয়ে বসে রইল। অমল বলল, 'কী বলছে পুলিশ?'

সাদিক বলল, 'আমার কাছে কাজ করত, কাল এতো রাতে ফিরেছে কেন, এসব। আমি কেন আসগরের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে কাজে রাখি নাই, খাওয়াতে হইব। বোঝেন না? খাইতে চায়। এদের হাঁ অনেক বড় রে ভাই। ছোট কিছুতে এদের পেট ভরবে না।'

অমল বলল, 'মিনিস্ট্রি লেভেলে আপনার পরিচিতি আছে না?'

সাদিক বলল, 'পুঁটি মাছে কাজ হইলে ভাই রুই-কাতলা লাগে না। সব সময় বড় মানুষদের বিরক্ত করার কি দরকার আছে? কী বলেন গৌতম ভাই?'

রাণা মাথা নাড়ল, 'না। দরকার নেই।'

সাদিক বলল, 'একটাই ভালো খবর আছে মিয়াঁ, ওরা পাসপোর্টের খবর পায় নাই।'

রাণা বলল, 'কিংবা আপনাকে বলেনি।'

সাদিক চোখ ছোট ছোট করে রাণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা তো আপনি ভালো কথা বলছেন ভাই। অনেক ভালো কথা বলছেন। আপনার বুদ্ধি আছে। এই জন্যই আপনারে আমার পছন্দ, বুঝছেন মিয়াঁ?'

অমল বলল, 'রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই। আপনি চাইলে আমি কলম্বো চলে যাব।'

সাদিক বলল, 'আমি রাতে বলতাছি ভাই। কলম্বোর সিগনাল এতক্ষণ গ্রিন ছিল, এখন লাল হইয়া গেছে। আসগরের খবর সব জায়গায় চলে গেছে।'

অমল ঘাড় নাড়ল, 'জি।'

সাদিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাণা বলল, 'কী হল?'

অমল বলল, 'একবার লতিফ চৌধুরীর বাড়ি হয়ে যাই। আমার কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। নাহ্, ঘুরেই আসি, চলো।'

২০

পূর্বের কথা

'হরি, ও হরি!'

মিনু চিৎকার করে ডাকল। হরি ছুটছিল বাড়ির সামনে। মা'র ডাক শুনে দৌড়ে এল। মিনু ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করতে যাচ্ছিল। হরি তাড়াতাড়ি ঘরে সেঁধিয়ে গেল।

গজগজ করতে লাগল মিনু, 'কাম নাই কাজ নাই, সারাদিন খালি খেইলা যাইতাসে। তর বাপ আসুক। তরে দেখাব কেমন লাগে।'

হরি কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'মা, কারা আইতাসে। কত লোক।'

মিনু বলল, 'কারা আসে?'

হরি বলল, 'মনে হয় পাকিস্তানি সেনা। অনেক লোক নিয়া আইতাসে।'

মিনুর মুখ শুকিয়ে গেল। সে বলল, 'গ্রামে ঢুকসে?'

হরি ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ, ঢুকসে। আমি দেখলাম সব মসজিদে ভিড় করসে।'

মিনু তড়িঘড়ি ঘরের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কাপড় চোপড় তুলে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে জানলা দরজা সব বন্ধ করে দিল।

হরি কেঁদে ফেলল, 'ওরা কি মাইরা ফেলব মা?'

মিনুর বুক ধড়ফড় করছিল। বলল, 'চুপ থাক। শব্দ করবি না। ওরা যেন ভাইবা লয়, আমরা এখানে নাই।'

হরি বলল, 'ঠিক আছে।'

মিনিট দুয়েক পরে হরি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।

মিনু ভয় পেল, ভাবল আতঙ্কে ছেলে পাগল হয়ে গেল কি না। বলল, 'কী হইল?'

হরি বলল, 'মজা করসি। কেউ আসে নাই।'

মিনু হরির পিঠে দুম দুম করে কিল মারল। 'মজা করার বিষয় এইডা?'

হরি তাও হেসে যাচ্ছে খিল খিল করে। মিনু বিরক্ত হয়ে উঠল। আবার দরজা খুলে দিল। কাপড় মেলতে মেলতে বলল, 'তর বাপ আসুক। মজা দেখাব নে, বুঝবি কারে মজা কয়।'

হরি ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করল।

রাস্তায় একটা কুকুর ডেকে উঠল। মিনু চমকে তাকাল। প্রায় পঞ্চাশজনের একটা ছোটখাটো বাহিনি তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। মিনু ভীতচোখে হরির দিকে তাকাল।

হরি চমকে উঠেছে। দুজনের কেউই ভাবেনি মজাটা এভাবে সত্যি হয়ে গেছে। সেনারা তাদের বাড়ি ঘিরে দাঁড়াল।

রাজাকার লতিফ চৌধুরী তার মেহেন্দি করা দাড়িতে হাত বুলিয়ে মেজরকে বলল, 'মালাউন ঘর।'

মেজর খানের ফরসা চেহারা। হাসিমুখে মিনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্যায়সে হো? সব ঠিক?'

মিনু কাঁদো কাঁদো মুখে খানের দিকে তাকাল।

মেজর এগিয়ে এসে মিনুর হাত ধরে বলল, 'চলো।'

মিনু পালাতে গেল। মেজর মিনুর পিঠে সজোরে ঘুষি চালাল।

মিনু মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। পাক সেনা আর রাজাকারের দল হেসে উঠল। হরি মেজরকে মারতে এল। মেজর রিভলভর বের করে হরির মাথায় গুলি করল।

গুলি খেয়ে দশ বছরের বাচ্চাটা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। মিনু হাহাকার করে উঠল। মেজর মিনুর মাথার চুল ধরে টানতে টানতে মিনুকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল।

লতিফ চৌধুরী একটা বিড়ি ধরাল। মিনুর আর্তস্বর বাইরেও শোনা যাচ্ছে। লতিফ তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে এক সেনাকে বলল, 'বিড়ি লেঙ্গে? আচ্ছা লাগতা সাব।'

সেনা লতিফের হাত থেকে বিড়ি নিল। লতিফ আগ্রহ ভরে সে বিড়ি ধরিয়ে দিল। কয়েক মিনিট পর বেল্ট ঠিক করতে করতে মেজর বেরিয়ে এসে চিৎকার করল, 'মুদাসসর।'

মুদাসসর নামের জওয়ান বলল, 'জি জনাব।'

মেজর বলল, 'যা।'

মুদাসসর আগ্রহসহকারে ভেতরে চলে গেল। মেজর লতিফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্যা হাল হে আপকা? খোয়াইশ হে?'

লতিফ লজ্জিত মুখে বিড়ি ফেলে দিয়ে আধো উর্দুতে যা বোঝাল, তার মানে দাঁড়ায় হুজুরের যদি দয়া হয়, তাহলে সেও মালাউন মেয়েকে চেখে দেখতে চায়।

মেজর জানাল মুদাসসরের হয়ে গেলে সে যেতে পারে। লতিফ খুশি হয়ে অনেক শুক্রিয়া দিল।

বর্তমান সময়

'বুঝলা রুমানভাই, কী সময় কাটাইছিলাম?'

বৃদ্ধ লতিফ চৌধুরী হাসি হাসি মুখে গল্পটা শোনাচ্ছিল অমলকে।

অমল চুপ করে লতিফের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে। অথচ এখন তার অভিনয় করার কথা!

২১

রাণা গাড়িতে অপেক্ষা করছিল। অমল লতিফের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বলল, 'বাস্টারড।'

রাণা অবাক হল, 'কী হয়েছে?'

অমল রাগী গলায় বলল, '৭১-এর গল্প বলছিল জানোয়ারটা। বিরাট কিছু কাজ করে ফেলেছে। এ শুয়োরগুলোর ধারণা এরা খুব ভালো কাজ করেছিল। কাফেরদের মেরে পুণ্য করেছে ভাবে। জাস্ট নেওয়া যায় না।'

রাণা বলল, 'তাহলে এদের উড়িয়ে দেওয়া হয় না কেন?'

অমল বলল, 'কতজনকে ওড়াবে? প্রচুর মানুষ এটাই ভাবে। এদেশে কতজন রাজাকারদের সমর্থন করে, তোমার কোনও ধারণা আছে? ধর্ম মানুষকে মানুষ রাখে না আর। তাছাড়া এ লোকটাকে এখনই মারলে হবে না। বড় মাছেরা ওদেশ থেকে আসবে। এ লোকের ডাক পড়বে। একে হাতে রাখলে ভেতরের অনেক খবর পাওয়া যাবে।'

রাণা বলল, 'কাজ হয়ে গেলে? তখন?'

অমল গাড়ি স্টার্ট দিল, 'তখন তোমাকে হ্যান্ডওভার করে দেব। যা করার করে নিও।'

রাণা ঠান্ডা চোখে জানলার বাইরে তাকাল। কাজ হয়ে গেলে অমলকেও ওড়ানোর আদেশ আছে। অমল সেটা জানে? জানলে তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারত? যা বোঝা যাচ্ছে, ঢাকায় আই এস আই এখন প্রবলভাবে সক্রিয় হবার চেষ্টা করছে। অমল সেসব খবরই বের করছে। আরও কতখানি খবর পেলে অমলকে সরানো যাবে, সেটা তাকে ঠিক করতে হবে। তাকে এখানে থাকতে হবে। সে পারবে? তারপর একদিন তাকেও ওড়াতে এভাবেই কাউকে পাঠাবে উস্তাদ? অস্বস্তি হচ্ছিল।

অমল বলল, 'সাদিক কিন্তু খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেভাবে হোক ও ট্র্যাক করতে চাইছে আসগরকে কে উড়িয়েছে। আমাদের এখন সাদিকের কাছে থাকতে হবে। কিপ ইয়োর এনিমিস ক্লোজ এই মন্ত্র মেনে চলতে হবে।'

রাণা বলল, 'কত ক্লোজে যাব? আমার লোকটাকে দেখলেই মাথা গরম হয়ে যায়।'

অমল হাসল, 'এরকম মাথা গরম হয়ে যায় দেখলে টাইপ লোকেদের নিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে। কিছু করার নেই। সাদিকের অনেক ব্যবসা আছে। তার মধ্যে একটা ব্যবসা হল, ও এদেশের আট-নয় বছরের ছেলেমেয়েদের তুলে নিয়ে আরবে পাচার করে। সে বাচ্চাদের একটা অংশ আইসিসে যায়। ওরা ওই বাচ্চাদেরকেই নিয়ে শোয়। জাস্ট ইমাজিন।'

রাণা বলল, 'এসব আমাকে বলছেন কেন? আমি রেগে যাচ্ছি। রেগে গেলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।'

অমল বলল, 'তোমায় মাথা ঠান্ডা রাখাটাও শিখতে হবে রাণা। তুমি এফিসিয়েন্ট। তুমি ভালো। কিন্তু আরও ভালো হতে হবে। আসল তো মাথা। এ কাজে আসল হল রিপু। আমাদের নিজেদের কন্ট্রোল করা জানতে হবে। নইলে সমূহ বিপদ। আসগরের কেসটা আমাদের কি ফ্রন্টফুটে রেখেছে? রাখেনি। বরং অনেকটা ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে। এটা তোমার মাথা গরম করার ফলাফল। দয়া করে এ কাজে সেটা কোরো না।'

রাণা বলল, 'বাচ্চাদের নিয়ে এসব করবে, আর কিছু বলব না?'

অমল বলল, 'বলব। অ্যাক্ট করব। তার সময় আছে। বাঘের টোপ ফেলার মতো অপেক্ষা করাটাই আমাদের কাজ। তার আগে টোপ সাজাও। টোপ চিৎকার করুক, গন্ধ ছড়াক। মজা তো তখনই। একটা জিনিস ভালো হল না খারাপ হল, বুঝতে পারছি না। আসগর নেই বলে সাদিক তোমাকে কলম্বো পাঠাবে না। তুমি বেঁচে গেলে। কিন্তু কলম্বোর কোডটাও তো দরকার ছিল। সেটা কী করে পাব?'

রাণা বলল, 'দু-দিন পরে আবার শুরু হবে নিশ্চয়ই।'

অমল চিন্তিত গলায় বলল, 'দেখা যাক। যাহ্, ঢাকার বিখ্যাত জ্যাম শুরু হয়ে গেল। এবার কী হবে?'

রাস্তায় একটার পর একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে তাল মিলিয়ে রিক্সা। সুদৃশ্য কত রকমের রিক্সা। রাণা বলল, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছিলাম?'

অমল বলল, 'সাদিকের বাড়িতে। যেতে তো হবেই ভাই। বসে থাকলে হবে না।'

রাণা বলল, 'আবার? কী করে যাব?'

অমল হতাশ গলায় বলল, 'জানি না।'

২২

নির্মল হন্তদন্ত হয়ে আনোয়ার সাহেবের চেম্বারে ঢুকে বলল, 'স্যার, আসগর আলির নাম শুনেছেন?'

আনোয়ার সাহেব চিন্তিতমুখে বললেন, 'শোনা শোনা লাগছে। কেন বল তো?'

নির্মল বলল, 'সকালে ওকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অদ্ভুতভাবে এ বুলেটটাও বিদেশী।'

আনোয়ার সাহেব হাতের ইশারায় নির্মলকে বসতে বলে বললেন, 'আসগরের হিস্ট্রি কী?'

নির্মল বলল, 'সাদিকের কাছে কাজ করত। সাদিক হোসেন। টেক্সটাইল কিং উইথ নো ক্রিমিনাল হিস্ট্রি।'

আনোয়ার সাহেব বিস্মিতগলায় বললেন, 'বলো কী? এত বড় কিং লোক, তার ক্রিমিনাল হিস্ট্রি নেই?'

নির্মল মাথা নাড়ল, 'নেই স্যার।'

আনোয়ার বললেন, 'আসগরকে কী করে...?'

নির্মল বলল, 'ফ্ল্যাটে ঢুকে, ভোরবেলায়। সিকিউরিটিকেও হালকা জখম করেছে। আমাদের কাছে সেরকম কোনও সিসিটিভি ফুটেজ নেই।'

আনোয়ার বললেন, 'রাস্তার ফুটেজ? ভোরবেলায় কত গাড়ি চলে?'

নির্মল হতাশ গলায় বলল, 'অনেক স্যার। সেভাবে কিছু বোঝা সম্ভব না।'

আনোয়ার বললেন, 'নজর রাখো। আর এই সাদিক সাহেবের ব্যাপার কী জানা আছে?'

নির্মল বলল, 'কিছু না। আমার শুধু একটাই অবাক লাগছে, এত বড় এম্পায়ার সামলাচ্ছে, অথচ একটা ছাড়া আর কোনও কালো দাগ নেই।'

আনোয়ার বললেন, 'কী সেই কালো দাগ?'

নির্মল বলল, 'পুরান ঢাকায় ওর একটা ব্রথেল আছে। মেয়ে পোষে। নিজস্ব মেয়েছেলে।'

আনোয়ার হাত দিয়ে কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, 'ওটা কালো দাগ হিসেবে আইডেন্টিফাই করা যাবে না। আরও খোঁজো। খোচর লাগিয়ে দাও। সাদিক কি তারেক হোসেনের ভাই?'

নির্মল বলল, 'জি স্যার।'

আনোয়ার বললেন, 'তারেক হোসেন ইন্ডিয়ায় খুন হয়েছিল। ওই লোকের খবর আসার পর অনেকে নড়েচড়ে বসেছিল। তারপর সব ঠান্ডা হয়ে গেল। বলা হল তারেকের কাছে ওদেশের কোনও তোলাবাজ টাকা চেয়ে না পাওয়ায় কাণ্ডটা ঘটায়। অদ্ভুতভাবে সেটা নিয়ে কেউ কোনও কথাও বলল না। সাদিক তারেকের ভাই, তার সাগরেদকে কেউ ফজরের সময়ে...ইন্টারেস্টিং নির্মল! সাউন্ডস ভেরি ইন্টারেস্টিং! ছাই পেয়েছ, ওড়াতে শুরু করো। দেরি কোরো না।'

নির্মল বলল, 'স্যার, সাদিকের ফোন ট্র্যাক করার পারমিশন পাওয়া যাবে?'

আনোয়ার বললেন, 'আহ্, আবার জিগ্যেস করছ কেন? যা খুশি করো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করো। সাদিক ইজ এ বিগ ফিস। হতে পারে নিজের লোককে নিজেই...কোনও কথা শোনেনি বলে...'

নির্মল বলল, 'স্যার, আমার মনে হয় না এখানে সাদিক ইনভলভড আছে। নিজের লোক হলে লোকটা গুম করে দিতে পারতো। এভাবে কাজ করত না।'

আনোয়ার ভ্রু কুঁচকে নির্মলের দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে বললেন, 'তাও ঠিক। সাদিকের অ্যান্টি কে আছে?'

নির্মল মাথা নাড়ল, 'নো আইডিয়া স্যার। রেকর্ড বলছে সাদিকের শত্রু নেই। অজাতশত্রু। নিজের কাজটা মন দিয়ে করে। অন্য কোনও বিষয়ে মাথা ঘামায় না।'

আনোয়ার হাসলেন, 'হতে পারে না। বাঙালি অজাতশত্রু হতে পারে না, আনলেস হি ইজ এ মহাপুরুষ। টেক্সটাইল এম্পায়ারের মালিক অজাতশত্রু হওয়া সম্ভব না। তার অ্যান্টি গ্যাংগুলোর ব্যাপারে জানতে হবে।'

নির্মল ঘাড় নাড়ল, 'রাইট স্যার। আপনি যা বলবেন।'

আনোয়ার বললেন, 'দেখো দেখো। দেরি কোরো না।'

নির্মল আনোয়ার সাহেবের চেম্বার থেকে বেরিয়ে নিজের ডেস্কে এসে বসল। সাদিকের ফাইলটা বের করে আবার পড়তে শুরু করতেই তার ফোন বেজে উঠল। নির্মল দেখল দীপা ফোন করছে। দীপা এখন রাগ করে আছে। সে তড়িঘড়ি ধরল, 'বলো।'

দীপা বলল, 'তুমি কি বাসায় আসতে পারবে?'
নির্মল অবাক হয়ে ঘড়ি দেখল, 'এখন?'
দীপা রাগী গলায় বলল, 'তোমায় বলেছিলাম না ইন্ডিয়া থেকে আমার মামারা আসবে? বলেছিলাম তো?'
নির্মল বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। এসে গেছেন?'
দীপা বলল, 'বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়ে আছে। দয়া করে ওদের রিসিভ করে আনা যাবে কি?'
নির্মল আমতা আমতা করে বলল, 'শোন না, খুব বড় কাজে ফেঁসে আছি। যাও না প্লিজ।'
দীপা ফোন কেটে দিল।

২৩

'স্যার আসব?' আনোয়ার আলির চেম্বারে নক করল নির্মল।

আনোয়ার বললেন, 'এসো, বোস বোস।'

নির্মল চেম্বারে ঢুকে বসে বলল, 'স্যার সাদিককে ইন্টারোগেট করা দরকার। আমার মনে হচ্ছে দেরি করা ঠিক হবে না।'

আনোয়ার বললেন, 'বেশ তো। সাদিকের বাসায় চলে যাও। গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করো।'

নির্মল অবাক হয়ে বলল, 'এত সোজা? সমস্যা হবে না?'

আনোয়ার বললেন, 'তুমি যাও। আমি বুঝব।'

নির্মল ঘাড় নাড়ল। এইজন্য আনোয়ার স্যারকে এত ভালো লাগে। কোনরকম সিদ্ধান্ত নিতে একটু দেরি করেন না।

আনোয়ারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে নির্মল চার জনকে নিয়ে সাদিকের বাড়ির দিকে রওনা দিল। আকাশ মেঘলা করে আছে। যেকোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে। দীপা এখনও কথা বলছে না। ভীষণ রাগ করে আছে। কাজের যন্ত্রণায় সংসার মাথায় উঠেছে। রোজ কিছু না কিছু সমস্যা লেগেই আছে। কোনদিন সময়ে বাড়ি ফিরতে পারে না। দীপা জানে তার কাজ এরকমই। বিয়ের আগেও জানত। তারপরেও এরকম করবে। ইন্ডিয়া থেকে দীপার মামারা এসেছে। এখন বায়না ধরেছে, ওদের নিয়ে দেশ ঘোরাতে হবে। নির্মল যতবার বলেছে ছুটি পাবে না, ততবার কথা বন্ধ করে দিচ্ছে।

সাদিক শেখ বাড়িতেই ছিল। ডেকে নিয়ে আসতে হল। তাকে দেখে বলল, 'থানা থেকে আসছিল তো। যা বলার বলে দিয়েছি।'

নির্মল বলল, 'আমি থানা থেকে আসি নাই। অন্য জায়গা থেকে এসেছি।'

সাদিক বলল, 'কোত্থেকে আসছেন স্যার? ব্যাব?'

নির্মল বলল, 'ওরকমই।'

সাদিক গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'আসগর আমার কর্মচারী ছিল। এর বেশি কোথায় কী করেছে, তা তো আমি বলতে পারি না স্যার।'

নির্মল সাদিকের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আমি তো একবারও বলিনি আসগরের ব্যাপারে এসেছি। আপনি আসগরের প্যাঁচাল পাড়তে শুরু করে দিলেন কেন?'

সাদিক বলল, 'আমি ছোট ব্যবসায়ী স্যার। এছাড়া আর কোন কারণেও আমার কাছে ব্যাব আসবে ক্যান?'

নির্মল বলল, 'আপনার রেকর্ড কিন্তু তা বলছে না সাদিক।'

সাদিক ভ্রু কুঁচকাল, ‘রেকর্ড কী বলছে?’

নির্মল বলল, ‘রেকর্ড বলছে আপনার ব্যবসা বেশ ভালোই ছড়িয়েছে। মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড। এর মধ্যে অনেকবার আপনার যাতায়াত হয়েছে।’

সাদিক বলল, ‘জি স্যার, এই কান্ট্রিগুলোতেই আমার ব্যবসা। বাংলাদেশের ব্যবসা এখন গ্লোবাল হতে যাচ্ছে। আমাদের গর্ব করা উচিত। তাই না মিয়াঁ?’

নির্মল বলল, ‘আসগরকে নিয়ে কিছু বলুন।’

সাদিক বলল, ‘খারাপ পথে ছিল। রাস্তা থেকে তুইলা নিয়া মানুষ করেছি জানেন? মগবাজারে ফ্ল্যাট কিনে দিলাম। আগের জীবন পিছু ছাড়ল না। অনেক খারাপ লাগে।’ সাদিক মন খারাপের মুখ করল।

নির্মল বলল, ‘আলম নামে কাউকে চেনেন?’

সাদিক চমকে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল, ‘চিনি। কেন বলুন তো?’

নির্মল বলল, ‘এমনি জিগ্যেস করলাম।’

সাদিক অবাক হয়ে নির্মলের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কী করেছে আলম?’

নির্মল বলল, ‘খুন হয়েছে, জানেন না?’

সাদিক বলল, ‘আমি কী করে জানব ভাই? আমার উপর দিয়ে কী যাচ্ছে বলেন তো! সকালে পুলিশ আসে, বিকালে ব্যাব আসে। আমার কাজ-কাম মাথায় উঠসে। আলমের লগে অনেকদিন কন্ট্যাক্ট নাই। আসগরই তো ওদের সব খোঁজ খবর রাখত।’

বলতে বলতে হঠাৎ করে কাঁদতে শুরু করল, ‘আসগর, ভাইরে, আমাগো ছাইড়া তুই কোথায় চলে গেলি রে!’

নির্মল তীক্ষ্ণচোখে সাদিকের দিকে চেয়ে রইল। অতি শোক চোরের লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে।

সে বলল, ‘আমাদের হেড অফিসে না জানিয়ে আপনি দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। আপনার পাসপোর্ট আমাদের কাছে জমা করে দেবেন।’

সাদিক রেগে গেল, ‘এসব কী বলেন আপনি? আমার বেশিরভাগ কাজই তো বাইরে। দেশের বাইরে না যাইতে পারলে কী হবে?’

নির্মল বলল, ‘এটা আমার ডিসিশন না। তদন্তের স্বার্থে আপনাকে এটুকু সহযোগিতা করতেই হবে।’

সাদিক বিরক্ত মুখে বলল, ‘জি আচ্ছা। আসগরের খুনিরে ধরতে পারলে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনারে পুরস্কার দিমু, কইয়া দিলাম সার।’

নির্মল উঠে দাঁড়াল, ‘ব্যক্তিগত পুরস্কারের লোভে আমি চাকরি করি না। তবে খোঁজ পেলে হয়তো আপনি জানতে পারবেন।’

সাদিক গম্ভীর মুখে বসে।

নির্মল সাদিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। এখন আবার দীপার মামাদের রিসিভ করতে ছুটতে হবে। জীবনে একটুও শান্তি নেই।

২৪

রাণা অমলের সঙ্গে বসে টিভি দেখছিল। কিছুক্ষণ আগে জ্যাম থেকে মুক্তি পেয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকেছে তারা। সাদিকের ফ্ল্যাটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে।

অমলের ফোনে মেসেজ টোন বাজল। অমল মেসেজ টোন দেখে বলল, ‘সর্বনাশ।’

রাণা বলল, 'কী হল?'

অমল বলল, 'সাদিক ব্যাবের নজরে পড়ে গেছে।'

রাণা বলল, 'সেটা কী করে জানা গেল?'

অমল বলল, 'সাদিকের বাড়ির কাছে আমাদের লোক রাখা আছে। সেই খবর দিল। একজন ইনফরমার আরেকজন ইনফরমারকে খুব ভালো করে চেনে।'

রাণা বলল, 'তাহলে তো আপনার ইনফরমারও ধরা পড়ে যাবে।'

অমল চিন্তিতগলায় বলল, 'ঠিকই। ধরা পড়ে যাবার চান্স খুব বেশি। তাকে সরে যাবার ইন্সট্রাকশন দিয়ে দিই তবে।'

অমল মেসেজ করে দিল।

রাণা বলল, 'তাহলে আমরা কী করব? সাদিকের বাড়ি যাব না?'

অমল বলল, 'আমাকে জিগ্যেস করছ কেন? তুমি আসগরকে ওড়ানোর ডিসিশন নিলে। সমস্ত সাজানো প্ল্যান ভেস্তে গেল। এবার তুমিই ঠিক করো কী করবে? দেখলে তো? এরকম ভুল ডিসিশনের জন্য হাতের কাছে চলে আসা জিনিসগুলো কেমন দূরে চলে যায়? এবার ব্যাবের সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে। আর যদি সেটা করতে হয়, তাহলে দিল্লিকে দিয়ে ঢাকায় কন্ট্যাক্ট করাতে হবে! উফ্, মহা ঝামেলা।'

রাণা বলল, 'তাহলে বোধহয় আমাদেরও এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলেই ভালো হয়।'

অমল বলল, 'তুমি পারবে? দু'দিন আন্ডারগ্রাউন্ড থাকার পর তিন দিনের দিনই তুমি বলবে আমার মাথা কাজ করছে না, কাউকে একটা ওড়াতে হবে।'

রাণা বলল, 'আমরা সাদিকের বাড়ি না গেলেই সাদিক সন্দেহ করবে। আপনি নিশ্চয়ই সাদিককে বলতে যাবেন না যে ওকে ব্যাব টার্গেট করেছে?'

অমল দু'হাতে মাথা চেপে বসে থেকে বলল, 'সব গেল। আমার গোটা কাজটা নষ্ট হয়ে গেল। যে ক'টা কো-অরডিনেট সাদিকের কাছে আছে, ওরা সেগুলো আর ইউজ করবে না এর পরে।'

থমথমে মুখে অমল ফোন করল। ও-প্রান্ত ফোন ধরতে অমল সবটা জানিয়ে বলল, 'এবার কী করব?'

ও-প্রান্ত থেকে উত্তর এল, 'যেখানে আছ, সে জায়গা ছেড়ে দাও। ঢাকায় অন্য কোনও জায়গায় চলে যাও।'

অমল বলল, 'সেক্ষেত্রে সাদিক সতর্ক হয়ে যাবে।'

'তোমাদের ধরা পড়ার রিস্ক দিল্লি নিতে পারবে না।'

রাণা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটা পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল রাস্তার উপর। চার-পাঁচজন গাড়ি থেকে নেমে অমলের গাড়িটা দেখতে শুরু করল। রাণা অমলকে ইশারা করল। অমল জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ফোন রেখে রাণাকে বলল, 'হয়ে গেল, মামারা এসে গেছে। এখনই বেরোতে হবে। চলো।'

তড়িঘড়ি তৈরি হল তারা। বেশ কিছু কাগজ ঘরের মধ্যেই আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে একটা ব্যাগে জিনিসপত্র নিয়ে নিল অমল। ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তারা দেখলো পুলিশ গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ফোন করছে। অমল বলল, 'আমাকে ফলো করো।'

ফ্ল্যাটের পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে সি এন জি ধরে উঠে বসল। অমল বলল, 'উত্তরা যাব।'

সি এন জি চালক বলল, 'উত্তরা যাব না।'

অমল বলল, 'ঠিক আছে। কমলাপুর যাবা? না তাও যাবা না?'

সি এন জি চালক গম্ভীর মুখে বলল, 'যাব। একশো টাকা বেশি লাগব।'

অমল বলল, 'দিমু নে। চলো।'

সি এন জি চলতে শুরু করল। অমল পিছনের দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত হল। রাণা বলল, 'কোথায় যাচ্ছি?'

অমল রাণার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'এখন কোনও কথা নয়।'

কমলাপুর পৌঁছতে কুড়ি মিনিট লাগল। সি এন জি থেকে নেমে অমল বলল, 'রাজশাহী এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে আছে। চলো ওতে উঠে বসি।'

অমল টিকেট কাটল। ট্রেনে উঠে বসার জায়গা পাওয়া গেল।

অমল বিরক্তভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'ব্লান্ডার করে ফেললাম। তোমার কথাটা কেন যে শুনতে গেলাম!'

২৫

মন্ত্রণালয়ের ওয়েটিং রুমে বসে আছে নির্মল। আনোয়ার সাহেব ফোনে ব্যস্ত।

মামাবাড়ির লোকেদের নিয়ে চট্টগ্রাম গেছে দীপা। মেসেজ করে জানিয়েছে। এর পর কতদিন কথা বলবে না, কে জানে। বাড়ি গেলে বার বার তাকে জিগ্যেস করেছে যাবে নাকি। নির্মল ছুটি পায়নি বলায় খুব রাগারাগি করেছে। নির্মল হাল ছেড়ে দিয়েছে। কাঁহাতক আর বোঝানো যায়।

ফোনে সাদিকের বাড়ির এন্ট্রির সিসিটিভির লাইভ ফুটেজ দেখছিল নির্মল। কেউ নেই আপাতত। কাসেম একবার বেরিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে ঢুকে গেছে। বাইরে থেকে অন্য কারো গাড়ি আসেনি সারাদিনে। এত ঘটনাহীনতাই অবাক করছে। সব কিছু কেমন অদ্ভুতভাবে শান্ত। এত শান্ত কেন হবে? ভ্রু কুঁচকে ভাবার চেষ্টা করছিল।

মন্ত্রীর পি এ এসে বলল, 'ভেতরে যান।'

আনোয়ার ফোন রেখে নির্মলকে ব্যস্ত গলায় বললেন, 'চলো, চলো।'

ফিরোজ হাসান ফোন করছিলেন। তারা ঘরে ঢুকতে ইশারায় বসতে বললেন। বেশ কিছুক্ষণ ফোনে কথা বলার পর ফোন রাখলেন মন্ত্রী। আনোয়ার আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলুন।'

আনোয়ার বললেন, 'সাদিক শেখের প্রচুর বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ে যোগ পাওয়া গেছে। লেনদেনের নথির কোনও ঠিক নেই।'

ফিরোজ বিরক্ত গলায় বললেন, 'মানে? তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যবসায়ী। দেশের সম্পদ। বিদেশি খুনিদের থেকে আপনার তার দিকেই চোখ পড়ল? আমি শুনেছি সব বাইরের বুলেট পাওয়া গেছে। সাদিক কী করবে এখানে?'

নির্মল বলল, 'সাদিককে ঠিক লাগছে না জনাব। ওর অনেক সমস্যা আছে।'

ফিরোজ নির্মলের দিকে তাকালেন, 'বাংলাদেশের ইয়ং ম্যানেদের এই হল সমস্যা। কী নাম আপনার?'

নির্মল নাম বলল।

ফিরোজ বললেন, 'ও, সংখ্যালঘু? এই তো। আপনারা হলেন আমাদের দেশের পোস্টার বয়। ওসব দেখলে হবে না। প্রায় সব ব্যবসায়ীরই এসব আছে। তার সঙ্গে অপরাধজগতের কিছু নাই মিয়াঁ। ভাববেন না। এত সবকিছু নিয়ে ভাবার কোনও দরকার নেই।'

নির্মল কুঁকড়ে গেল একটু। এই ধর্মের জায়গাটা এলে সে বরাবর কুঁকড়ে যায়। এবারেও সমস্যাটা হল। 'ওকে জনাব।'

ফিরোজ আনোয়ারকে বললেন, 'আপনি সাদিককে জ্বালাতন করবেন না। জ্বালাতন করার মতো ছেলে সাদিক না। ওকে ওর কাজ করতে দিন।'

আনোয়ার বললেন, ‘জি জনাব।’

মন্ত্রীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে আনোয়ার বললেন, ‘মন খারাপ কোরো না নির্মল। মন্ত্রীরা আজ আছে, কাল নেই। তুমি থাকবে, তোমার কাজ থাকবে। যারা ধর্ম দিয়ে মানুষকে ভাগ করে, তাদের আসলে চোখ বন্ধ থাকে। তুমি তোমার কাজটা করে যাও।’

নির্মল বলল, ‘সাদিকের সারভেইলেইন্সটা করে যাব?’

আনোয়ার বললেন, ‘হ্যাঁ।’

গাড়ি অবধি যাওয়ার আগে মন্ত্রীর পি এ ছুটে এসে আনোয়ারকে বললেন, ‘স্যার আপনাকে ডাকছেন।’

আনোয়ার বললেন, ‘আবার কী হল? চলো দেখি।’

পি এ বলল, ‘শুধু আপনাকে স্যার।’

নির্মল গাড়িতে বসল। আনোয়ার কিছুক্ষণ পর গম্ভীরমুখে বেরিয়ে ড্রাইভারকে বললেন, ‘চলো।’

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করলেন। আনোয়ার গলা খাকড়িয়ে বললেন, ‘নির্মল, মন্ত্রী বলছেন তোমাকে এই কেসটায় এখন রাখা যাবে না। সেনসিটিভ ব্যাপার। আপাতত ছ মাস তুমি পুলিশ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটটা দেখো। আমি সময়মতো আবার তোমাকে ডেকে নেব।’

নির্মল বলল, ‘ওকে স্যার। আপনি যেমন বলবেন।’

সে মোটেইই অবাক হয়নি। এ ধরনের কিছু না হলেই বরং সে বেশি অবাক হতো। ভালোই হল। এবার দীপার মামার ফ্যামিলির সঙ্গে নিশ্চিন্তে দেশ ঘোরা যাবে।

ফ্ল্যাটে ফিরে নির্মল জুতো খুলে সোফায় চুপ করে বসে রইল।

এ যেন একপ্রকার গলা ধাক্কা দিয়ে দিল তাকে। দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইল সে।

মোবাইলটা সামনে পড়ে আছে। এ ক’দিন সাদিকের বাড়ির সামনের সিসিটিভিগুলো দেখা অভ্যাস হয়ে গেছিল। সে অভ্যাসবশতই ফোনটা হাতে নিয়ে অ্যাপ খুলল।

রাত বারোটা এখন। সাদিকের বাড়িতে একটা কালো সেডান ঢুকে গেল।

নির্মল মোখলেশকে ফোন করল। সাদিকের বাড়ির সামনের ফুটপাথে মোখলেশ শোয়। মোখলেশের ফোন বেজে গেল। পরপর তিনবার চেষ্টার পর ফোন ধরল, ‘জি স্যার।’

‘কোথায় ছিলে?’

‘ঘুমায় পড়সিলাম সার। বলেন।’

‘একটা বড় গাড়ি ঢুকল। দেখেছ?’

‘না সার। দেখা হয় নাই।’

বিরক্তিতে ফোন ছুঁড়ে মারল নির্মল।

২৬

‘আমরা এখন কী করব?’ রাণা প্রশ্ন করল।

অপরিসর অপরিচ্ছন্ন একটা ঘর। ঢাকার ভেতরেই। রাজশাহীর ট্রেনে খানিকটা গিয়ে আবার ঢাকায় ফিরে এসেছে অমল। আপাতত সেখানে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অমল সিম বের করে রেখেছে ফোনের।

রাণার প্রশ্নের উত্তরে অমল চিন্তিতগলায় বলল, 'সাদিক আমার অনেকদিনের টার্গেট। তিলে তিলে রুমানের কভার তৈরি করেছি আমি। সাদিকের কাছে আমাকে যেতেই হবে।'

রাণা বলল, 'পুলিশ ফ্ল্যাটের হদিশ পেয়ে গেছে যে?'

অমল বলল, 'সেটা অন্য কারণেও হতে পারে। হতে পারে ওরা সাদিকের দলের সবার বাড়িতেই যাচ্ছে। আমরা তো চলে এসেছি। কেন গেছিল তা এখনও ক্লিয়ার না। সাদিককে ফোন করতে হবে।'

রাণা বলল, 'কখন করবেন?'

অমল বলল, 'দেখছি কখন করা যায়। অবশ্য ফোন ট্যাপ হবে। অন্য পথ লাগবে।'

রাণা বলল, 'অন্য পথ?'

অমল চোখ বন্ধ করল, 'একটু ভাবি। ভাবতে দাও।'

রাণার বিরক্ত লাগছে। মনে হচ্ছে কী কুক্ষণে যে ওই লোকটার কথা শুনে সে ঢাকায় আসতে গেছিল? দিব্যি চলছিল সব কিছু।

অন্য একটা অস্বস্তিও হচ্ছে তার। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে অমলের সমস্যা বাড়িয়েছে সে, আসগরকে সরিয়ে দিয়ে। কিন্তু ঠিক কী করত সে? আসগরকে দেখলেই রাগ হচ্ছিল। অদ্ভুত নির্লিপ্ত টাইপের লোক, যে কুয়ালালামপুরে তাকে ওরকম একটা পরিস্থিতিতে ফেলে মজা দেখছিল। হয়তো সেটাও সাদিকের নির্দেশেই করেছিল, কিন্তু কিছুতেই আসগরের উপর থেকে রাগটা সরছিল না তার। কোনও কোনও মানুষের উপর কারণ ছাড়াই ভীষণ রাগ হয়। আসগর সেরকম একটা লোক। সমাজের ময়লা বললে কি ময়লারও অপমান হয়? ট্রাফিকিং-এর সঙ্গেও তো যুক্ত থাকে সাদিক, আসগরও নিশ্চয়ই যুক্ত ছিল। বেশ করেছে সে! যা করেছে, ঠিক করেছে।

অমল চোখ খুলল, 'চুপ করে বসে থাকলে হবে না রাণা। আমাদের কাজে নামতে হবে। তার আগে সাদিকের কাছে যেতে হবে। রাত হলে বেরোতে হবে। এখন ক'টা বাজে?' অমল ঘড়ি দেখে বলল, 'আর আধঘণ্টা। তারপর বেরোব। ওকে?'

রাণা ঘাড় নাড়ল। বুঝতে পারছিল অমল ছটফট করছে। ওর মাথার মধ্যে এখন কী চলছে? রাণা কী করত অমলের জায়গায় থাকলে? দেশে পালাত? কী আশ্চর্য! শুরুতেই পালানোর কথা মনে হল কেন? অমলরা নিশ্চয়ই পালায় না? এসব সিচুয়েশনে কাজ করতে হয় ওদের।

নিজের মনেই হাসল রাণা। উস্তাদ লোকটা তাকে কেন এ কাজে পাঠাল? লোকটা শুধু অমলকে মারতেই পাঠিয়েছে। এখানকার কোনও কাজ যে তাকে দিয়ে হবে না, উস্তাদ সেটা খুব ভালো করেই জানে। সে রগচটা, রাগী, এ কথা লোকটা জানে না, হতে পারে না।

সম্ভবত অমলকে মারার পর অন্য খেলা শুরু হতে পারে। তাকে ধরিয়েও দিতে পারে উস্তাদ! উফ, কী বাজে একটা কাজে ফেঁসে গেল। প্রাণপণে মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করতে শুরু করল রাণা। এই পরিস্থিতিতে কয়েকটা দিন আন্ডারগ্রাউন্ড হলে পুলিশ বা ব্যাবের ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অমল সাদিককে হাতছাড়া করতে চাইবে না। গা ঢাকা দেবে না। কী করবে তবে?

শিকারের কাছে বেশি দিন থাকলে দুর্বল হবার মানসিকতা তার কোনকালেই ছিল না। তবু উস্তাদের আদেশ মেনে অমলকে ওড়ানোর চিন্তাটা তার মাথাতে কিছুতেই আসছে না। কোনও কোনও লোক থাকে, যাদের সঙ্গে থাকলে বা কথা বললে বোঝা যায় তারা আদতে ক্ষতি করার লোক নয়। তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে বলছে অমল খারাপ কাজ করতে পারে না। যদি খারাপ কাজ করত, তাহলে কি কিছুই বোঝা যেত না? কিন্তু সেদিন রাতে অমল বেরিয়েছিল...কেন? জিগ্যেস করবে? থাক।

আধঘণ্টা কেটে গেল। অমল উঠে দাঁড়াল, 'চলো। বেরোন যাক।'

রাণা বলল, 'এখন?'

অমল মাথা নাড়ল, 'কিছু করার নেই। ঘরে বসে থাকলে চলবে না। কাজ বন্ধ থাকলে বিপদ বাড়বে। চলো।'

২৭

সন্ধে নেমেছে।

বৃষ্টি পড়ছে। জানলায় চোখ রেখে চুপ করে বসেছিল রুমা। আজকাল অদ্ভুত একটা অস্বস্তি হয়। বুকটা হঠাৎ করেই কেমন করে ওঠে। ঘুমের ঘোরে আতঙ্ক আসে। অদ্ভুত সব দুঃস্বপ্ন আসতে শুরু করে।

এই ভয়টা কোত্থেকে আসে সে জানে না। তবে এলে শরীর খারাপ লাগে।

'সাহেব আইসে।'

জরিনা নিচুগলায় বলে গেল। রুমা সামলে বসল। সাদিক চিন্তিত মুখে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খাটে বসল, 'কেমন আছ তুমি?'

রুমা বলল, 'ভালো। আপনি?'

সাদিক মাথা নাড়ল, 'একবারেই ভালো নাই। আসগরের কথা শুনছ?'

রুমা ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ। শুনছি।'

সাদিক বলল, 'বুঝতে পারতাস কেমন ভয়ের কাজ করি? আজ আছি, কাল কখন আজরাইল চইলা আইব, কেউ জানি না।'

রুমা সাদিকের দিকে ভালো করে দেখল। চোখের তলায় কালি পড়েছে। বোঝা যাচ্ছে, সাদিক বেশ টেনশনে আছে। সে বলল, 'বুঝছি। আপনি একটু শান্ত হন।'

সাদিকের ফোন বাজতে শুরু করল। সাদিক ফোন ধরল, 'কী হইল?...হ...বুঝছি...ব্যাব নজর দিছে? ঠিক আছে। দেখা যাব।'

ফোন রেখে সাদিক ঘামতে শুরু করল। রুমা বলল, 'কী হইল?'

সাদিক বলল, 'ব্যাবের কয়েকটা লোক ঘুরতেছে। কী চায় বুঝছি না।'

রুমা বলল, 'কেউ নাই? আপনি তো অনেকরে চেনেন।'

সাদিক বলল, 'চিনলে হবে? তুমি বুঝবা না। কতজন যে কত ধান্দায় ঘুরতাছে, সবার আলাদা আলাদা ধান্দা। আমি বুঝতাছি না কী করুম।'

রুমা বলল, 'আপনার লগে একখান কাগজ ছিল। দিমু?'

সাদিক খানিকটা চমকাল, 'কে দিছে?'

রুমা খাটের তোশকের তলা থেকে একটা কাগজ বের করে সাদিকের হাতে দিল। একটা চিরকুটে লেখা, 'ফ্ল্যাটে পুলিশ এসেছিল। আমরা দুজন সাইডে থাকলাম। কাগজ ছিঁড়ে দেবেন। খোদা হাফেজ।'

সাদিক রুমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রুমান আইছিল?'

রুমা বলল, 'আনোয়াররে দিয়া পাঠাইছে।'

সাদিক বলল, 'ওর ফ্ল্যাটেও পুলিশ চলে গেছে?'

রুমা বোঝার চেষ্টা করছিল, সাদিক অমলের ব্যাপারে কী ভাবছে। সে বলল, 'আপনার কাছের লোক বলে পুলিশ গেছে?'

সাদিক টাওয়েল নিয়ে মুখে জমে থাকা ঘাম মুছল, 'পুলিশ তো না, তুমি বোঝো না, বললাম তো। পুলিশ না। ব্যাব গেছে।'

রুমা বলল, 'আপনি টেনশন করেন ক্যান?'

সাদিক বলল, 'কারণ আছে। বুঝবা না।'

রুমা রাগের ভান করল, 'আপনি শুধু কন বুঝবা না, বুঝবা না, আপনি বোঝায়ে দেখেন না।'

সাদিক মাথা নাড়ল, 'তোমার বুইঝা কাম নাই। কামিজ খোল।'

রুমা নগ্ন হল। সাদিক রুমাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল কিছুক্ষণ। রুমার বুকে মাথা গুঁজে বলল, 'মাথায় হাত বুলায়ে দাও।'

রুমা অবাক হল। তবে সাদিকের মাথায় হাত বোলাতে শুরু করল। সাদিক বলল, 'খুব চিন্তা গো সাকিনা, খুব চিন্তা।'

রুমা বলল, 'কোথাও চইলা যাওন যায় না?'

সাদিক সোজা হয়ে বসল, 'এইটা তুমি ভাইবা বললা?'

রুমা বলল, 'না। এমনিই মনে হইল।'

সাদিক বলল, 'আমার মাথায় আসে নাই জানো। কথাটা খারাপ কও নাই। মাঝে মাঝে মাইয়া মাইনষের বুদ্ধিও নেওন লাগে। আমি দু-দিন দুবাই ঘুরতে যাইতেই পারি। কে কী কইব? তুমি যাবা আমার লগে?'

রুমা বিস্মিত হল, 'আমারে নেবেন আপনি?

সাদিক বলল, 'হ। আমার আর ভাল্লাগে না কিছু। একা একা কই যামু? তুমি আমার লগে যাবা। আমি ব্যবস্থা করতাসি।'

রুমা বলল, 'কবে যাবেন?'

সাদিক বলল, 'কালই যামু। সব ঠিক কইরা ফেলুম, তুমি ভাইব না।'

রুমা বলল, 'ভাবি যাবে না?'

সাদিক জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'না। ও থাকবে। ও গেলে ওগো সন্দ হইবে।'

রুমা বলল, 'কাগো সন্দ হইবে?'

সাদিক বলল, 'আছে। তুমি বুঝবা না। আমি যাই। ব্যবস্থা করি।'

ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল সাদিক।

রুমা কামিজ পরে নিল। বাইরে গিয়ে দেখল জরিনা টিভি দেখছে। সে বলল, 'চল। বাজার যামু।'

জরিনা অবাক হল, 'এখন যাবা?'

রুমা বলল, 'হ। কাম আছে। চল।'

জরিনা উঠল, 'চলো।'

দুজনে বেরোল। গলিটা অন্ধকার। রুমা খানিকটা যাওয়ার পর থমকে দাঁড়াল। পেছনে কেউ আসছে। সে ঘাড় ঘোরাল। কেউ নেই। জরিনাকে বলল, 'কে রে?'

জরিনা ভয় পেয়ে রুমার হাত চেপে ধরল। রুমা চিৎকার করল, 'কে ওখানে?'

অন্ধকার চিরে একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসতে শুরু করল। রুমা জোর পায়ে আলোর দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ভিড়ের মধ্যে পৌঁছে দেখল মূর্তিটা আর ফলো করছে না।

জরিনা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'ভয় লাগে আপা।'

অন্য সময় হলে রুমা ভয় পেত না। এখন হঠাৎ করেই একটা অস্বস্তি হল। তার পরিচয় যদি বেরিয়ে যায়, তাহলে কি ওরা তাকে বাঁচিয়ে রাখবে?

নির্মল বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল, কোনমতে ফোন ধরল, 'হ্যালো।'

'তুই কোথায়?' সোহানের উত্তেজিত গলা ভেসে এল।

নির্মল বলল, 'কেন?'

'আনোয়ার স্যার খুন হয়েছেন।'

'মানে?'

'মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছিলেন। সেখানেই কেউ শ্যুট করেছে। ওখানেই স্পট।'

ফোন কেটে দিল নির্মল। মাথা কাজ করছে না। আনোয়ার স্যার কি সাদিকের ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেছিলেন? ওরা কি তার ব্যাপারেও কিছু জেনে গেছে?

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল সে। আনোয়ার স্যার তার বাবার মতো। সব সময় আগলে রাখতেন। এমন লোক হঠাৎ করে নেই হয়ে যাওয়া একটা বিরাট ধাক্কা। বাইক না নিয়ে যাওয়াই ঠিক করল। গাড়ি বের করল। মাথা পুরো ফাঁকা হয়ে গেছে। ড্রাইভ করতে গিয়ে পা কাঁপছে। গাড়ি চালাতে চালাতে চারদিকে দেখে নিল। কেউ ফলো করছে নাকি বোঝা যাচ্ছে না। আনোয়ার আলিকে মেরে দিল? অবিশ্বাস্য এবং অভাবনীয়!

স্যারের বাড়ির সামনে বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। খানিক দূরে গাড়ি পার্ক করে বাড়ির ভেতর ঢুকল সে। থমথমে হয়ে আছে গোটা বাড়ি। বডি শোয়ানো। ম্যাডাম পাথরের মতো বসে আছেন। দু'চোখে জলের ছিটেফোঁটাও নেই। সোহান বলল, 'তুই ঘুমোচ্ছিলি?'

নির্মল বলল, 'হ্যাঁ। বডি পোস্ট মর্টেমে কখন যাবে?'

'এখনই। এই রে, সোবাহান স্যার তোকে ডাকছে কেন?'

নির্মল দেখল সত্যি সত্যিই সোবাহান স্যার হাত নেড়ে তাকে বাড়ির বাইরে যেতে ইশারা করছেন। সে বেরিয়ে গেল। সোবাহান এসে বললেন, 'কী ভীষণ আনফরচুনেট না?'

নির্মল মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ স্যার।'

সোবাহান বললেন, 'কাল রাতেও কথা হল। তোমার ব্যাপারে মিনিস্টার স্যারের অর্ডারটাও বললেন। বলছিলেন নির্মলের সঙ্গে ব্যাপারটা ঠিক হল না।'

নির্মল বলল, 'ইটস ওকে স্যার। যেমন অর্ডার আসবে, মানতে তো হবেই।'

সোবাহান বললেন, 'হ্যাঁ। সেটাই। তুমি আজকেই জয়েন করে যেও। আমাদের অফিসে তোমার অ্যাক্সেসটা বন্ধ করার অর্ডার আছে। আমার কিছু করার নেই বুঝলে তো? উপর মহলের অর্ডার, আমি কী করতে পারি বল? আনোয়ার স্যারও থাকলেন না, ওর দায়িত্বটা আমাকেই নিতে হবে। সমস্যা বেড়ে গেল।' সোবাহান দুঃখি মুখ করার চেষ্টা করলেন। তিনি যে বিন্দুমাত্র দুঃখিত না, তা দিব্যি বোঝা গেল।

নির্মল বলল, 'ঠিক আছে স্যার। যেমন বলবেন, তেমনই হবে।'

সোবাহান নির্মলের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেল আমার। আমি চেষ্টা করছি তোমাকে অফিসে ফিরিয়ে আনার। ভেবো না তুমি। মন খারাপ কোরো না। যেভাবে কাজ করছিলে সেভাবেই করো। তোমার সার্ভিস রিভলভার অফিসে জমা দিয়ে দিও।'

নির্মলের মুখটা তেতো হয়ে যাচ্ছিল। সোবাহানকে সে কোনকালেই পছন্দ করে না। মিষ্টি মুখের আড়ালে এভাবেই ছুরি চালায়। ইচ্ছে ছিল আরও কিছুক্ষণ আনোয়ার স্যারের মৃতদেহের কাছে থাকে, কিন্তু সোবাহানের মতো লোক থাকলে সেখানে থাকা সম্ভব না। সে ঠিক করল বাসায় ফিরে যাবে।

হাঁটতে শুরু করল। অনেক লোক আসছে। পাড়ার কৌতূহলী লোকের ভিড়ও বাড়ছে।

গাড়ির সামনে এসে নির্মল দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ির পেছনের কাচে কেউ ইট মেরে গেছে। কাচের অনেকটা অংশ ভেঙে গেছে।

ফোন বাজছে। দীপা ফোন করছে। ধরল সে, 'বল।'

'কী গো, কী হয়েছে? আনোয়ার স্যার নাকি খুন হয়েছেন?'

'হুঁ। এখানেই আছি।'

'তুমি ঠিক আছ তো? কোথায় ছিলে তুমি?'

'ঘুমোচ্ছিলাম। বাসায় ছিলাম।'

'আমি ফিরছি। আজকেই চলে আসছি।'

'আসতে হবে না। ভেবো না। তোমরা ঘোর। চিন্তা করতে হবে না।'

'চিন্তা করতে হবে না মানে? আমি চিন্তা করব না তো কে করবে? তোমার চিন্তা করার নতুন লোক হয়েছে নাকি?'

'আমি স্যারের বাসায় আছি। পরে কথা বলছি। ফিরতে হবে না। অসুবিধা নেই।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ। ঠিক আছি। রাখলাম।'

ফোন কেটে নির্মল গাড়ির কাচ দেখল। আশেপাশে কেউ নেই। শ্বাস ছাড়ল। কেউ কি লোক লাগাল তার পেছনে?

২৯

লতিফ চৌধুরী তার ঘরে পায়চারি করছে। মাঝে মাঝেই দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে। লতিফের বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে, তবু চেহারায় এখনও যথেষ্ট শক্তি আছে। ছেলে সফিক একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আছে। আব্বা এখন যেমন গম্ভীর হয়ে আছে, কথা বলা যে যাবে না, বুঝতে পারছে।

লতিফ অনেক দিন পর বাসার বাইরে বেরোবে। নতুন পাঞ্জাবি আনা হয়েছে। পান দেওয়া হয়েছে। নিজে নিজেই বক বক করে যাচ্ছে সে।

'দাঁড়ায় আছ ক্যান? কিছু বলবা?' হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল লতিফ।

সফিক মাথা চুলকে বলল, 'টেকা লাগব।'

লতিফ পকেট থেকে গার্ডার দেওয়া এক তাড়া নোট বের করে সফিকের দিকে ছুঁড়ে মারল, 'লও। উড়াও।'

সফিক নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। নোটের তাড়া মেঝেয় পড়ে গেছিল। তড়িঘড়ি সেটা তুলে পকেটস্থ করে বলল, 'আপনি কই যাবেন?'

লতিফ বলল, 'সেটা তোমার জানবার দরকার নাই। নিজের কাজ করো।'

সফিক ঘাড় নাড়ল। হর্নের শব্দ পাওয়া গেল ঘরের বাইরে থেকে। লতিফ ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। সফিক অবাক হয়ে দেখল আব্বা হুজুর একটা বড় গাড়িতে গিয়ে উঠল।

গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া কেউ নেই। লতিফকে দরজা খুলে গাড়িতে তুলে ড্রাইভার দরজা বন্ধ করে ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট করল। লতিফের ঘরে এসি নেই। গাড়ির এসি একেবারে হিমশীতল করে দিচ্ছিল। সে মৃদু গলায় বলল, 'ড্রাইভার সাহেব, একটু গরম করা যাইব না?'

ড্রাইভার গাড়ির তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিল। এবার লতিফের আরাম লাগল। আহ্লাদিত গলায় বলল, 'এবার ঠিক আছে।'

ড্রাইভার নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগল। লতিফের ভারি মজা লাগছিল। কী ভালো গাড়ি! দেশটা পাকিস্তান থাকলে এরকম গাড়ি তারও থাকত। জীবনে যা চাইত তাই পাওয়া যেত। এমন ভাগ্য, কিছুই হল না। বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

একটা ছোট অথচ ছিমছাম বাড়ির ভেতর গাড়ি প্রবেশ করল। ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিল।

লতিফ গাড়ি থেকে নামামাত্র একজন সুবেশ যুবক এসে বলল, 'আইয়ে।'

লতিফ খুশি হল। এরা অনেক সম্মান দিচ্ছে তো তাকে। দেওয়ার কথা ছিল না। দিচ্ছে এই অনেক।

ঘরের ভিতর মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক লতিফকে দেখামাত্র সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উর্দুতে বলল, 'আসুন জনাব। আসুন।'

লতিফের চোখে জল চলে এল। তাকে সোফায় বসানো হল।

মাঝবয়সি ভদ্রলোক হাসিমুখে বলল, 'আমি সঈদ। আপনার দেশে এই প্রথম আসা আমার।'

লতিফ তওবা করে বলল, 'এসব কী বলছেন জনাব? এটা তো আপনাদেরই দেশ। আমাদের দেশ বলে শরমিন্দা করছেন আমায়!'

সঈদ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়াল, 'ওসব আমায় বলবেন না জনাব। এই দেশ এখন আর পাকিস্তানের নেই। থাকলে এভাবে লুকিয়ে আসতে হতো না। শুনলাম সাদিক শেখও দেখা করতে আসতে পারবে না?'

লতিফ দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। আমাকে একাই আসতে হল। সাদিকের উপর অনেকের নজর পড়েছে।'

সঈদ বলল, 'স্বাভাবিক। হিন্দুস্তানিরা পেছনে লেগে পড়েছে। আপনাদের দেশ তো ওরাই দখল করে নিল। কেউ কিছু বলবে না, সবাই শুধু ওদের খিদমত খাটার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছে।'

লতিফ বলল, 'বেতমিজ জনাব। সবাই বেতমিজ। তবে সুখবর হল, দেশে আমাদের পন্থী মানুষও সংখ্যায় ওদের সমান সমান। কোথাও কোথাও বেশি। ইনশাল্লাহ, ভালোয় ভালোয় ভোটটা হয়ে গেলে আমাদের আর এ দেশের ভেতরে লুকিয়ে থাকতে হবে না।'

সঈদ বলল, 'ঠিক আছে। সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। আর ভবিষ্যতকে নিরাপদ করাই আমাদের কাজ।'

লতিফ ঘাড় নাড়ল, 'সেটা আমরা পারব জনাব। ইন্ডিয়ার হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আমরা বাঁচাবোই।'

সঈদ একটা ট্যাব বের করে লতিফের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চারটে মাদ্রাসা। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল আর রাজশাহী। এই চারটে মাদ্রাসায় আপনার ভালো কন্ট্রোল আছে শুনেছি।'

লতিফ ঘাড় নেড়ে বলল, 'জি জনাব। আমি যা বলবো, এরা তাই করবে।'

সঈদ খুশি হয়ে বলল, 'আপনার বলার সময় এসে গেছে জনাব।'

লতিফ আনন্দে অনেকবার হাত কচলে ফেলল।

৩০

রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। অন্য ঘরগুলো ভর্তি হয়ে গেছে। গানের শব্দ ভেসে আসছে। রুমা দরজা বন্ধ করে বসে আছে।

অস্বস্তি হচ্ছে একটা। ছায়ামূর্তিটাকে ভোলা যাচ্ছে না। তার পিছু নিয়েছিল কেন? খবরটা জানাতে হবে। না জানালে অন্য সমস্যা তৈরি হতে পারে। বেরোলে এখনই বেরোতে হবে। সকালে বেরোনোর অনেকরকম

সমস্যা আছে। তাকে যে দুবাইতে নিয়ে যেতে চাইছে সাদিক, সেটা তো জানানোই গেল না তখন।

জরিনা শুয়ে আছে মেঝেতে। রুমা উঠে দাঁড়াল। বোরখা পরে নিয়ে দরজা খুলল। ছেলেগুলো ঘরে আছে। বারান্দায় কেউ নেই।

সে বাইরের দরজা ঠেলে রাস্তায় এল। সন্তর্পণে চারদিকে তাকাল। না। কোথাও কেউ নেই। ধীরপায়ে হেঁটে বড় রাস্তায় পৌঁছল। দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। ফুটপাথের লোকজন শুয়ে পড়েছে।

রুমা মাথা নিচু করে অন্ধ ভিখারির উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল। সোনার দোকান, তার সামনে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে লোকটা। তার কাছেই রিপোর্টিং-এর অর্ডার ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা লোকটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। একটা পুঁচকে তার মাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে খানিকটা দূরে।

চাদর জড়ানো লোকটার পায়ে পা দিয়ে আলতো করে ঠেলা দিল সে। সাড়া পেল না। গলা খাকরে রুমা বলল, 'পাখি পালানোর তালে আছে।'

তাকে চমকে দিয়ে চাদর সরে গেল। রুমা চমকে উঠে দেখল তার দিকে একটা রিভলভার তাক করে রাখা। লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে রুমার চুলের মুঠি ধরে বলল, 'চল।'

রুমা বিস্মিত হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। সে এতটাই বিস্মিত হয়ে গেছিল, ন্যূনতম প্রতিরোধটুকুও করতে পারল না।

খেয়াল হল রাস্তায় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

অসম্ভব তৎপরতায় তাকে গাড়িটায় টেনে তুলল লোকটা। রুমার চুলে ব্যথা লাগছিল। বমি পাচ্ছে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। রুমা বলল, 'কে আপনি?'

লোকটা বলল, 'তুই কে?'

রুমা বলল, 'আমি সাকিনা। সাদিক শেখের বাসায় থাকি। আপনারা জানেন না সাদিক শেখ কে।'

লোকটা সিগারেট ধরাল, 'খুব ভালো করে জানিস এসব ঢপের কথা বলে পার পাওয়া যাবে না। যত তাড়াতাড়ি তুই বলে দিবি এখানে তুই কী করতে এসেছিস, তত তাড়াতাড়ি ছাড় পাবি। নইলে তোর কপালে যে কী আছে, তুই নিজেও ঠিক করে জানিস না।'

রুমা জোরে শ্বাস নিল। লোকটা যে বাজে কথা বলছে না স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

সে চুপ করে বসে রইল। গাড়ির মধ্যে সিগারেটের গন্ধ মাথা ধরিয়ে দিচ্ছে।

জানলার বাইরে দেখার চেষ্টা করল রুমা। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রাতের শহরে গাড়ির গতিবেগ অনেকটাই বেশি।

বেশ খানিকটা পথ যাবার পর অলসভাবেই লোকটা পকেট থেকে একটা স্প্রে বের করে রুমার নাকি ছিটিয়ে দিল।

রুমা জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান যখন ফিরল, রুমা দেখল একটা ঘরে ধবধবে সাদা খাটে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। উঠে বসল সে।

তার সামনে প্রফেসরের মতো একটা লোক সোফায় বসে আছে। এত সুন্দর মানুষ হতে পারে, তার ধারণা ছিল না। রিমলেস চশমা পরে কেমন কবির মতো মুখ করে তার দিকেই তাকিয়ে বসে ছিল। তার জ্ঞান ফিরেছে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়াল।

শান্ত মুখে একটা ছোট ব্লেড নিয়ে এসে রুমার হাতে চালিয়ে দিল। রুমা বিস্মিত হবার সময়টুকু পেল না। রক্ত পড়তে শুরু করেছে হাত থেকে।

লোকটা পকেট থেকে একটা ছোট কাগজ বের করে ক্ষতস্থানে চেপে ধরল। কী অসহ্য যন্ত্রণা! রুমা আর্তনাদ করে উঠল। সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই দিনগুলো যখন দিব্যেন্দু ঠিক এই ধরনের কাজগুলোই দিনের পর দিন করে যেত তার সঙ্গে। সে চিৎকার করে উঠল, 'কে? কে আপনি?'

লোকটা ফিস ফিস করে বলল, 'আমি? আই এস আই। গিয়াস। আই এস আই কা নাম তো সুনাহি হোগা, নেহি?'

রুমা শিউরে উঠল।

৩১

একটা ডায়েরি খুলে বসে আছে অমল। কথা বলতে বারণ করেছে। রাণা চোখ বন্ধ করে শুয়েছে ঘুপচি ঘরটাতে। কোনমতে দিন কেটেছে। সন্ধে হয়েছে। দুপুরের দিকে রাণার ঘুম পেয়েছিল। উঠে দেখল অমল তখনও ডায়েরিতে লিখে যাচ্ছে। সে জিগ্যেস করল, 'বাথরুম যেতে হবে।'

অমল বলল, 'বাইরে বেরিয়ে করিডোরের শেষে।'

রাণা বাথরুম থেকে ঘুরে এল। বাথরুম অপরিষ্কার। অভ্যাস আছে তার। ফিরে এসে বলল, 'আমরা কি ঢাকায় থাকব?'

অমল বলল, 'না। বেরোতে হবে। থাকা যাবে না হয়তো।'

রাণা বলল, 'ডায়েরিতে কী আছে?'

অমল বলল, 'বেশ কিছু কন্ট্যাক্ট। সবক'টা ঝালিয়ে নেওয়ার সময় এসেছে। আপাতত চলো বেরোই।'

তৈরি হতে বেশিক্ষণ লাগল না। অমল দুজনেরই ভোল পাল্টে ফেলেছিল।

স্টেশন পৌঁছে রাজশাহীর ট্রেনে উঠে বসল। অমলের নির্দেশমতো রাণা খানিকটা দূরত্ব রেখে বসল।

ট্রেনে রাণার পাশে বসে থাকা ভদ্রলোক বেশ কয়েকবার ভাব জমাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শেষমেশ রাণার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাণা বারণ করল না। বিরক্ত লাগছে। নিজেকে অসহায় লাগছে। এখানে কিছু করার নেই তার। অমলের নির্দেশে চলা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। অমল এতটাই গম্ভীর হয়ে আছে, ওর সঙ্গে কথা বলার কথাও ভাবতে পারছে না সে।

জানলার বাইরে দেখল রাণা। ট্রেন নিজের গতিতে চলছে। কয়েকটা স্টেশন একবারে ফাঁকা। ট্রেনে কেউই উঠল না এত রাতে।

রাত দেড়টা নাগাদ উল্লাপুর স্টেশনে এসে পৌঁছল। অমল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ইশারা করল নেমে যেতে।

রাণা উঠল। ট্রেন থেকে বেশ কয়েকজন নামল।

অমল হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছে। রাণা খানিকটা দূরত্ব রেখে অমলকে ফলো করল। স্টেশনের বাইরে কয়েকটা অটো দাঁড়িয়ে আছে। সি এন জি গ্যাসে চলে বলে এখানে সে নামেই ডাকা হয়। অমল সি এন জি চালককে তুলল। চালক ঘুম চোখে উঠে বলল, 'কোথায়?'

অমল বলল, 'চৌধুরী পাড়া।' অটো স্টার্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে রাণা অটোতে উঠে বসল। সি এন জি চালক অটো দাঁড় করিয়ে দিল। অমল চাপা গলায় বলল, 'চলেন, উনি আমার লগেই আছে।'

নিস্তব্ধ পাড়া। মোড়ের কাছে তাদের নামিয়ে অটো চলে গেল। পাড়ার কুকুরগুলো ছুটে এল। অমল অদ্ভুত একটা শিস দেওয়া শুরু করল। কুকুরগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো চুপ করে গেল। রাণা বিস্মিত হল। এ ক্ষমতা সবার থাকে না। অমলের মধ্যে একজন ম্যাজিশিয়ানও লুকিয়ে আছে তবে? অদ্ভুত তো!

অমল ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'বেশিদূর হাঁটতে হবে না। এই তো।'

একটা দরজার সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে অমল কলিং বেল টিপল। রাণার মনে হল সত্যিই অমল কাউকে চেনে তো? নাকি হুট করে বেল টিপে দিল?

তার আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করে একজন মাঝবয়েসি লুঙ্গি পরা লোক খালি গায়ে বেরিয়ে এল। অমল সঙ্গে সঙ্গে হাসল, 'কী চাচা? কেমন আছ?'

লোকটা সভয়ে চারদিক দেখে নিয়ে বলল, 'এসো এসো ভেতরে এসো।'

অমল রাণার দিকে তাকাল, 'ইমতিয়াজ চাচা। চিন্তা নেই। এসো।'

রাণাকে নিয়ে অমল ঘরের ভেতর ঢুকতেই ইমতিয়াজ তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'এখানে কী করতে এলে তোমরা?'

অমল বলল, 'জল খাওয়াও। কী আছে খাওয়াও, খিদে পেয়েছে।'

ইমিতিয়াজ ফ্রিজ থেকে মিষ্টি নিয়ে এল। ঠান্ডা জলের বোতল দিল। দুজনে সেসব খেয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

অমল বলল, 'ঢাকায় মনে হচ্ছে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে। ধরা পড়ে যাব। আপাতত এখানেই আন্ডারগ্রাউন্ড থাকতে হবে।'

ইমতিয়াজ ঘাবড়ে গেল, 'কী করেছ?'

অমল হাই তুলে বলল, 'জানো না? আসগরকে উড়িয়ে দিয়েছি। ধরে নাও ব্যাব এবার সাদিকের গুষ্টি খুঁজে ফেলবে।'

ইমতিয়াজ বলল, 'জানি না তো!'

অমল বিরক্তগলায় বলল, 'খবর দেখো না?'

ইমতিয়াজ বলল, 'অনেকদিন দেখা হয় না।'

অমল বলল, 'কেউ খবরও দেয়নি?'

ইমতিয়াজ মাথা নাড়ল, 'নাহ্। এবার কী হবে?'

অমল বলল, 'দুটো উপায় আছে। হয় তোমার বাড়িতেই এক বছর থাকব। নয় রাতের মধ্যে ইন্ডিয়া পালিয়ে যেতে হবে।'

ইমতিয়াজ বলল, 'পালিয়ে যাও। আমি তোমাদের একবছর ধরে টানতে পারব না। এগুলো ছোট জায়গা। লোকজন খোঁজ খবর নেয়। পারলে ঘরের ভেতর চলে আসে। এখানকার কালচারটাই ওরকম। মাঝখান দিয়ে আমিও ধরা পড়ে যাব।'

অমল রাণার দিকে তাকাল, 'তাহলে? তোমার আর চিন্তা নেই। দেশে ফিরে যাবে।'

রাণা বলল, 'তাহলে ঢাকায় ফিরে গিয়ে সাদিককে উড়িয়ে দিয়ে দেশে ফিরলেই তো হত।'

ইমতিয়াজ অবাক হয়ে রাণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এত রাগ কেন আপনার?'

অমল বলল, 'ওকে ঠান্ডা বিরিয়ানি খাইয়েছে, ওটাই ওর রাগের কারণ।'

রাণা বলল, 'না। ওটা রাগের কারণ না। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা অন্য মানুষের সঙ্গে চাকরের মতো ব্যবহার করে। এ ধরনের মানুষ দেখলে আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। সাদিক হল এই ধরনের মানুষ।'

অমল ইমতিয়াজকে বলল, 'সাকিনা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কেউ সাদিকের খবর দিতে পারবে না। সাকিনাকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে।'

ইমতিয়াজ গম্ভীর মুখে বলল, 'তোমরা বোস। আমি আসছি একটু।'

ইমতিয়াজ ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, 'সাকিনাকে কন্ট্যাক্ট করা যাচ্ছে না। রাত বলে হয়তো।'

অমল হাই তুলে বলল, 'ঠিক আছে। আপাতত ঘুম দরকার। বালিশ বিছানা লাগবে।'

ইমতিয়াজ কটমট করে অমলের দিকে তাকাল।

৩২

'ঠিক কোন জায়গা থেকে তুলেছে তোকে? পশ্চিম বাঙ্গাল?'

উর্দুতে প্রশ্ন করল গিয়াস। একটা চেয়ারে হাত বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে রুমাকে। কেটে যাওয়া জায়গাটায় অসহ্য ব্যথা করছে। রুমা বাঙাল ভাষাতে বলল, 'আমাকে ছাইড়া দেন। আমি কিছু করি নাই।'

গিয়াস চোখ ছোট ছোট করে বলল, 'তাহলে ওই খবরিটার কাছে অত রাতে কী করছিলিস?'

রুমা বুঝল গিয়াস বাংলা ভালো বোঝে। সে কাঁদার অভিনয় করল, 'উনি তো ঔষধ দেন আমায়। উনি দিনে ভিক্ষা করেন, রাইতে ঔষধ দেন। আমি তাই আনতে গেছিলাম।'

গিয়াস বলল, 'ওষুধ দেয়? কীসের ওষুধ দেয় আজহার তোকে?'

রুমা বলল, 'আমি ওর নাম জানি না। আমি শুধু জানি, আমার যখন খুব শরীল খারাপ লাগে, বাবার এঁটো খাবার খেলে সে অসুখ সেরে যায়। সবার এঁটো খাবার পর বাবা কিছু খাবার রেখে দেয়, আমি সেটা আনতে যাই।'

গিয়াস তীক্ষ্ণ চোখে রুমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, 'কক্সবাজারে যে মেয়েটাকে মারা হয়েছিল, তোকে এখানে আনার জন্যই তো?'

রুমা সজোরে মাথা নাড়ল, 'না ছার। আপনি খোঁজ নেন। আমি খুব গরিব একজন মাইয়া। আমার কুনো দোষ নাই।'

গিয়াস চেয়ার এগিয়ে নিয়ে এসে রুমার কাছে বসে বলল, 'হয় তুই সত্যি বলছিস, নয় তুই ভীষণ ওয়েল ট্রেইন্ড। কে ট্রেনিং দিয়েছে তোকে? তুষার রঙ্গনাথন? আশরফ খান? নাকি সায়ক বড়াল? বল।'

রুমা আকাশ থেকে পড়ার ভান করল, 'কীসব বলতাসেন আপনি! এরা কারা?'

গিয়াস চোখ নামিয়ে রুমার বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুল দেখল। বলল, 'তোর পায়ে কী হয়েছে?'

রুমা গিয়াসের চোখে চোখ রেখে বলল, 'উনি খুব অত্যাচার করতেন।'

গিয়াস উঠে রুমার হাত খুলে দিল। হাতে সিগারেটের ছ্যাকা দেখে বলল, 'এটা?'

রুমা বলল, 'উনি করতেন।'

গিয়াস রুমার চুলের মুঠি ধরে বলল, 'কেন করত? কী করতিস তুই?'

রুমা বলল, 'আমি কিছু করতাম না। এমনি মারতেন।'

গিয়াস হিস হিস করে বলল, 'তুই শালী সাদিকের বেশ্যা, আমাকে বোঝাচ্ছিস তুই কিছু করতিস না? বেশ্যাগিরি করতিস তাই তো? বেতমিজ আওরাত, তোর বর কী করে মারা গেছিল?'

রুমা কাঁদতে শুরু করল। সজোরে কাঁদতে লাগল। গিয়াস রুমার গালে চড় কষিয়ে বলল, 'বল কী করে মারা গেছিল?'

রুমা বলল, 'খুন হয়েছিল। কে নাকি ওর মাথায় হাতুড়ি মেরে খুন করে ছিল ওকে।'

গিয়াস বলল, 'কে মেরেছিল? আমি নামটা জানতে চাই।'

রুমা বলল, 'আমি জানি না। বিশ্বাস করুন।'

গিয়াস বলল, ‘কী করতে পাঠিয়েছে তোকে র?’

রুমা বলল, ‘সেটা কী?’

গিয়াস কিছুক্ষণ একা একা দাপাল। রুমাকে আরও কয়েকটা চড় কষাল। কোনও লাভ হল না। রুমার পেট থেকে একটা কথাও বের করতে পারল না। তার ফোন বাজছিল। পকেট থেকে ফোন বের করে দেখল সাদিক ফোন করছে। সে ফোন তুলল, ‘বলো।’

সাদিক নরম গলায় বলল, ‘জনাব, আমার খুব কাছের একজন আওরাতকে পাওয়া যাচ্ছে না। শুনলাম আপনি নাকি তাকে তুলে নিয়ে গেছেন। আমি কিন্তু খুব ভালো করে জানি সে নির্দোষ।’

গিয়াস গালাগাল দিতে শুরু করল, ‘তোদের লজ্জা লাগে না? আমাদের কাছ থেকে এত ডলার নিচ্ছিস, আর এ দেশে বসে মেয়েবাজি করে যাচ্ছিস? এভাবে জিহাদ আসবে?’

সাদিক বলল, ‘জনাব, ও মেয়ে খুবই ভালো মেয়ে। দুঃখী মেয়ে। আপনি ওকে কষ্ট দিয়েন না। আপনাকে আনন্দ দিবে। সাত দিন রেখে দেন। তারপরে না হয় ছেড়ে দেন। কিন্তু ওরে অত্যাচার করেন না। এদেশে ভালো মাইয়া পাওয়া যায় না, কোথায় সাকিনার মতো ভালো মাইয়া আছে?’

গিয়াস বলল, ‘বুঝলাম। তার আগে বল আগের মেয়েটা কক্সবাজারে হারিয়ে গেছিল কী করে?’

সাদিক বলল, ‘জনাব, আমার কথা শুনেন। ও মেয়েকে আটকায়া রাখা যাইত না। সব দিয়েছিলাম, তারপরেও অন্য দিকে যাওয়ার আসক্তি ছিল। পূর্ব পরিচিত এক ছেলের সঙ্গে এক ঘরে ছিল জনাব। আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি, উড়ায় দিছিলাম। কিন্তু এ মেয়ে একবারে পবিত্র।’

গিয়াস বলল, ‘পবিত্র?’

সাদিক বলল, ‘জি জনাব।’

গিয়াস বলল, ‘এক দিনের মধ্যে এ মেয়ের যেখানে বাড়ি, সেখানকার লোকেদের দিয়ে একে চিনিয়ে আনার ব্যবস্থা কর। লোকাল লোক যদি এই মেয়েটাকে চেনে, আমি ছেড়ে দেব। নইলে বাকিটা আমি বুঝব।’

সাদিক বলল, ‘এটা একটা কথা জনাব? আমি এখনই দেখছি। কিন্তু আপনি সাকিনারে কষ্ট দিয়েন না।’

গিয়াস ফোন কেটে দিল।

রুমার গোটা শরীর যন্ত্রণায় জ্বলছে। সে শুধু একটা কথাই মনে করে চলেছে। গিয়াস দিব্যেন্দুর তুলনায় কিচ্ছু না।

৩৩

ট্রেনিং সেন্টারে জয়েন করে নির্মল হতাশ হয়ে বসে রইল। কোনও কাজ নেই। এখন নিউ ট্রেনিও নেই। একটা ঘরে সারাদিন একা একা বসে বাড়ি চলে যেতে হবে। মানুষ তো হতাশাতেই মরে যাবে এই ডিপার্টমেন্টে এসে! বোঝাই যাচ্ছে পানিশমেন্ট পোস্টিং এটা।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে নির্মল মোখলেসকে ফোন করল। মোখলেস বলল, ‘আপনারে সরায় দিসে শুনলাম। আনোয়ার স্যারের খবরের পর থেকে মাথা কাজ করতাসে না স্যার। পুরা আউলাইয়া গেছি। আমি কি করুম সার?’

নির্মল বলল, ‘কী খবর ওদিকে?’

মোখলেস বলল, ‘আজ তো মাল হেবি ব্যস্ত। তিনবার বাইরাইসে।’

নির্মল বলল, ‘আর? কেউ এল?’

মোখলেস বলল, 'না। কেউ আসে নাই।'

নির্মল বলল, 'ঠিক আছে। নজর রাখো। ধরা পড়ে যেও না যেন।'

মোখলেস হাসল, 'নিশ্চিন্তে থাকেন স্যার।'

ফোন রেখে নির্মল পায়চারি শুরু করল। সাদিকের উপর নজরদারি রাখা দরকার ছিল। কিছুই হল না। ট্রেনিং-এর বস রাসেল সাহেব পাশের চেম্বারে আছেন। জয়েনিং-এর সময় বলে দিয়েছেন সে কোথাও গেলে যেন তাকে বলে যায়। নির্মল দরজার ফাঁক থেকে দেখল রাসেল সাহেব ঘুমোচ্ছেন। এখানে হয়তো এটাই কাজ।

সে কিছুক্ষণ এদিক সেদিক করে রাসেল সাহেবকে না বলে সেন্টার থেকে বেরিয়ে গেল। সি এন জি নিয়ে সরাসরি আয়কর দফতরে চলে গেল।

আলম টেবিলেই ছিল। নির্মল ইশারা করে তাকে রাস্তায় ডেকে নিল। আলম বেরিয়ে আসতে অফিসের রাস্তার পাশের ছোট গলিতে ঢুকে এল।

আলম এসে বলল, 'কী হল দোস্ত? এত লুকিয়ে চুরিয়ে ডাকো কেন? এরকম লুকায় লুকায় দেখা করার কী হল?'

নির্মল বলল, 'অনেক কারণ আছে। আনোয়ার স্যারকে খুন করা হয়েছে শুনেছ তো?'

আলম বলল, 'হ্যাঁ।'

নির্মল বলল, 'আমার মনে হয় সাদিক শেখের কেসটার জন্য। আমার গাড়িতেও ইট মেরে আমাকে হুশিয়ারি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে ভালো কোনও সমস্যা আছে। তুমি সাদিকের স্টেটমেন্ট বের করেছিলে। সেটা আছে?'

আলম অবাক হয়ে বলল, 'আরে কী হয়েছে শোন। আজকেই আমাকে অর্ডার দেওয়া হল সাদিকের ফাইল ঘাঁটার দরকার নেই। কুমিল্লায় কোনও এক ব্যবসায়ী আছে, তার প্রোফাইল পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি তো এতক্ষণ ধরে এটাই ভাবছিলাম যে এ আবার কী হল?'

নির্মল বলল, 'মানে? তোমার কাছে এখন সাদিকের ফাইলের অ্যাক্সেস নেই?'

আলম বলল, 'তা থাকবে না কেন? এ কি আমেরিকা পাইসো ভাই? সব পাইয়া যাইব। কী লাগবো কী?'

নির্মল বলল, 'সব লাগবে। যা পাবে তাই। বিশেষ করে ফরেন ট্রানজাকশান। ওর ফাইল সব হোয়াইট। ওর কোথাও কোনও সমস্যা নেই। এর থেকে সন্দেহজনক আর কী হতে পারে?'

আলম বলল, 'ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করে দেব। তুমি ভেবো না।'

নির্মল বলল, 'ভাবাভাবি বাদ দাও ভাই, তুমি যে এটা করছ, কাউকে ঘুণাক্ষরেও বোল না। এখানে সব জায়গায় ওদের লোক সাজানো আছে। ভীষণ কনফিডেন্সিয়ালি এগোতে হবে আমাদের।'

আলম বলল, 'ঠিক আছে। তুমি ভেবো না।'

নির্মল বলল, 'আমি যাই। তুমি মাথায় রেখো।'

আলম বলল, 'ঠিক আছে। যাও।'

অফিসে ফিরে এসে নির্মল দেখল রাসেল সাহেব থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখে বললেন, 'কোথায় গেছিলে?'

নির্মল বলল, 'বাসায় গেছিলাম স্যার। ভাবলাম গ্যাস বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছে । তাই চেক করতে গেছিলাম।'

রাসেল বললেন, 'আমি কিন্তু তোমাকে বলেছিলাম কোথাও গেলে আমাকে বলে যেতে। বলেছিলাম না?'

নির্মল বলল, 'জি স্যার। আর হবে না।'

রাসেল বললেন, 'তোমার বাসায় তোমার স্ত্রী ছিল না? তাকে ফোন করে জিগ্যেস করে নিলেই তো হতো।'

নির্মল বলল, 'না স্যার, ওর আত্মীয়রা এসেছে, ও এখন নেই।'

রাসেল বললেন, 'তুমি চাকরি করতে এসেছ। যথেষ্ট সিনিয়র অফিসার। তোমাকে এখন অফিস ডেকরাম শেখানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আশা করব, ভবিষ্যতে তুমি আমাকে জানিয়ে যাবে।'

নির্মল মাথা নাড়ল, 'জি স্যার।'

রাসেলের থেকে ছাড়া পেয়ে চেম্বারে এসে বসল সে। মোবাইলে মোখলেস ছবি পাঠিয়েছে। সাদিকের বাড়ি থেকে গাড়িটা বেরিয়েছে।

নির্মল গাড়ির নাম্বার দিয়ে সার্চ করল। সাদিকের নামেই এ গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন করা আছে। সাদিক এটা নিয়ে কী করছে? এ গাড়িটা নিয়ে তো কোনও দিন বাইরে যায়নি!

নির্মল চিন্তিত মুখে বসে রইল। মোখলেস আবার ফোন করছে। ধরল সে, 'হ্যাঁ বল।'

'সার, আমাদের মিয়াঁর পুরান ঢাকায় একটা বাড়ি আছে। ওখানে মেয়ে পোষে।'

'জানি এটা। নতুন কিছু বল।'

'একটা ডেরাইভার এখানে চা খায়। কথা শুনে বুঝলাম মাইয়াটারে কোথায় নাকি লইয়া গেছে।'

'গুড। কোথায় নিয়ে গেছে?'

'জানি না সার। এদের চলা ফেরা দেখলে কিছু বোঝন যায় না।'

'কিছুই বোঝা যায় না?'

'না সার। খুব ব্যস্ত আর সিরিয়াস। সবাই খুব দৌড়াইতাসে।'

'ঠিক আছে। গুড জব।'

ফোন রেখে নির্মল সাদিকের পুরান ঢাকার ঠিকানাটা বের করল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হল। ছুটির এখনও কত সময় বাকি!

৩৪

রাত আটটা। বাইকটা বড় রাস্তায় রেখে মোখলেসের দেওয়া ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখছিল। এর মধ্যে ফোন বেজে উঠল তার। সোবাহান ফোন করছেন। ভ্রু কুঁচকে সেটার দিকে তাকিয়ে ধরল সে, 'জি জনাব।'

সোবাহান বললেন, 'আরে, আমি তোমার খবর নেওয়ার জন্য ফোন করছিলাম। সারাদিন ধরেই ভাবছিলাম তোমার খোঁজ নেই, কিন্তু সময় পাইনি, এত কাজের চাপ। তারপর বলো, নতুন ডিপার্টমেন্ট কেমন লাগছে?'

নির্মল বলল, 'ভালো স্যার।'

সোবাহান বললেন, 'কোনও সমস্যা নেই, তাই না?'

নির্মল বলল, 'না, স্যার, ঠিক আছে।'

সোবাহান বললেন, 'নির্মল, আমায় একটা কথা বলো, এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে যদি কোনও অফিসার কাজ করে, তাহলে কি আমার চুপ করে থাকা উচিত?'

নির্মল বুঝল সোবাহান কেন ফোন করছেন। সে বলল, 'বুঝলাম না স্যার।'

সোবাহান বললেন, 'না মানে এক অফিসার আছে, আমি দেখছি সে বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, অতিসক্রিয়তা দেখাচ্ছে। আমার না এই অতিসক্রিয় মানুষদের একদম পছন্দ না বুঝলে না? কে জানে কখন রিমান্ডে নিয়ে নিতে হয়। ভালো লাগে না রে ভাই, সব সময় এত জটিলতা ভালো লাগে না। যাই হোক, তুমি ঠিক করে কাজ করো, ডিপার্টমেন্টের নাম উজ্জ্বল করো। রাখি বুঝলে?'

নির্মলের কান মাথা জ্বলছিল। সে বলল, 'জি স্যার।'

সোবাহান ফোন কেটে দিলেন। নির্মল আলমকে ফোন করল, আলম একবারেই ধরল, 'বল দোস্তো। কেন ফোন দিলা?'

নির্মল বলল, 'কেন আর দেব? খোঁজ পেলে কিছু?'

আলম বলল, 'এত তাড়াতাড়ি হবে না। অফিসে এখনও অনেকে আছে। আরেকটু রাতের দিকে দেখছি। তুমি যে কাবাবের খোঁজ করতাস, ওইটা খাইতে অনেক দূর যাইতে হইব।'

নির্মল বলল, 'ঠিক আছে। জানিও।'

ফোন রাখার পর নির্মল কয়েকমুহূর্ত ভাবল। আলম কি সন্দেহ করছে তাদের ফোন ট্যাপ হচ্ছে? ট্যাপ না হবার তো কিছু নেই। বরং তারই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল সোবাহানের সঙ্গে কথা বলার পরে।

মোখলেসের দেওয়া ঠিকানার বাড়ির সামনে আবার কিছুক্ষণ ঘুরে, চারপাশ দেখে নিয়ে দরজায় নক করল নির্মল।

জরিনা দরজা খুলল, 'জি, বলেন।'

নির্মল বলল, 'সাদিক সাহেব আছেন?'

জরিনা নির্মলের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'জি উনি তো এখানে থাকেন না'!

নির্মল মুখে বিস্মিতভাব ফুটিয়ে বলল, 'সে কী? উনি তো আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন।'

জরিনা বলল, 'ঠিক আছে, আপনি বসেন, আমি দেখছি।'

নির্মলকে সামনের ঘরে বসিয়ে জরিনা ভেতরের ঘরে গেল।

রঙচটা একটা বিছানার চাদর খাটে পাতা। একটা প্লাস্টিকের চেয়ার। টিভি চলছে। চটুল বলিউডি গান চলছে টিভিতে। ভেতরের ঘরে যাবার দরজাটা ভেজানো। নির্মল দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। বাড়ির মাঝে বড় একটা বারান্দা ঘিরে চারটে দরজা। কোথাও কেউ নেই। জরিনা কোথায় গেল?

'কী চাই?'

একটা লম্বামতো লোক কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখতে পায়নি নির্মল। ঘুরে দাঁড়াতেই লোকটার সামনে পড়ে গেল সে। অপ্রস্তুত না হয়ে বলল, 'সাদিক এখানে আসতে বলেছিলেন।'

লোকটা সন্দিগ্ধ মুখে তাকে দেখে বলল, 'না। এখানে কারো আসার কথা নাই।'

নির্মল বলল, 'ফোন করেন। দেখেন।'

ফোন বের করতে যেতেই নির্মল লোকটাকে জোরে ঠেলে ফেলে দিল। লোকটা খাটের উপর পড়ল। নির্মল পালাতে গেলেই লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরল। নির্মল লোকটাকে সামলাতে যাবার আগে আরেকজন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। নির্মল কিছুক্ষণ দুজনের সঙ্গে লড়লেও অসম লড়াইয়ে তাকে অচিরেই পরাস্ত হতে হল। নির্মলকে মাঝের বারান্দায় বাঁধা হল।

দ্বিতীয় পুরুষটি চিৎকার করল, 'জরিনা? এই জরিনা।'

জরিনা ছুটে এল, 'হ ভাইজান।'

'কোথায় থাকস? বাইরে থিক্যা লোক ঢুইকা যায় ভিতর? কী করস তোরা?'

জরিনা বলল, 'আমি কী করুম? কইসিল সাদিক সাহেবরে চেনে।'

লোকটা ছুটে গিয়ে জরিনাকে জোরে একটা চড় কষাল। মেয়েগুলোর মধ্যে একজন বলল, 'একী জব্বার ভাই, ওরে মারো ক্যান?'

জব্বার বলল, 'মারুম না? আমি কী বলসিলাম? কাউরে ঢুকতে দিবি না? বলসিলাম?'

নির্মলের পিঠে ব্যথা করছিল। তার হাত-পা বাঁধা হয়েছে। গা হাত পা ব্যথা করছে। হাত-পা বাঁধা না-হলে সে লড়াই করার জায়গায় থাকত।

খায়রুল বাইরে থেকে এসে নির্মলের দিকে ঝুঁকে বলল, 'সত্যি করে বল। তুই কে? নইলে আজ এইখান দিয়ে তুই বাইচা ফিরতে পারবি না।'

নির্মল দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আটকে রাখিস না। সমস্যায় পড়বি। খোল।'

নির্মলকে নির্লিপ্ত থাকতে দেখে দুজনে অবাক হল এবার। দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ইশারা করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

জরিনা তাড়াতাড়ি নির্মলের কানের কাছে এসে বলল, 'সাকিনা আপুর কোনও খবর আছে? আপনারে কি উনি পাঠাইসে?'

নির্মল অবাক হয়ে জরিনার দিকে তাকাল।

৩৫

ধানখেতের পাশে কারো বাড়ি হলে জানলা খোলা থাকলে ভোরবেলা যে হাওয়াটা আসে, সেটার তুল্য বোধহয় আর কিছু হতে পারে না। অমল জানলা খোলা রেখে ঘুমোতে বলেছিল। ভোরবেলা জানলার বাইরে তাকিয়ে রাণার মনে হল এই দৃশ্যটা দেখার জন্যই হয়তো সে এখনও বেঁচে আছে। সবুজ ধানের ওপরে ভোরের আলো পড়ছে। পাখির ডাক ভেসে আসছে। রাণা বেশ কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে রইল।

অমল ঘুমোচ্ছে। ক্লান্তির ঘোরেই ঘুমোচ্ছে। রাণা উঠে বাইরে এল। ইমতিয়াজ দাঁতন ঘষছে দাওয়ায় বসে। তাকে দেখে বলল, 'ঘুম হল?'

রাণা বলল, 'হ্যাঁ।'

ইমতিয়াজ বলল, 'দিনের বেলায় বেরোবে না। ঠিক আছে?'

রাণা বলল, 'হ্যাঁ।'

ইমতিয়াজ তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, 'কতদিন কাজ করছ?'

রাণা বলল, 'বেশিদিন না। এখানেই প্রথম।'

ইমতিয়াজ বলল, 'ট্রেনিং?'

রাণা বলল, 'কোনও ট্রেনিং হয়নি।'

ইমতিয়াজ বিস্মিত হয়ে বলল, 'এরকম হয় নাকি?'

রাণা বলল, 'হ্যাঁ, এরকমই হয়েছে।'

ইমতিয়াজ বলল, 'কে পাঠিয়েছে তোমায়?'

রাণা বলল, 'জানেন না?'

ইমতিয়াজ মাথা নাড়ল।

রাণা বলল, 'তাহলে আর জেনে কী করবেন? আপনি এখানে ক'দিন আছেন?'

ইমতিয়াজ বলল, 'বছর দশেক। তার আগে ঢাকায় ছিলাম। এখন তো রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেছে।'

রাণা অবাক হল, 'মানে? আপনি ইন্ডিয়ার লোক নন?'

ইমতিয়াজ বিরক্ত হল, ‘গলা নামিয়ে কথা বলো। না আমি ইন্ডিয়ার লোক নই।’

রাণা বলল, ‘তবে?’

ইমতিয়াজ বলল, ‘সময়ে ঠিক জানবে। অত জেনে কী করবে তুমি?’

রাণা চুপ করে গেল। ইমতিয়াজ বলল, ‘ওখানে নিম ডাল আছে। দাঁতন করে নাও। অ্যাডের টুথপেস্টের থেকে অনেক ভালো।’

রাণা তাই করল। গ্রামে থাকতে এ অভ্যাস তার ছিল। দাঁতন করতে করতে বলল, ‘অমলদাকে কত দিন ধরে চেনেন?’

ইমতিয়াজ বলল, ‘অমলকে বর্ডার পার করে আমিই এনেছিলাম। এদিকে কে আসত তখন? সব তো যাচ্ছে। আউট গোয়িং। বাংলাদেশের ইম্পরট্যান্সটা দিল্লি ঠিকই বুঝত, তাও খুব বেশি বাজেট ছিল না। ধীরে ধীরে আই এস আই যত বেড়েছে, ওদিকেও টনক নড়েছে।’

রাণা বলল, ‘প্রথম দিকের তাহলে?’

ইমতিয়াজ বলল, ‘বললাম তো, সব একবারে বলব না। এত কথা হওয়াও ঠিক হল না। ভোরের দিকে মুড ভালো থাকে। তোমার কি মনে হয়, এই জায়গায় আমার থাকতে ভালো লাগে? না আছে কোনও উত্তেজনা, না আছে কিছু। এর থেকে পাকিস্তানে থাকা ভালো। কত রকম রিস্ক থাকে। এই আছি, এই নেই। মনে হয় ম্যাজিক চলছে।’

ইমতিয়াজ টেনে টেনে হাসল। কল থেকে জল নিয়ে মুখ ধুয়ে তার সামনে এসে বসল, ‘একটা রুল সব সময় আছে মনে রাখবে। আই এস আইকে কোনদিন হালকাভাবে নিতে নেই। ওদের দেশের লোক না খেয়ে মরলেও ওরা ওদের মতো করে স্ট্র্যাটেজি বানিয়েই যাবে।’

রাণা বলল, ‘আমি অত কিছু বুঝি না। বোঝার দরকার নেই।’

ইমতিয়াজ অবাক হয়ে বলল, ‘তাহলে তুমি এখানে কী করছ?’

রাণা স্থির চোখে কয়েক সেকেন্ড ইমতিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বাংলাদেশ ঘুরতে এসেছি। ঘুরে চলে যাব।’

ইমতিয়াজ বলল, ‘মজা করো? আমার সঙ্গে মজা করো? আমি কত সিনিয়ার জানো? তোমার ইয়ারবন্ধু ভেবেছ নাকি?’

রাণা কলের জলে মুখ ধুতে শুরু করল। ইমতিয়াজ বলল, ‘কমবয়সি ছেলেদের এই হল সমস্যা। সিনিয়রদের সম্মান করতে জানে না।’

রাণা মুখ ধুয়ে বলল, 'আমি আপনাকে রাগানোর জন্য কিছু বলিনি। আমার ব্যাপারটা এরকমই। অত ভেবে কিছু করি না। যেটা মনে হয় করি। আমার মনে হয় না পাকিস্তানকে নিয়ে এত চিন্তা করার কিছু আছে বলে। কী করবে আই এস আই? কোনও ক্ষমতা নেই। অকারণ হাওয়া দিয়ে ফোলানো হচ্ছে এই ব্যাপারগুলোকে।'

ইমতিয়াজ ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করল, 'ভালো লোক পাঠিয়েছে তো! কোত্থেকে তুলল তোমাকে?'

রাণাও হেসে ফেলল ইমতিয়াজের কথা শুনে, 'ওই, তুলে পাঠিয়ে দিয়েছে আর কী!'

ইমতিয়াজ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, 'ঠিক আছে। তুমি ঘরে চলে যাও। বেরিও না আর। এলাকার লোক যেন তোমাদের বাইরে না দেখে।'

৩৬

রাত দশটা।

সোবাহান সাহেব এসেছেন। নির্মলের বেঁধে দেওয়া হাত খুলে দিচ্ছে নুরুল।

মেয়েগুলো কেমন কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে।

একটু দূরে জরিনা দাঁড়িয়ে নির্মলকে দেখছে।

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে গলিতে এসে সোবাহান চারদিকে তাকিয়ে বললেন, 'নির্মল।'

নির্মল বলল, 'জি স্যার।'

সোবাহান বললেন, 'তুমি এখানে কী করছিলে?'

ঠোঁটের পাশটা নোনতা লাগছে। রক্তটা দেখা যাচ্ছে কি? নির্মলের অস্বস্তি হচ্ছিল। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে? সাদিক সোবাহানকে ডেকে তাকে নিয়ে যেতে বলেছে। তাও সশরীরে আসেনি, ফোন করেছে। সোবাহান তাতে এরকম কুকুরের মতো চলে এসেছে। সোবাহানের প্রশ্নের উত্তরে নির্মল বলল, 'একটা ঠিকানা খুঁজতে এসেছিলাম।'

সোবাহান বললেন, 'ঠিকানা? কীসের ঠিকানা?'

নির্মল বলল, 'আমার এক বন্ধু থাকে এদিকেই। সাদিক আলম নাম।'

সোবাহান বাকিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এগিয়ে যাও সবাই।'

সোবাহানের সঙ্গে যারা এসেছিল তারা গলির মুখের দিকে হাঁটতে শুরু করল। সাদিকের ঘরটার বাইরে যে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে সোবাহান বললেন, 'আমাকে তোমার কী মনে হয় নির্মল?'

নির্মল বলল, 'কিছু না স্যার। আমি পার্সোনাল কাজে এসেছিলাম, বললাম তো।'

সোবাহান বললেন, 'পেছনে লাথ মেরে ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেব তোকে। ইন্ডিয়ার দালাল। তোর লজ্জা লাগে না? এদেশের খাস আর ইন্ডিয়ার হয়ে কাজ করিস?'

নির্মলের কান মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। সোবাহান যে এই কথাটা বলবে, সে ভাবতে পারেনি। সে বলল, 'এগুলো কী বলছেন আপনি?'

সোবাহান বললেন, 'ঠিক বলছি। তুই র-এর হয়ে কাজ করিস, তাই না? আনোয়ার তাই করত, তুই তো ওর সঙ্গেই ছিলিস। ওর চামচা। ও যেভাবে বলত, তুই সেভাবে কাজ করতিস। এখন দেখছিস আমি এসেছি, তোর পাখনাগুলো কাটতে শুরু করেছি, তাতে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই না?'

নির্মল কাতর গলায় বলল, 'একবারে বাজে কথা স্যার। আমি আনোয়ার স্যারকে চিনতাম। উনি দেশের বাইরে কোনদিন কিছু ভাবেননি। আমিও ভাবিনি। ইন্ডিয়ার হয়ে কাজ করতে যাবই বা কেন? এদেশে আমার সাতপুরুষ থাকে, আমি জন্মেছি এদেশে, আমাকে অন্য কোনও দেশের হয়ে কাজ করতে হবেই বা কেন? আমি ইনভেস্টিগেশনে এসেছিলাম স্যার, সাদিকের এখানে কতগুলো মেয়ে থাকে, সেগুলো দেখতে এসেছিলাম।'

সোবাহান আঙুল দিয়ে নিজের ঠোঁটে দিলেন, 'একদম চুপ থাক। একদম চুপ। তোর ভাগ্য ভালো যে তোকে জেলে না নিয়ে গিয়ে বাইরে নিয়ে বোঝাচ্ছি। যা বলছি, মন দিয়ে শুনে রাখ। বাসায় যাবি, খাবি দাবি, ঘুমাইয়া পড়বি। কাল থেকে তুই একটা অন্য মানুষ। তোকে যেন কেউ সাদিক বা ওর লোকজনের ধারে কাছে দেখতে না পায়। সাদিক এ দেশের সম্পদ। ও কী করবে, না করবে, সব আমি বুঝব। আমি দেখব। তোকে দেখতে হবে না, ক্লিয়ার?'

নির্মল কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সোবাহান এবার গলা তুলল, 'ক্লিয়ার কি না?'

নির্মল বলল, 'ক্লিয়ার স্যার।'

সোবাহান বললেন, 'ওয়েল অ্যান্ড গুড। চল এবার।'

সোবাহান হাঁটতে শুরু করলেন। নির্মল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল। জানলা দিয়ে জরিনার মুখটা দেখা যাচ্ছে। পর্দা তুলে দেখছে তাদের। কয়েক সেকেন্ড থেমে রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। গাড়িতে উঠে সোবাহান তাকে তার পাশে বসালেন। ড্রাইভারকে বললেন, 'নির্মল স্যারকে ওর বাসায় নামিয়ে দাও আগে।'

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করল। নির্মল চোখ বন্ধ করল। জরিনা ফিসফিস করে তাকে তখন বলল, 'সাকিনা আপুরে কে জানি তুইলা নিয়া গেছে। আপনি জানেন সে কোথায় আছে?' মোখলেস যে মেয়েটার কথা বলছিল, মেয়েটার নাম তবে সাকিনা?

বাইরে থেকে ছেলেগুলো ছুটে এল তখন। চিৎকার করে জরিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা, ঘরের ভিতর যা। বাইরে যেন না দেখি।'

জরিনা ভীত চোখে তার দিকে তাকিয়ে চলে গেল। নির্মলকে একটা ছেলে এসে চড় মেরেছিল। নির্মল ছেলেটার মুখ মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। মনের ভিতর রিক্যাপ দরকার। খুব জরুরি রিক্যাপগুলো। মাথার ভেতর সোবাহানের 'ইন্ডিয়ার দালাল' শব্দগুলো ভাসছে। সেটা যেন মনে প্রভাব না ফেলে। মনের রিক্যাপটা ওর মতো করে হোক। দাঁতে দাঁত চিপল সে। সোবাহানের অপমানটা সে কোনদিন ভুলবে না।

৩৭

মাটিতে পড়ে আছে রুমা। মাথার ভেতরে কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। গায়ে হাতে পায়ে অসহ্য ব্যথা করছে।

দরজা খুলে গেল।

'একী? এরকম অবস্থা করসে তোমার?'

সাদিকের গলা। কোনওমতে চোখ খুলল রুমা। চোখ ভারি হয়ে ফুলে গেছে। গিয়াস চোখে ঘুষি মেরেছিল।

সাদিক তার কাছে এসে বসল। গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করল।

রুমা কথা বলতে পারছে না।

এই লোকটা তার সঙ্গে কত রাত কাটিয়েছে। কত আদর করেছে। তাকে কি উদ্ধার করবে?

কথাটা ভাবতে ভাবতেই মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল সে। সাদিক তার চুলের মুঠি শক্ত করে ধরেছে, সাপের মতো গলায় হিসহিস করে বলল, 'কে তুই? তুই তো সাকিনা না। তোর দেওয়া ঠিকানায় তোর ছবি দেখে কেউ চিনতে পারেনি। সত্যি করে বল তুই কে।'

এইভাবে দুঃস্বপ্ন সত্যি হয়ে যাবে সে ভেবেছিল, এত তাড়াতাড়ি সত্যি হবে ভাবেনি। বলল, 'কোনও ভুল হইতাসে আপনাগো, আমি সাকিনা। আমার গ্রামের লোক চিনবে না ক্যান আমারে?'

গিয়াসের গলা পাওয়া গেল, 'চিনবে না, কারণ তুই ইন্ডিয়ান, আমি শুরুতেই বুঝেছিলাম। এবার তুই বলবি তোকে কে পাঠিয়েছে। নইলে তোর কী হতে পারে তুই জানিস না। তুই চাইবি তোর মৃত্যু হোক, কিন্তু হবে না। বুঝতে পারছিস?'

রুমা বিহ্বল গলায় কেঁদে উঠল, 'আমারে এরকম কইরেন না, আমি একটা দুঃখী মেয়ে, এরকম কইরেন না। ও সাদিক সাহেব, আপনি আমারে এরকম করতাসেন?'

সাদিক হাতের মুঠি আলগা করল, রুমার চুল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ধরে নিলাম তুই ইন্ডিয়ান না, তাহলে মিজানরে ফিট করসিলি কী কইরা?'

রুমা বলল, 'মিজানভাইরে জিগান।'

সাদিক বলল, 'তুই জানিস না মিজান মার্ডার হইসে?'

রুমা আকাশ থেকে পড়ার ভান করল, 'আল্লাহর কসম খাই, জানি না। আমি তো ঘর ছাইড়া কোথাও যাই নাই। মিজান ভাইয়ের খবর আমি কেমনে পামু?'

সাদিক বলল, 'সন্দেহটা ওই জন্যই তো হচ্ছে। মিজান একা মরেনি, যাদের যাদের তোর সঙ্গে যোগ থাকার কথা, সবাই মরসে। তোর গ্রামের লোক তোর ছবি দেখে চিনতে পারে নাই। আমারে কী ভাবোস, গাধা?'

রুমা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হায় আল্লাগো, আপনাগো কেমনে বিশ্বাস করাই, গেরামে আমি বোরখা পইরা থাকতাম, আমারে কে কী কইরা চিনবে? আমি কঠিন পর্দা করতাম, আমারে ওরা দেখবে কেমনে?'

গিয়াস বলল, 'শি ইজ লাইং সাদিক। সি ইজ ভেরি স্টেডি। আমার কথা শোন, ওকে আমি দেশে নিয়ে যাই। তারপর দেখছি ওকে কী করা যায়।'

সাদিক দ্বিধাগ্রস্থ গলায় বলল, 'আমাকে একটু দেখতে দেন। তারপর নিয়া যাইবেন।'

গিয়াস রাগী গলায় বলল, 'কী দেখবে?'

সাদিক বলল, 'ওর কথা মিথ্যা নাও হইতে পারে। আমাদের গ্রামগুলোতে অনেক মাইয়াই কঠিন পর্দা করে। তাগো চিনতে পারে না অনেকেই।'

গিয়াস বলল, 'হতে পারে না। এত ধার্মিক তোমরা নও।'

সাদিক গলা নরম করে বলল, 'জনাব। এই মাগীরে আমারে দিয়া দেন। যদি দেখা যায় মাগী মিথ্যা কয়, আমি নিজের হাতে ওরে শেষ করুম। কিন্তু জনাব, যদি মাগী দোষী না হয়, তাহলে অকারণ ওরে শাস্তি দেওন হইবে না?'

গিয়াস বলল, 'তোমার মেয়ের অভাব? কোথাকার মেয়ে লাগবে তোমার? তুমি আমার সঙ্গে পাকিস্তানে চলো, কত মেয়ে লাগবে তোমার আমি দেখব।'

সাদিক বলল, 'জনাব, আমি তো কইতাসি আপনেরে, আমার হাতে ছেড়ে দেন, আমি বুইঝা নিমু। আপনি চিন্তা কইরেন না।'

গিয়াস বলল, 'আমি চিন্তা করব নাকি সেটা আমার ব্যাপার। আমার কাজ আমাকে করতে দাও। তুমি চলে যাও। আমি দেখছি ওকে।'

সাদিক অনুনয় বিনয় করতে লাগল, 'জনাব। ছাইড়া দেন জনাব। আমার মনে হয় না সাকিনা মিথ্যা কইতাসে।'

গিয়াস গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে আমি আর কোনও কথা বলব না। জাস্ট গেট লস্ট ইউ ফুল।'

সাদিক শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রুমার দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল...।

৩৮

নতুন দিল্লি। রাত দুটো। তুষার ঘুমোচ্ছিলেন।

ফোনটা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে ফোন রিসিভ করলেন। ওপাশ থেকে ভেসে আসল, 'বেকারার করকে হামে...রিমেকের বাজার হিট হয়ে গেছে নাকি?'

তুষার হাসলেন, 'রিমেকেরই তো বাজার। সব পুরোনো জিনিস নতুন মোড়কে চলে এসেছে।'

'বলছি কী, বলিউডের চাহিদা তো সব দিকেই আছে, তবে শুনছিলাম, ইস্টার্ন সাইডে নাকি বলিউডের কোনও সিঙ্গার প্রোগ্রাম করতে গিয়ে চোক করে গেছেন।'

তুষার সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন, 'ইস্ট?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা আমাদের স্টুডিওর জুরিসডিকশনে নেই এখন।'

'শুনেছি। স্টুডিও ভেঙে গেছে। হিট গান এখন আর স্টুডিওতে রেকর্ড হচ্ছে না। সমস্যা হল, এর ফলে প্রতিযোগী স্টুডিওর গান হিট হয়ে যাবে। সিঙ্গার এখন তাদের কাছে আছে।'

'স্টুডিওর ঠিকানা?'

'আপাতত ইস্টার্ন রিজিয়নেই। কিন্তু ওয়েস্টার্ন সাইডে গেলে সিঙ্গার উইল বি ইন বিগ ট্রাবল। প্রোডিউসারদের খুব তাড়াতাড়ি যা করার করতে হবে। গুড নাইট।'

ফোন কেটে গেল। তুষার তৎক্ষণাৎ খানের নম্বরে ফোন করলেন। তিনবার রিং হবার পর আশরফ খান ফোন ধরলেন, 'হ্যাঁ স্যার।'

তুষার বললেন, 'বড়াল কন্ড। বাংলাদেশে আমাদের কেউ আই এস আইয়ের হাতে আছে। এখনও বাংলাদেশেই আছে, তাকে পাকিস্তান নিয়ে যেতে পারলে সমস্যা ভয়াবহ হয়ে যাবে।'

খান বললেন, 'কিন্তু স্যার, আমরা কী করব এখানে? বাংলাদেশের কোনও আপডেটও তো নেই।'

তুষার বললেন, 'সব জানি। কিন্তু এসব জানার পরে হাতে হাত রেখে বসতে পারছি না। আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি মিনিস্ট্রিতে কন্ট্যাক্ট করছি। তুমি তৈরি হও।'

খান হাসলেন, 'আগে আপনি কথা বলুন স্যার। কলকাতার মতো লজ্জার ব্যাপার হলে ভালো লাগবে না। বাংলদেশে কোড সেভেন অ্যাক্টিভেট করা আছে। আমরা কাজ করতে গেলেই ঝামেলা হবে।'

তুষার বললেন, 'আমি বুঝে নেব, বললাম তো। শেখাওয়াত লাস্ট কবে কন্ট্যাক্ট করেছিল?'

খান বললেন, 'দু'মাস হয়ে গেল। পুওর কমিউনিকেশনটা একটা প্রবলেম তো বটেই। ওর মতো হুইমজিকাল একটা লোক কী করে ইস্টার্ন রিজিওন সামলাচ্ছে আমি সত্যি জানি না স্যার।'

তুষার বললেন, 'হিস্ট্রি ঘেঁটে লাভ নেই। তুমি কি মাথুরকে নেবে?'

খান বললেন, 'আপনি যা বলবেন। মাথুর অরুণাচল থেকে আজকেই ফিরেছে। ওর যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

তুষার বললেন, ‘কথা বলো। যেতে চাইলে নিয়ে যাও। অবশ্য যেতে চাইবে না, তা নয়। শেখাওয়াত কাকে ঢাকা পাঠিয়েছিল, তাও জানি না। সায়ক জেনে গেল, অথচ আমরা জানতে পারলাম না।’

খান বললেন, ‘আপনি কী করবেন স্যার, আপনি এই ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করলে নিশ্চয়ই জানতেন। আপনি কথা বলে নিন। তারপর মাথুরকে ফোন করে নেব।’

তুষার ফোন কাটলেন। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে জানলার বাইরে তাকালেন। সবাই ঘুমোচ্ছে। কেউ জানেও না দেশের এক সন্তান এই মুহূর্তে আই এস আইয়ের হাতে বন্দী। তুষার চোখ বন্ধ করলেন। যারা জানে না, তারা ভাবতেও পারবে না আই এস আই কী ভয়ানক অত্যাচার করে। ছেলে হলে একরকম, মেয়ে হলে আরেকরকম। কিছুদিন আগে মুজফফরাবাদে এক এজেন্টের শরীর থেকে একটু একটু করে চামড়া আলাদা করে দিয়েছিল। সারা শরীর ক্ষত আর ঘায়ে ভর্তি হয়ে উঠেছিল সে এজেন্টের, সে শরীরের উপর দিয়ে নুন লঙ্কার মিশ্রণ প্রয়োগ করে অত্যন্ত শীতে বরফের উপরে তাকে ফেলে দিয়ে গেছিল। ভারতীয় সেনা যখন সে শরীর উদ্ধার করে, মানসিকভাবে অত শক্তিশালী সেনারাও ও দৃশ্য নিতে পারেনি।

বাংলাদেশে ঠিক কী অবস্থা তৈরি হয়ে আছে এখন? তুষার শেখাওয়াতকে ফোন করার চেষ্টা করলেন। লাভ হল না। শেখাওয়াত ফোন ধরলেন না। তুষার সরাসরি প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে হটলাইনে ফোন করলেন। মন্ত্রীকে ফোনে পেতে মিনিট পাঁচেক লাগল। ঘুমঘোরে বললেন, ‘বলুন।’

তুষার বললেন, ‘স্যার, আই এস আইয়ের হাতে আমাদের এক এজেন্ট বন্দী হয়েছে বাংলাদেশে। এই মুহূর্তে আমরা অন্য কোনও অর্গানাইজেশনের হাতে বাংলাদেশ ছাড়তে পারব না। আমি বাংলাদেশের পরিস্থিতির কন্ট্রোল হাতে নিয়ে নিতে চাই। শেখাওয়াতকে কন্ট্যাক্ট করতে পারিনি। আমার কাছে আর কোনও অপশন নেই। কোড সেভেন ব্রেক করার অর্ডার দিন স্যার।’

মন্ত্রী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, ‘আর ইউ সিওর?’

তুষার বললেন, ‘আপনার কাছে এখনও অবধি বাংলাদেশ রিলেটেড এরকম কোনও ইন্টেল এসেছে? আপনি জানেন ওখানে আমাদের এজেন্ট ধরা পড়েছে?’

মন্ত্রী বললেন, ‘না।’

তুষার বললেন, ‘আমি ঝুঁকি নিতে চাইছি না। আমার কন্ট্রোল চাই।’

মন্ত্রী বললেন, ‘গিভ মি ফাইভ মিনিটস।’

তুষার বললেন, ‘ওকে স্যার।’

ফোন কেটে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে মন্ত্রীই ফোন করলেন, ‘শেখাওয়াত ফোন ধরছে না তুষার। আমাকে কোন খবরও দেয়নি।’

তুষার বললেন, ‘স্যার প্লিজ, আপনি আমাদের এগোতে বলুন। আর দেরি করা যাবে না।’

মন্ত্রী বললেন, ‘ওকে। গো অ্যাহেড।’

তুষার বললেন, ‘থ্যাংক ইউ স্যার। আর প্লিজ, এর পর শেখাওয়াত যে ঝামেলা করুক...।’

মন্ত্রী বললেন, ‘আমি বুঝে নেব। ইউ গো অ্যাহেড।’

তুষার খুশি হলেন, ‘ওকে স্যার।’

৩৯

সকাল ন’টা বাজে।

পরোটা আর আলুভাজা করে দিয়েছে ইমতিয়াজ।

অমল ওঠেনি। রাণা টিভি দেখছিল। ইমতিয়াজ রাণার সামনে বসে বলল, 'আমি কিছুতেই সাকিনাকে ফোনে পাচ্ছি না। কী হতে পারে?'

রাণা বলল, 'ওর সাথে আমার তেমন যোগাযোগ হয়নি। অমল বলতে পারবে হয়তো।'

ইমতিয়াজ চিন্তিত গলায় বলল, 'সমস্যার ব্যাপার হল। অমল উঠবে না? ওকে তুলি?'

রাণা বলল, 'না তোলাই ভালো মনে হচ্ছে। পরিশ্রম হয়েছে।'

ইমতিয়াজ কাঁধ ঝাঁকাল, 'ঠিক আছে। যা ভালো বোঝো। তুমি খেয়ে নাও।'

রাণা বলল, 'ঠিক আছে।'

একটা ফোন বাজার শব্দ হল। ইমতিয়াজ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, 'ওরে বাবা, এই ফোনটা বাজে কেন আবার?'

ব্যস্ত হয়ে ইমতিয়াজ ঘরের ভেতর চলে গেল। রাণা দেখল ইমতিয়াজ বেশ নিচু স্বরে কথা বলছে। এমনিতে ইমতিয়াজের গলার স্বর অনেকটা চড়া। সে লোক গলা নামিয়ে কথা বলছে মানে চিন্তার ব্যাপার।

মিনিট পাঁচেক পরে ইমতিয়াজ ফোন রেখে এসে অমলকে ঠেলে তুলে দিল, 'ওঠো ওঠো।'

অমল ঘুমচোখে উঠে বসে বলল, 'কী হয়েছে?'

ইমতিয়াজ বলল, 'হাই অ্যালার্ট ফোন এসেছে দিল্লি থেকে। আমাদের কোনও এজেন্ট নাকি আই এস আইয়ের হাতে আটকে পড়েছে। এদিকে আমি সাকিনাকেও ফোনে পাচ্ছি না। দিল্লি থেকে একটা টিম এসে যাবে আজ। কী করব?'

অমল বলল, 'সাকিনাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না?'

ইমতিয়াজ ঘাড় নাড়ল, 'না।'

অমল রাণার দিকে চাইল, 'আমাদের ঢাকা যেতেই হবে। সাকিনাকে তুলে নিয়ে গেলে সমস্যা আছে।'

ইমতিয়াজ রেগে গেল, 'মাথা খারাপ হয়েছে? এখন ঢাকা যাবে?'

অমল বলল, 'এছাড়া কী করব? আচ্ছা, আমি সাকিনার কাছে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। গিয়ে দেখে আসুক। তারপর দেখছি কী করা যায়।'

অমল পকেট থেকে ফোন বের করে নাম্বার ডায়াল করল। মিনিটখানেক কথা বলে ফোন রেখে বলল, 'সাকিনাকেই তুলেছে যা মনে হচ্ছে। বাজারের ওখানে সাকিনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার জন্য আমাদের একজনকে বসানো ছিল। তার বডি পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে সাকিনাও মিসিং। দুইয়ে দুইয়ে চার হতেই হবে।'

ইমতিয়াজ বলল, 'কার কার নাম জানে সাকিনা?'

অমল ইমতিয়াজের দিকে তাকিয়ে দেখল, 'অলমোস্ট অল। ঢাকার গোটা অপারেশন ওর উপর টিকে আছে।'

ইমতিয়াজ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'আমার নাম?'

অমল ঘাড় নাড়ল, 'জানে।'

ইমতিয়াজ বলল, 'বলে দেবে কি?'

অমল বলল, 'না বলার চান্স আছে। কিন্তু আমি তো ওই চান্সের দিকে যেতে চাইছি না। ওর লাইফ রিস্ক হয়ে গেছে। আই এস আইয়ের গিয়াসের আসার কথা আছে। গিয়াসের সামনে সাকিনা পড়লে চাপ আছে।'

ইমতিয়াজ ভীত গলায় বলল, 'করাচীর গিয়াস? হাতে মাথা কাটে যে? কোয়েটাতে বালোচ লিবারেশনের চারজনকে নিজের হাতে মেরেছিল ছেলেটা। ওর হাতে সাকিনা পড়া মানে...'

অমল বলল, 'হ্যাঁ। ধরে নিলাম সাকিনা গিয়াসের হাতে পড়েই গেছে। গিয়াসের কাছে থাকা মানে সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে এর মধ্যেই। ওকে বের করতেই হবে। দিল্লি থেকে কে আসছে? উস্তাদ আসবে?'

ইমতিয়াজ বলল, 'উস্তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারছি না। কথা শুনে বুঝলাম খান আর মাথুর আসবেন। ওরা এখানকার সব রিপোর্ট নিতে চাইছেন।'

অমল বলল, 'কে রিপোর্ট দেবে? আমি? আমি এখান থেকে কী রিপোর্ট দেব? আমার ঢাকায় যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

ইমতিয়াজ বলল, 'সাকিনাকে নিয়ে যাবার প্ল্যান করছে। সেটার কথাও ভাবতে হবে।'

অমল বলল, 'নেপাল হয়ে নিয়ে যাবার প্ল্যান করবে। সব দিকে রেড অ্যালার্ট জারি করে দিতে হবে। দিল্লি সে কাজ করবে জানি, তাও তুমি একবার দিল্লিকে জানিয়ে দাও সে কথা। সমস্যা হল উস্তাদ ছাড়া সাকিনার এই অপারেশনের কথা দিল্লির কেউ জানে না। সাকিনা পুরোপুরি উস্তাদের আবিষ্কার। সাকিনার ব্রিফ দিতে হবে যে টিম আসবে তাকে। আমি এখান থেকে সেটা কী করে দেব?'

ইমতিয়াজ বলল, 'আমি গাড়ির ব্যবস্থা করছি। দুপুরের মধ্যে ঢাকা রওনা দেব।'

অমল ঘাড় নাড়ল, 'বেটার। আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি।'

অমল উঠে বাথরুমের দিকে রওনা দিল। ইমতিয়াজ রাণার দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে বলল, 'আমার বরাবরের আতঙ্ক এটাই। কভার উড়ে যাওয়া। সাকিনা এখন আমাদের থ্রেট'!

রাণা উত্তর দিল না। কে যে কার থ্রেট! এসব কাজে মানুষের উপর থেকে বিশ্বাসই উঠে যেতে বসেছে...

৪০

দু-দিন আগের কথা

লতিফ চৌধুরী গম্ভীর হয়ে বসে আছে।

তার সামনে মাদ্রাসার প্রধান মজনুদ্দিন বসে বসে জানলার বাইরের প্রকৃতি দেখছে।

লতিফ বলল, 'কী খবর আপনের?'

মজনুদ্দিন বলল, 'চলতেছে।'

লতিফ বলল, 'কথা কম বলতেছেন?'

মজনুদ্দিন হাসার চেষ্টা করল, 'জি জনাব। অধিক কথা কওন ভালা না।'

লতিফ বলল, 'ভালো। পাকিস্তান গড়ার লক্ষ্যে আপনের মতো মানুষ দরকার। আপনি পাকিস্তান গড়ার একজন কারিগর। ভুলবেন না।'

মজনুদ্দিন বলল, 'জি জনাব। আপনের অসীম করুণা।'

লতিফ বলল, 'আমায় বলবেন না। তারে বলুন। তিনিই সব কিছুর মালিক। আমার কুড়িজন ছেলে লাগবে মজনুদ্দিন সাহেব।'

মজনুদ্দিন ঘাবড়ে গেল, 'কুড়িজন?'

লতিফ ঠান্ডা চোখে মজনুদ্দিনকে দেখল, 'কেন? পারবেন না? কুড়িটা ছেলে পাকিস্তান গড়ার জন্য দিতে পারবেন না? তাহলে এত এত টেকা পাঠানো হয় কী জন্য?'

মজনুদ্দিন বলল, 'জনাব, আমারে হিসাব করতে দেন। এতিম ছেলে জোগাড় করতে হবে তো! বাপ-মায়ে থাকলে অনেক ঝামেলা করে।'

লতিফ বলল, 'বাপ-মা থাকা ছেলেই জোগাড় করবেন। আপনারে শুধু ছেলে মানুষ করার জন্য টেকা পাঠানো হয় না। ছেলে, তার অভিভাবক, তার পাড়া প্রতিবেশী, সবাই যেন পাকিস্তান গড়ার লক্ষ্যে দীক্ষা

পায়, তার জন্য টেকা পাঠানো হয়। টেকাগুলান আপনার ভুঁড়ি বাড়ানোর জন্য পাঠানো হয় না।'

মজনুদ্দিন বলল, 'জি জনাব। আমি এক মাসের মধ্যে আপনারে তালিকা পাঠাইতেছি।'

লতিফ রাগী গলায় বলল, 'একমাস না। আমার এখন লাগবে তালিকা। আমাকে জায়গামতো জবাব দিতে হয়। বোঝঝেন মিয়াঁ?'

মজনুদ্দিন বিষম খেল। লতিফ বলল, 'বিষম খাইলে তো হবে না। কর্তারা আসছেন, তাগো হিসাব দিতে হইব। এত এত টেকা আসে, সৌদি থিকা আসে, বাইরে থিকা আসে, তার তো হিসাব লাগব না? এমনি এমনি তারা টেকা পাঠায়? চরিত্র তৈরি করতে পাঠায়, যখন লাগব, তখন সে ছেলেদের কামে পাঠাইতে হইব। হইব না?'

মজনুদ্দিন বলল, 'ছেলেরা এখনও ছোট জনাব।'

লতিফ চোখ ছোট করল, 'কত ছোট?'

মজনুদ্দিন বলল, 'বারো-তেরো বছরের ছেলে। এদের দিয়া কী হইব?'

লতিফ বলল, 'সেইডা কে ঠিক করবেন? আপনে?'

মজনুদ্দিন বলল, 'রাজনৈতিক বিষয় আছে জনাব। এলাকা থিকা একসঙ্গে এত গুলান ছেলে লা পাতা হইলে অনেক জবাবদিহি করতে হইব।'

লতিফ বলল, 'ঢাকা বেড়াইতে লইয়া আইবেন। যাদের নির্বাচিত করবেন, তাদের আলাদা বাসে রাখবেন। সে বাস মিসিং হইয়া যাইব। বোঝঝেন?'

মজনুদ্দিন অবাক চোখে কয়েক সেকেন্ড লতিফের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বুঝছি।'

লতিফ বলল, 'দেশ গড়া বোঝেন? দেশ গড়তে কত বলিদান লাগে জানেন? ছহি ইসলামি পাকিস্তান গড়তে হইব আমাদের। চারদিকে ন্যাংটা পুলাপান ভরতি হইয়া গেছে। কায়ামতের দিন করিব চইলা আইসে। কেন হইসে এরূপ? আমরা আর পাকিস্তান নাই বইলা। দেশরে ইন্ডিয়ার কাছে বেইচা দিলে হইব? হইব না। দেশ গড়ার জন্য ছেলে লাগব।'

মজনুদ্দিন বলল, 'জনাব, কুড়ি জন ছেলের বাবা-মায়ের লগে কথা বইলা নিমু?'

লতিফ হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল, 'দরকার নাই। গরিব হতদরিদ্র ঘরের ছেলে তারা। তাগো খাওন-দাওন সব আমরা দিতেছি। পরিবর্তে আমাগোও যা লাগব, তাগো তা দিতে হইব। আপনি জানেন, পাকিস্তান সরকারের লোকেরা আপনার নাম জানবে, যদি আপনি এই কাজ ঠিক কইরা করতে পারেন তবে?'

মজনুদ্দিন বলল, 'জনাব, আপনি যা বলবেন, তাই মেনে চলার চেষ্টা করি। তবু এই কামটা বড় ছোট কাম না জনাব। একসঙ্গে কুড়িজন ছেলে, এলাকায় ঝামেলা হইবে, পুলিশ আইব, অনেক রকম সমস্যা হইব।'

লতিফ বলল, 'পুলিশ আমি বুইঝা নিমু নে, আপনি মিডিয়ারে সামলাইবেন। উলাঝুলা মুখে কান্না করবেন শুধু। বুঝঝেন?'

মজনুদ্দিন বলল, 'বুঝছি জনাব। এই ছেলেরা কী করবে জনাব?'

লতিফ ঠান্ডা চোখে বলল, 'পাকিস্তান গড়বে। আপনারে কবার কওন লাগব? আপনি চান না পাকিস্তান জিতুক? চান না?'

মজনুদ্দিন ঘাবড়ে গিয়ে মাথা নাড়ল, 'চাই জনাব। ইনশাল্লাহ তাই হবে।'

লতিফ খুশি হল। বলল, 'ঢাকার ট্যুর দেন। তারপর বাকি কথা কমু। ফান্ডে টেকা পৌঁছায়ে যাইব। কুড়িজন পাইলে কেউ হিসাব চাইব না মনে রাখবেন।'

মজনুদ্দিন শুকন মুখে বলল, 'জি জনাব।'

৪১

বর্তমান সময়

দুপুর আড়াইটা।

বৃষ্টি পড়ছে। নির্মল নিস্তেজ হয়ে ঘরে শুয়ে আছে। অফিস যায়নি সে। টিভিটা একঘেয়ে খবর পরিবেশন করে যাচ্ছে।

কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। সোবাহান সাহেবের কথাগুলো মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, 'ইন্ডিয়ার দালাল।'

এই কথাগুলো অনেকবার শুনেছে সে। ঠারে ঠোরে তাকে এটাই বোঝানো হয়েছে বরাবর। আনোয়ার সাহেব যেদিন এসেছিলেন, সেদিন একটা কথা বলেছিলেন, 'নির্ভয়ে কাজ করো। যদি তুমি সততার সঙ্গে কাজ করো, আর কেউ কোনদিন না থাকে, আমি থাকব।'

ছিলেনও। বিনা প্রশ্নে যখন সে যা বলেছে, তাই শুনেছেন। প্রকৃত অভিভাবকের মতো মাথার উপর ছিলেন। সে মানুষ নেই ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে।

সোবাহান সাহেবের কথা শুনে বোঝা গেল উনি আনোয়ার সাহেবকে ভারতের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছেন। সোবাহান সাহেব বরাবরই পাকিস্তানপন্থী। কথাবার্তায় পাকিস্তান প্রায়ই বেরিয়ে আসে। প্রায়ই বলেন এ দেশকে ভারত নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। দেশকে ভারতের নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে রাখা দরকার। প্রয়োজনে মধ্যপ্রাচ্য বা পাকিস্তানের থেকে সুযোগ-সুবিধা নিতে হবে।

আনোয়ার অন্য কথা বলতেন। বার বার বলতেন, দেশ স্বতন্ত্রভাবে চলা উচিত। কোনও ধর্মাবলম্বী নয়, যে দেশ ধর্মনিরপেক্ষ, কোনও ধর্মকে অনুসরণ করে না, সে দেশের উন্নতি অনেক বেশি হয়। অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ সে দেশের উন্নতির পদে বাধা দেয় সব সময়। স্বাধীনতার পর ভারত যতটা এগিয়েছে, পাকিস্তান ততটাই পিছিয়েছে। কূটনৈতিক ভাবে তারা ধর্মীয় জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী সংস্থাগুলোকে ভারতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। ফলে বাঘের পিঠে উঠতে হয়েছে। এই বাঘ তাদেরও খেতে শুরু করেছে এবারে। গোটা দেশটাকে খাবার পর সে বাঘ যেন বাংলাদেশেও না আসে, সেটা আটকাতে হবে বাংলাদেশকেই। কথাগুলো সোবাহানসহ অনেকেরই ভালো লাগত না। তবে আনোয়ার সাহেবকে টলানো যায়নি কোনদিন। এ জন্যই হয়তো সরতে হল।

নির্মল জরিনার কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করল। সাকিনা কে? সে নিরুদ্দেশ হয়েছে? সাদিকের সঙ্গে সাকিনার কী সম্পর্ক ছিল?

পর পর একগাদা প্রশ্ন মাথায় আসছে।

ফোন বাজছে। আলমের ফোন। নির্মল সঙ্গে সঙ্গে ধরল, 'বল।'

আলম বলল, 'দোস্ত, তোমারে একখান কথা কই।'

নির্মল বলল, 'বল। তোমার কথা শোনার জন্যই তো বসে আছি।'

আলম বলল, 'সাদিক একটা পক্ষী বুঝলা।'

নির্মল অবাক হল, 'মানে?'

আলম বলল, 'ঘুঘুপক্ষী। এক্কেরে দারুণ এক ঘুঘুপক্ষী। যে পক্ষীর এত ডানা আছে, সে সব ডানার নাগাল পেতে আমার কালঘাম ছুইটা গেছে।'

নির্মল বলল, 'যেমন?'

আলম বলল, 'চার খান ফাইল আছে তার। দুটো সাদা, দুটো কালো। কালো ফাইলগুলান আবার আলাদা জায়গায় রাখা। আমি তার মধ্যে একটা ফাইলের ছবি তুলতে পারসি। আরেকখান এখনও নাগালে নাই।'

নির্মল উত্তেজিত হয়ে দেওয়ালে ঘুষি মারল, 'ইয়েস। কী পাওয়া গেল?'

আলম বলল, 'ইস্তানবুল, করাচী, কুয়ালালামপুর, কলম্বো, কাঠমান্ডুতেও তিনি ব্যবসা করেন। এক্সপোর্ট দেখানো হইছে। ক্লাসিফায়েড টেক্সটাইল। মানে কী?'

নির্মল বলল, 'মানে জানার দরকার নেই। কত ডলারের ট্রানজাকশান?'

আলম বলল, 'শুধু এই অর্থবর্ষে একশো সাতাশ কোটি বাংলাদেশি টাকা।'

নির্মল বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী? এত টাকা? সম্ভব? এ দেশের ধনী লোকেদের তালিকায় তার নাম কোথায়?'

আলম হাসল, 'ভাইরে, তালিকা বাইরে গেলে তাইলে তো ধনী হবে সে। সমস্ত ট্রানজাকশানই হিডেন।'

নির্মল বলল, 'তোমাদের ডিপার্টমেন্টের একটা চক্র যতক্ষণ না তাকে সরাসরি হেল্প করবে, ততদিন ও এ কাজ করতে পারবে না। এর মানে হল তোমাদের একটা অংশ এর সঙ্গে জড়িত।'

আলম বলল, 'সন্দেহ নাই। এ দেশের অনেক রাঘববোয়ালদের ফাইলই এভাবে আছে। সাহেবেরা তাদের মতো করে এসব হ্যান্ডেল করে। তবে সাদিক ভাই ইজ টুরু লাভ রে ভাই। এত টাকা সবার কাম না।'

নির্মল বলল, 'টাকাটা তো এখানেও শেষ হয়নি। আরেকটা ফাইলও তো আছে।'

আলম বলল, 'রাতটা দাও। বের করছি। আনুমানিক এই সংখ্যাটাকেই দুই দিয়ে গুণ করে খুশি থাকো।'

নির্মল বলল, 'খুশি থাকতে পারছি কোথায়? যে পার্টিগুলোর সঙ্গে ট্রানজাকশান হয়েছে, সেগুলিও লাগবে তো। এ দেশে টাকা পাঠায় কোথাও?'

আলম বলল, 'জি পাঠায়। নোয়াখালি, চিটাগাং-এর অনেক মাদ্রাসাতেই পাঠায়।'

নির্মল ভ্রু কুঁচকাল, 'মাদ্রাসায়?'

তাকে অবাক করেই যেন টিভিতে সংবাদ পরিবেশক বলে উঠল, 'ব্রেকিং নিউজ। নোয়াখালি থেকে ঢাকায় শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য আসা মাদ্রাসার তিনটি বাসের একটি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছে। ঘটনাটি জানা গেছে একটু আগে যখন বাসগুলোর একটির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জানার পর মজনুদ্দিন সাহেব বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে যোগাযোগ করেন। আমরা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত খবর নিয়ে আসছি খুব শিগগিরি। সঙ্গে থাকুন।'

নির্মল ফোন রেখে চিন্তিত মুখে টিভির দিকে তাকিয়ে রইল।

৪২

সকাল দশটা।

এয়ারপোর্ট থেকে নেমে গাড়িতে উঠলেন দুজনে।

মাথুর আগেই ফোন অন করেছিলেন। খানকে বললেন, 'পীযূষ ফোন করতে বলেছে।'

আশরফ ইশারায় বোঝালেন সেফ হাউজে পৌঁছে ফোন করবেন।

গাড়ি প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে একটা দরজির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দুজনে নেমে গিয়ে দোকানের ভেতরে প্রবেশ করলেন। দোকানদার বলল, 'কী চাই?'

খান বললেন, 'ভাত খাব। ইলিশ দিয়ে। টাকা এনেছি।'

একটা দশ টাকার বাংলাদেশি নোট এগিয়ে দিলেন খান। তার কোণটা ছেঁড়া।

দোকানদার নোট হাতে নিয়ে দেখে বললেন, 'আসুন। ট্রায়াল রুম এদিকে।'

দোকানের পেছনের দিকে একটা ছোট ঘর। দুজনে সে ঘরে ঢুকলেন।

খান মোবাইলের টর্চ জ্বেলে দেওয়ালে কিছু একটা খুঁজতে শুরু করলেন। কয়েক সেকেন্ড পরেই তার মুখে হাসি ফুটল। একটা সুইচে হাত দিলেন। গোপন দরজা খুলে গেল। দুজনে ঢুকতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। একটা ছোট খাটো ঘর। অ্যাটাচড বাথরুম। এসি চালালেন খান। আলো জ্বালিয়ে বললেন, 'দেখি, পীযূষ কী বলে।'

মাথুর খাটে বসে বললেন, 'ফোন করো।'

খান পীযূষকে ফোন করলেন। পীযূষ ফোন তুলেই বললেন, 'একটা অডিও পাঠাচ্ছি। শোন। ফ্রেশ রিলিজ।'

খান বললেন, 'পাঠাও। ওকে দেখছি।'

ফোনটা কেটে খান মেসেজ বক্স দেখলেন। অডিও মেসেজটা এসেছে। অন করলেন খান,

'প্রিয় বন্ধুরা,

উপরওয়ালার প্রিয়তম বান্দারা,

আমাদের বন্ধুরা যারা এতদিন আমাদের হয়ে কথা বলত, তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটার পর একটা আইন। আমাদের ভাইদের বেঁচে থাকাটাকেই দুষ্কর করে দিয়েছে সবাই। দেশের প্রতিটা অঞ্চলের ভাইরা জানে, কাশ্মীরে কী হচ্ছে। এত সহজে আমরা কাশ্মীর ছেড়ে দেব না। দুটো সেনা রেখে যারা ভেবেছে কাশ্মীর দখল হয়ে যাবে, তারা ভুল ভেবেছে। আমরা জড়ো হব, আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে, এই জিহাদে আমরা কাশ্মীরকে মুক্ত করবই। লড়াই ছাড়লে চলবে না বন্ধুরা। আমাদের প্রত্যেকের রক্ত চায় এ জেহাদ। জিততে আমাদের হবেই।

কণ্ঠরোধ করে কাশ্মীরকে চুপ করে রাখবেন ভেবেছেন? অত সোজা হবে? হতে দেব না। এত সহজে হতে দেব না...আমরা আসছি। বেঁচে থাকাটাই কঠিন করে দেব। প্রতিটা রক্তের হিসেব নেব আমরা। বুঝে নেব সবটা।'

মাথুর ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'সে কী গো? গলাটা চেনা লাগছে না?'

আশরফ বললেন, 'হু। হাসান মাকসুদের গলা। রেকর্ডেড।'

মাথুর বললেন, 'তুমি শিওর হাসান মাকসুদকে আমরা সেই শাস্তিই দিয়েছি? জানা গেছে কি কিছু?'

খান মাথা নাড়লেন, 'না। এখনও কিছুই জানি না। ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন। তুষার স্যার জানতে পারেন।'

মাথুর বললেন, 'জিগ্যেস করো। ফোন করো।'

খান বললেন, 'জেনে কী করবে?'

মাথুর বিরক্তগলায় বললেন, 'এখন আমাদের আবার ওই হাসান মাকসুদের ভূত তাড়া করবে? জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যেত না?'

খান চেয়ার টেনে বসলেন, 'ঠিকই। তুষার স্যারকে ফোন করি। দেখা যাক কোনও ইনফো দেন নাকি।'

মাথুর খানের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, 'করো।'

খান তুষারের নাম্বার ডায়াল করে ফোন স্পিকারে দিলেন।

ফোন রিং হচ্ছে। একবার পুরো রিং হয়ে যাবার পরেও তুষার ফোন ধরলেন না। খান আবার ফোন করলেন। এবার তুষার ফোন ধরলেন।

খান বললেন, 'স্যার, পীযূষের অডিওটা পেয়েছেন?'

তুষার বললেন, 'আমিই পাঠাতে বলেছি। তোমাদের মনে প্রশ্ন উঠেছে, তাই তো?'

খান বললেন, 'বুড়োটার বেঁচে থাকার দরকার ছিল না স্যার। দয়া-মায়া দেখিয়েছেন কি? ওর অডিও বেরোল কী করে এখন?'

তুষার বললেন, ‘জ্যোতির্ময়ের অডিও নিয়ে ভেবো না। এ আই এর জমানায় তোমার বেসুরো গলা দিয়ে কিশোর কুমারের গান গাওয়ানো যাবে। এভ্রিথিং ইজ পসিবল।’

খান হাঁফ ছাড়লেন, ‘ওকে স্যার। মাথা থেকে এটা সরালাম। আমাকে জানান, এখন আমরা কী করব?’

তুষার বললেন, ‘সেল অ্যাক্টিভেট করো, গিয়াস কোথায় আছে খোঁজো। আমাদের যে এজেন্টই ওর কাছে থাকুক, আজ রাতের মধ্যে তাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে হবে। প্রাইমারি টার্গেট এটাই।’

খান বললেন, ‘রাইট স্যার। কাজ শুরু করছি।’

তুষার বললেন, ‘ওখানে আমাদের যারা আছে, লিস্ট পাঠাচ্ছি। কতজনের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারছ দেখো। বাকিটা আমি পরে বলছি।’

খান বললেন, ‘রাইট স্যার।’

তুষার ফোন কাটলেন। খান দেখলেন, তার ফোনে একটা লিস্ট চলে এসেছে। দুজনে ফোন নিয়ে বসে গেলেন।

৪৩

‘ঠিক কত দিন ঢাকার পরিচিতি বানাতে লেগেছে আমার, জানো? রুমান নামের চরিত্রটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে?’

অমল চায়ে চুমুক দিয়ে বলল।

রাণা জিজ্ঞাসুচোখে অমলের দিকে তাকাল। ইমতিয়াজ গাড়ির ব্যবস্থা করতে বেরিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে গাড়ি এলে তারা ঢাকা রওনা দেবে।

অমল বলল, ‘তেরো বছর! উনচল্লিশ বছর বয়স আমার। তেরো বছর আগে আমি এ দেশে এসেছিলাম।’

তেরো বছর? রাণার কত দিন হল? সবে এল! তাও এত বড় একটা কাজে? সে সংকুচিত হল।

অমল বলে চলল, ‘ওল্ড স্কুল মেথড বুঝলে? ওই সময়টা চারদিকে এত ক্যামেরা ছিল না। ভিড়ে মিশতে সুবিধে হয়েছিল। হাতের তালুর মতো চিনতে হবে শহর। প্রথম পোস্টিং কোথায় ছিল জানো?’

রাণা বলল, ‘কোথায়?’

অমল হাসল, ‘মগবাজার। ভিক্ষা করতাম ছেঁড়া জামা পরে। জিগ্যেস করতাম কী হবে স্যার ভিক্ষা করে? কাউকে ফলো করতে হবে? উত্তর আসতো, না। কাউকে মারতে? উত্তর এল, না। তাহলে কী করতে? বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করতাম। একটাই উত্তর আসতো। করে যাও। আমাকে কেউ কোনও কাজ দিত না। হঠাৎ করেই সাদিকের কাজটা এল। সব তৈরি করে ওর বিশ্বাস অর্জন করলাম। সব এত সহজে চলে যাবে?’

রাণা বলল, ‘আসগরের জন্য আপনি কি আমাকে দোষ দিচ্ছেন?’

অমল মাথা নাড়ল, ‘না। দিচ্ছি না। দিলে শুরুতে বাধা দিতাম। মনে করে দেখো, আমিও তোমাকে ওকে মারতে বলেছিলাম, বাধা দিইনি। হিসেব করে দেখতে গেলে ও ব্যাটাকে আমিও অনেকদিন ভেবেছি উড়িয়ে দিই। তোমার গিল্ট ফিলিং হতে পারে, ভেবো না, যা করেছ ঠিক করেছ। পাচার করার আগে ওই বিকৃতমনস্ক আসগর সাত-আট বছরের বাচ্চাদের সঙ্গে যা করত, তার বিস্তারিত বিবরণ দিলে তোমার সব গিল্ট ফিলিং চলে যাবে। ওসব নিয়ে ভেবো না।’

রাণা বলল, ‘কিন্তু সাদিক আপনাকে সন্দেহ করতে পারে। সাকিনা যদি নাম বলে দেয়?’

অমল রাণার দিকে তাকাল, 'কী আর হবে? মরে যাব? মেরে ফেলবে? মারুক। এর বেশি আর কী হতে পারে? মরতে ভয় পাই না। পাবো না।'

রাণার অস্বস্তি হচ্ছিল। অমল তার টার্গেট? কী করে হয়? ঠিক কী করেছে অমল যে উস্তাদ তাকে অমলকে মারতে পাঠিয়েছেন? মানুষের সঙ্গে থাকলে তার কুকীর্তিগুলো বাইরে আসতে শুরু করবেই একটা সময়ে, অথচ অমলের সঙ্গে থাকার পর কী হয়েছে? এক রাতে অজ্ঞাতপরিচয় কারো সঙ্গে দেখা করেছিল। করতেই পারে। এরকম কাজে অনেকের সঙ্গেই গোপনে দেখা হতে পারে। সেটা নিয়ে অভিযোগ করার কোনও কারণ নেই। জিগ্যেস করবে? না থাক। এখনও সে সময় আসেনি।

ইমতিয়াজ ব্যস্ত হয়ে ঢুকল, 'গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। আমি দিয়ে আসব। ভেক ধরবে না? এইভাবেই বেরোবে?'

অমল বলল, 'আধ ঘণ্টা লাগবে। চলো রাণা, তোমাকেও তৈরি করে দিই।'

আধঘণ্টাই লাগল। রাণাকে বয়স্ক লোক বানিয়ে দিল অমল। নিজের বয়স সামান্য বাড়িয়ে নিল। রাণাকে বলল, 'চাচা ভাতিজা। ঠিক আছে না? চলো।'

রাণা হাসল। চাচা সাজতে হবে ভাবেনি কোনও দিন।

গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে ইমতিয়াজের বাড়ির সামনে। ইমতিয়াজ বলল, 'আমার মনে হয় না তোমাদের পথে কোনও সমস্যা হবে। তবে হলে জিনিস আছে তো?'

অমল বলল, 'না। রাণার কাছে ছিল, সে হারিয়ে বসে আছে।'

ইমতিয়াজ অদ্ভুত চোখে রাণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী করতে এদেশে এসেছ, তাও ভুলে গেছ নাকি?'

রাণা চমকে ইমতিয়াজের দিকে তাকাল। ইমতিয়াজ হাসি হাসি মুখে তার দিকে চেয়ে আছে। রাণা মাথা ঠান্ডা করে বলল, 'ভুলিনি।'

ইমতিয়াজ বলল, 'দাঁড়াও। নিয়ে যাও।'

অমল আপত্তি করল, 'না, না। দরকার পড়বে না।'

ইমতিয়াজ বলল, 'তোমার না লাগতে পারে, রাণার জন্য দিচ্ছি। রাণা, এসো।'

রাণা অমলের দিকে তাকাল। অমল বলল, 'নিয়ে নাও। ইমতিয়াজ ভাই বললে দরকার আছে তার মানে!'

ইমতিয়াজ ঘরের ভেতর গেল। পেছন পেছন রাণা। ইমতিয়াজ আলমারি খুলতে খুলতে বলল, 'ভুলে গেছ, কেন এসেছ?'

রাণা চাপা গলায় বলল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

আলমারি থেকে একটা অটোমেটিক রিভলভার রাণার হাতে দিয়ে ইমতিয়াজ বলল, 'তোমায় যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি আমায় এ কথাটা তোমাকে জিগ্যেস করতে বললেন।'

রাণা বলল, 'ভুলিনি। সময় লাগবে। আমি এখনও কিছু শিখিনি।'

ইমতিয়াজ হাসি মুখে রাণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাত্রা শুভ হোক। যাও।'

৪৪

কলকাতা বিমানবন্দর। তুষার ফ্লাইট থেকে নেমে লাগেজ নেওয়ার ভিড়ে গেলেন না। তাঁর লাগেজ নেই। সরাসরি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

ড্রাইভার তাকে নিতে এসেছিল। রাঘব নাম। তুষারের পূর্বপরিচিত। তুষার বললেন, 'কেমন আছ রাঘব?'

রাঘব বলল, 'ভালো স্যার। আপনি ঠিক আছেন তো?'

তুষার বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তো থাকতে হয়। আচ্ছা শোন, তুমি এই ঠিকানাটা চেন নাকি দেখো তো।'

রাঘবের দিকে ফোনটা এগিয়ে দিলেন তুষার।

রাঘব বলল, 'লোকেশন দেখে চলে যাচ্ছি স্যার। অসুবিধা হবে না।'

তুষার খুশি হলেন, 'ফাইন।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। তুষার পকেট থেকে পেন বের করে নোটপ্যাডে লিখলেন, 'আছে? না নেই? কিপিং মাই ফিঙ্গারস ক্রসড। থাকতেই হবে যে করে হোক।'

কিছুক্ষণ পর গাড়িটা নিউটাউনের অত্যাধুনিক বৃদ্ধাশ্রমে প্রবেশ করল। গাড়ি থেকে নেমে কোনদিকে না তাকিয়ে তুষার রিসেপশনে গেলেন।

রিসেপশনে একজন ছেলে আর একজন মেয়ে বসে আছে। তুষারকে দেখে দুজনেই হেসে বলল, 'স্যার, হাউ মে উই অ্যাসিস্ট ইউ?'

তুষার বললেন, 'আমার বন্ধু আছে এখানে। দেখা করতে চাই।'

মেয়েটা বলল, 'নাম বলুন স্যার।'

তুষার বললেন, 'অনিল শেখাওয়াত। কোন ফ্ল্যাটে থাকে, কোন ঘরে, কিছু জানি না। আপনারা হেল্প করলে সুবিধা হয়।'

দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ছেলেটা গম্ভীর হয়ে বলল, 'সরি স্যার, ওই নামে এখানে কেউ থাকে না।'

তুষার হেসে ফেললেন, 'যে আপনাদের এসব লুকোতে বলেছে, তাকে বরং একবার ফোন করুন। বাকিটা আমি বুঝে নেব না হয়।'

ছেলেটার হাসি কমল। বলল, 'কেউ বলেনি স্যার। সত্যিই এখানে কেউ থাকে না।'

তুষার ছেলেটার দিকে স্থির চোখে চেয়ে থেকে বললেন, 'কৌশিক সেন। আধার নাম্বার ৩৪৫২*৪২৫*৫। বাঁ হাতি, বাড়ি বাগুইহাটি, বাবা মা-র এক ছেলে। অথচ কলেজ লাইফে একবার পরীক্ষা না দিয়ে পালিয়ে গেলে। সেই থেকে ড্রপ আউট। বাবা-মা আছেন। দিদির বিয়ে হয়েছে পাটনাতে। মাঝে মাঝে এখানে ঢপ মেরে ছুটি নিয়ে পাটনায় দিদির সঙ্গে দেখা করে আস। ডান পায়ে হাঁটুর কাছে একটা কাটা দাগ আছে, ছোটবেলায় ফুটবল খেলতে গিয়ে পড়ে গিয়ে হয়েছিল। কলেজ লাইফে প্রেম করতে, কিন্তু তুমি ড্রপ আউট জেনে প্রেমিকা কেটে গেল। ব্রাউজারে রাত দশটার পর ইনকগনিটো মোডে পর্ণ সাইট দেখো।'

ছেলেটা আর মেয়েটা হাঁ করে তুষারের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটা বলল, 'আপনি কে?'

তুষার বললেন, 'কথা বাড়াচ্ছ কেন কৌশিক? আমার হাতে বেশি সময় নেই। তুমি নিয়ে যাবে না আরও নতুন কোনও ইনফো দেব? দেরি করলে তোমার সমস্যা বাড়বে এটুকু বলতে পারি। আর হ্যাঁ, শেখাওয়াতকে কোনও ফোন করবে না।'

কৌশিকের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি ডেস্ক থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'চলুন স্যার। আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

তুষার কথা বাড়ালেন না। কৌশিকের পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করলেন।

কয়েক মিনিট পরে একটা দরজার সামনে নিয়ে গিয়ে ছেলেটা বলল, 'এই রুমটা। আমি আসি।'

তুষার মাথা নাড়লেন, 'ওকে।'

কৌশিক চলে গেল। তুষার কলিং বেল টিপলেন।

দরজা খুলে গেল। যে দরজা খুলল তিনি তুষারের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বললেন, 'মনে হচ্ছিল আপনি আসবেন। আসুন।'

তুষার ঘরে ঢুকে বললেন, 'তোমরা মিনিস্ট্রিকে কনভিন্স করে অর্গানাইজেশনকে ভাগ করলে, মেনে নিলাম। নিজেদের জন্য সব রকম স্বাধীনতা চাইলে, তোমাদের তাও দেওয়া হল। এবার দয়া করে কি বলবে

ঢাকায় ঠিক কী চলছে?'

শেখাওয়াত ঘাড় নাড়লেন, 'কিছু না তো। এভ্রিথিং ইজ নর্মাল।'

তুষার মৃদু হাসলেন, 'ওকে। তুমি যা বলবে, তাই মেনে নিতে হবে। বাই দ্য ওয়ে, তোমার কী খবর শেখাওয়াত? কাউকে কোনও রিপোর্ট করার প্রয়োজন বোধ করছ না, আমরা জানি তুমি থাইল্যান্ডে সেটল করে গেছ অথচ দেখা যাচ্ছে কলকাতায় এরকম একটা বৃদ্ধাশ্রমে একা একা বসে আছ। সমস্যাটা কী?'

শেখাওয়াত বললেন, 'আমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমাকে দিতে বাধ্য নই।'

তুষার পকেট থেকে ফোন বের করে স্ক্রিনে কয়েক সেকেন্ড কাজ করে ফোনটা শেখাওয়াতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মিনিস্ট্রি অর্ডার। আমার আগের সমস্ত চার্জ রিস্টোর হয়েছে। আমি বাংলাদেশও দেখব তার অর্ডার আছে। এবার কি তুমি আমাকে বলবে ঢাকায় কী হচ্ছে?'

শেখাওয়াত থমথমে মুখে তুষারের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৪৫

টিভিতে খবরটা মাঝে-মাঝেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছে। কুড়িজন ছাত্রসহ বাস নিখোঁজ হয়ে গেছে। বৃষ্টি নেমেছে। বাইরেটা সাদা হয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির ধোঁয়ায়।

নির্মল তার স্ক্র্যাপ বুক বের করল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর সে এই স্ক্র্যাপবুকে আঠা দিয়ে চিপকে রাখে।

মৌলানা বজলুদ্দিনের একটা উক্তি সে নিজেই লিখে রেখেছিল। বজলুদ্দিন একটা সময়ে আওয়াজ তুলেছিল, এ দেশ পাকিস্তানকে ফিরিয়ে দিতে হবে নিজের সৈনিকদের জন্য। তখনই একটা সমাবেশে বজলুদ্দিন একটা কথা বলেছিল, 'আমাদের সৈন্য দরকার। ছোট থেকে যেখানে যত লোক আছে, তাদের জড়ো করো। বিরাট সৈন্য দরকার। তাদের একসঙ্গে এনে পাকিস্তান তৈরি করতে হবে।'

নির্মল নিজের মনেই বলল, 'একজ্যাক্টলি সেম মডেল ফলো করছে। কোনও ছেলে হারায়নি। এরা এদের ব্রেন ওয়াশ করে কোথাও পাঠাবে এবার। কোথায় পাঠাবে? কে রিকুইজিশন করেছে? এতগুলো ছেলেকে কোনও জায়গায় পাঠাতে গেলে প্রচুর টাকা লাগবে। টাকার সোর্স কে? সাদিক?' উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পায়চারি করতে শুরু করল, 'সাদিক টাকা একসঙ্গে করছে, বা সাদিকের কাছে টাকা আসছে। সে টাকা যাচ্ছে এই ধরনের ছেলেদের ট্রেনিং-এর কাজে। ট্রেনিং অনেকেই দিতে পারে, আইসিস হতে পারে বা এই ধরনের কোনও সংগঠন। উফ! আমি কী করব এবারে?'

দেওয়ালে জোরে ঘুষি মারল নির্মল। এভাবে হবে না। ঘরে বসে থাকলে কিছুতেই হবে না। মোখলেসকে ফোন করল সে। মোখলেস সঙ্গে সঙ্গে ফোন তুলল, 'জি স্যার।'

নির্মল বলল, 'সাদিকের বাড়ি থেকে কত দূরে আছ?'

মোখলেস বলল, 'ফুটপাথেই আছি। ঝুপড়ির ভিতরে। কেউ নাই এখন।'

নির্মল বলল, 'আমার সেসব জানার দরকার নেই। পাখি বেরিয়েছে?'

মোখলেস বলল, 'না স্যার। পাখি সকাল থেকে বেরোয় নাই।'

নির্মল একটু থমকে গিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। রাখছি।'

সাদিকের কারখানাগুলোর তালিকা করেছে সে। শহরের বাইরে একটা কারখানা আছে। বাস যদি সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তো অসুবিধা হবার কথা না! কিন্তু নিশ্চিত হবে কী করে যে সাদিকের কাছেই গেছিল?

তার মাথায় সাদিক ছাড়া অন্য কেউ আসছে নাই বা কেন? হতেই পারে সাদিক কিছু করেনি এখানে। কুড়িটা ছেলেকে নিয়ে বাসটা কেউ অপহরণ করেছে। করলে অবশ্য এতক্ষণে মুক্তিপণের দাবি আসত। তাও খটকার জায়গা হল, কিডন্যাপাররা কিডন্যাপ করলে বড়লোকদের বাড়ির বাচ্চাদের কিডন্যাপ করবে। গরিব, আধা এতিম, দুঃস্থ মাদ্রাসা ছেলেদের কেন কিডন্যাপ করতে যাবে? ধাঁধার উত্তর একটাই, বাস হারায়নি। ছেলেগুলো অন্য কোথাও গেছে।

ঘরে থাকতে ইচ্ছে করছে না। অথচ ধরা পড়লে সোবাহান সাহেব অন্য সমস্যায় ফেলতে পারেন। কী যে করে!

বিরক্ত হয়ে স্ক্র্যাপবুকটাই ঘাটতে শুরু করল সে। আরেকটা নিজের হাতে বানানো নোট পেল, জাহির স্যারের, 'সমস্যায় পড়লে ফোন করবে। আমি আছি।'

জাহির...ইনি আনোয়ার সাহেবের বন্ধু। এক পার্টিতে দেখা হয়েছিল। জাহির বলেছিলেন নির্মলকে তার পছন্দ হয়েছে। পরে কথা বলবেন। পরে আর কথা বলা হয়নি। এঁর সঙ্গে কি কথা বলবে? অনেক উঁচু পদে আসীন। কথা বলবে? না বলবে না? বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নির্মল ঠিক করল ফোন করবে। ফোনবুকে নাম্বার পাওয়া গেল। সে খানিকটা ইতস্তত করেই ফোন করল, কয়েকটা রিং হবার পর জাহির ফোন ধরলেন, 'বলুন নির্মল।'

নির্মল বিস্মিত হল, 'আমার নাম্বার আপনার ফোনে সেভ আছে স্যার?'

জাহির হাসলেন, 'তুমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। তোমার নাম্বার সেভ থাকবে না, তা কি হয়? বলো কী হয়েছে।'

নির্মল বলল, 'স্যার দেখা করা যাবে?'

জাহির বললেন, 'শিওর। কখন বলো।'

নির্মল বলল, 'এখনই?'

জাহির বললেন, 'আমার অফিসে চলে এস। বুঝতেই পারছি খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও কথা হবে। চলে এস।'

ফোন রেখে নির্মল দ্রুত তৈরি হয়ে বেরিয়ে গাড়ি স্টার্ট করল। হৃদস্পন্দন বেড়ে চলেছে তার, কেমন জ্বর জ্বর লাগছে।

খানিকটা পথ যেতে ফোন বাজতে শুরু করল। নির্মল দেখল সোবাহান ফোন করছে। ধরল সে, 'হ্যালো।'

'তুমি অফিস ছুটি নিলে হঠাৎ?'

নির্মল বলল, 'শরীর ভালো লাগছে না স্যার।'

'বেরিয়েছ কেন?'

নির্মল থমকে গেল। তার ফোন ট্যাপ হয়েছে? এখন ফলো করছে তাকে?

৪৬

তুষার চুপ করে বসে আছেন।

অনিল শেখাওয়াত বেশ কয়েকবার ফোন করেও দিল্লিতে কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

তুষার বললেন, 'অকারণ চেষ্টা করে যাচ্ছ। তোমার সঙ্গে কেউ কন্ট্যাক্ট করবে না। আমি চার্জ হ্যান্ডওভার করে নিতে চাইছি। দেরি করলে ক্ষতিটা আমাদেরই। তোমার পাঠানো এক এজেন্ট আই এস আইয়ের হাতে পড়েছে। জানো সেটা?'

শেখাওয়াত হাল ছেড়ে দিলেন। ফোনটা খাটে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। জানি। আমার আরেক এজেন্টকে মেরেও দিয়েছে।'

তুষার বললেন, 'এরা কেউ স্লিপিং ছিল না? সব স্লিপিং সেলগুলোকে তুলে নিয়েছ নাকি?'

শেখাওয়াত বললেন, 'কী করতাম? আই এস আই ম্যাক্সিমাম ম্যান পাওয়ার তুলতে শুরু করছে বাংলাদেশ থেকে। আমরা বসে থাকব?'

তুষার ভ্রু কুঁচকালেন, 'কবে থেকে হচ্ছে এসব? এগুলো মিনিস্ট্রি জানে?'

শেখাওয়াত বললেন, 'তুমি সব মিনিস্ট্রিকে জানাও? পলিটিকাল লোকেরা সব জানলে তোমার চলবে তো?'

তুষার শ্বাস ছাড়লেন, 'ওকে। তা ঠিক করেছ। তোমার এজেন্টকে ওরা ধরল কেন?'

শেখাওয়াত বললেন, 'আমি জানি না কীভাবে ধরল। ধরার কথা না। নিশ্চয়ই বোকার মতো কাজ করেছে মেয়েটা।'

তুষার চোখ বড় বড় করলেন, 'মেয়ে? বাংলাদেশে কোন মেয়ে আছে? আমি কোনও মেয়েকে ট্রেইন করিনি বাংলাদেশের জন্য। কবে হয়েছে এসব?'

শেখাওয়াত বললেন, 'আমি ট্রেন করে পাঠিয়েছি। নতুন মেয়ে।'

তুষার বললেন, 'নতুন মেয়ে? কত দিনের ট্রেনিং?'

শেখাওয়াত বললেন, 'ছ'মাস। এনাফ ফর হার। শি ইজ টাফ।'

তুষার বললেন, 'ওকে। কোথায় পাঠিয়েছ?'

শেখাওয়াত বললেন, 'সাদিক শেখের ব্রথেলে।'

তুষার কয়েকসেকেন্ড শেখাওয়াতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যদি কোনও রোগ ধরে, তখন?'

শেখাওয়াত বললেন, 'ওহ, কোন যুগে পড়ে আছ তুমি? দেশের জন্য এটুকু করতে পারবে না?'

তুষার শ্বাস ছাড়লেন, 'দেশের নাম করে আর কী কী করেছ তুমি? জাল নোট ছড়ানোর কাজ করেছিলে বর্ডারে, আমি সেটা জানি। সেটা কেন করেছিলে?'

শেখাওয়াত কাঁধ ঝাঁকালেন, 'ওই সাদিকের বিশ্বাস অর্জনের জন্যই। বড় মাছ। খুব বড় মাছ। ঢাকায় আই এস আই ছাড়াও অনেক কিছুর সঙ্গে যুক্ত। আমার এজেন্টরা ওর গতিবিধির রিপোর্ট আমার কাছে পাঠায়। তোমাকে সব দিয়ে দেব, দেখে নিও।'

তুষার বললেন, 'আর কোনও এজেন্ট?'

শেখাওয়াত বললেন, 'অমল।'

তুষার উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'তুমি অমলকে অ্যাক্টিভেট করে দিয়েছ?'

শেখাওয়াত পকেট থেকে একটা চিউইং গাম বের করে তার মোড়ক খুলে গামটা অর্ধেক করে তুষারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'চিবোও। উত্তেজিত হচ্ছ কেন? শোন যেটা বলছি।'

তুষার চিউইং গামটা নিয়ে চিবোতে শুরু করলেন, 'কবে করেছ?'

শেখাওয়াত বললেন, 'ঢাকার চার্জ নিয়েই। অমলকে আমার দরকার ছিল। অমল ছাড়া সাদিক আর তারেকের কীর্তি কেউ জানত না। অমল ওর মতো করে সাদিকের দলে ভিড়েছে। সাদিকের হয়ে কাজ করে, সাদিকের হোয়ার অ্যাবাউটস আমাদের পাঠায়।'

তুষার পায়চারি শুরু করলেন, 'অমল কোথায় এখন?'

শেখাওয়াত বললেন, 'জানি না।'

তুষার দাঁড়িয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে, 'জানো না মানে?'

শেখাওয়াত বললেন, 'সাদিকের এক সাগরেদকে অমল আর রাণা উড়িয়েছে। ওর ডেরায় রেইড হবার পর থেকে ওরা নিখোঁজ আপাতত।'

তুষার বিস্ফারিত চোখে বললেন, 'অমলের কভার এক্সপোজ হয়ে গেছে?'

শেখাওয়াত আমতা আমতা করে বললেন, 'সেটা এখনও কনফার্ম নই।'

তুষার বললেন, 'আর এই রাণা কে?'

শেখাওয়াত কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, 'ওকেও নতুন পাঠানো হয়েছে। কাজ শেখানোর জন্য।'

তুষার শেখাওয়াতের সামনে বসলেন, 'কতদিন ট্রেনিং?'

শেখাওয়াত বললেন, 'একদিনও না। অমল শেখাবে বলে পাঠানো হয়েছে।'

তুষার বললেন, 'তোমার নতুন রিক্রুটদের ব্যাপারে অ্যাপ্রুভালগুলো কে করেছিল?'

শেখাওয়াত বললেন, 'তার কেন দরকার হবে? আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি। আমায় কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।'

তুষার হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করতে লাগলেন। শেখাওয়াত বললেন, 'রাণা ইজ গুড। ভেরি গুড। ওই তারেককে সরিয়েছিল।'

তুষার বললেন, 'তারেককে কন্ট্র্যাক্ট কিলার সরিয়েছিল।'

শেখাওয়াত বললেন, 'এই সেই কন্ট্র্যাক্ট কিলার।'

তুষার আবার উঠে দাঁড়ালেন। চুইং গামটা মুখ থেকে বের করে ডাস্টবিনে ফেলে ইলেকট্রিক কেটলিতে জল গরম করে চা বানালেন। টি ব্যাগ গরম জলে নাড়তে নাড়তে বললেন, 'এজেন্সির অবস্থা এত খারাপ ছিল জানতাম না তো! কন্ট্র্যাক্ট কিলার পাঠিয়ে দিচ্ছ, মেয়েটার হেলথের কেয়ার না করে সাদিকের ব্রথেলে পাঠিয়ে দিলে, এবার কী হবে? মেয়েটার কী হবে?'

শেখাওয়াত চুপ করে রইলেন। তুষার চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'সাত আট নাম্বারের ব্যাটসম্যানকে হঠাৎ করে ফার্স্ট ডাউনে ব্যাট করতে পাঠানো হতো কয়েকটা শট খেলার জন্য। তাদের বলা হতো পিঞ্চ হিটার। ঢাকায় তুমি পিঞ্চ হিটার পাঠালে কেন? কাকে মারতে?'

শেখাওয়াত একটু চমকে উঠে সামলে নিয়ে বললেন, 'মারতে পাঠাইনি। ছেলেটার কাজ ক্লিন। আমি দেখেই নিয়েছি। হি ইজ গুড, বিলিভ মি।'

তুষার সন্দিগ্ধ চোখে শেখাওয়াতের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তার মনে প্রশ্নের ঝড় উঠছে। কিছু একটা জিগ্যেস করতে গিয়েও চুপ করে গেলেন তিনি।

তার মনে হল শেখাওয়াত কিছু একটা লুকোচ্ছে। কী লুকোচ্ছে সেটাই বুঝতে চাইছিলেন তিনি...।

৪৭

ইমতিয়াজ গাড়ি চালাচ্ছে। অমল ইমতিয়াজের পাশে বসে আছে।

রাণা গাড়ির পেছনে। তার পকেটে ইমতিয়াজের দেওয়া রিভলভার। যন্ত্রটা পকেটে এলেই রাণার হাত নিশপিশ করতে থাকে। মানুষের জীবনটা বড় অদ্ভুত। একটা সময় অবধি মানুষ একটা পিঁপড়ে অবধি মারতে ভয় পায়। সেই মানুষটাই যখন রক্তের স্বাদ পায়, তখন আরেকবার রক্তের স্বাদ না পাওয়া অবধি সে ছটফট করতে থাকে।

রাণা বুঝতে পাচ্ছিল তার অস্বস্তি হচ্ছে। তার রক্তই তাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিচ্ছে।

ইমতিয়াজ বলল, 'চার ঘণ্টার ব্যাপার। বেশিক্ষণ লাগার কথা না। তাও রাস্তার কথা তো বলা যায় না। কখন মামাদের ইচ্ছে হবে গাড়ি সার্চ করার। রাণা ঘাবড়িও না।'

রাণা পাত্তা দিল না। ভয় পাবার কিছু নেই। অহেতুক ভয় পেতে যাবে কেন? অমল তখন বাইরের ঘরে ছিল। ইমতিয়াজ গলা নামিয়ে বলল, 'রাস্তায় কাজটা করতে চাইলে করতে পারো। আমি সামলে নেব। উস্তাদকে বলে না হয় তোমাকে ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দেব কিছুদিনের জন্য।'

রাণা অবাক হয়ে বলেছিল, 'আর সাকিনা?'

ইমতিয়াজ বলল, 'ও দিল্লি সামলে নেবে।'

রাণা কিছু বলেনি। চুপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল।

এখন অমলের সঙ্গে কেমন সুন্দর করে কথা বলছে ইমতিয়াজ। অমল কি জানে ইমতিয়াজ আসলে তাকে মারতে বলছে? অদ্ভুত একটা পরিস্থিতি তো! লাইব্রেরিতে পড়া ঠগিদের গল্প মনে পড়ে গেল তার।

ঠগিরা তো এমনই ছিল। সর্বক্ষণ বন্ধুর মতো পাশে থাকত। গল্প করত। একসঙ্গে খেত। তাদের শিকারকে তারা তারিয়ে তারিয়ে খেলাত। তাদের ওভাবেই আত্মগোপন করে বন্ধু সেজে শিকারের সঙ্গে ঘুরতে ভালো লাগত। একটা সময় মওকা বুঝে পেছন থেকে গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে দিত। অদ্ভুত একটা ঠান্ডা টাইপের দল ছিল তাদের। নিজেকে ঠগি বলে মনে হচ্ছিল রাণার।

অমল চিন্তিত গলায় বলল, 'ঢাকায় গিয়াস এলে কোথায় থাকতে পারে? সাদিকের কাছে থাকার রিস্ক কি ও নেবে? আসগরের ঘটনার পর সাদিকের ক্রেডিবিলিটি কমার চান্স আছে।'

ইমতিয়াজ বলল, 'সাদিককে ফোন করতে পারো তো। খোঁজ নাও।'

অমল বলল, 'করব?'

ইমতিয়াজ বলল, 'হ্যাঁ, করো। বেশি দূরে থাকলে সন্দেহ বাড়বে। অবশ্য জানি না এখন কী সিচুয়েশন আছে।'

অমল পকেট থেকে ফোন বের করে সাদিককে ফোন করল। একবার রিং হতেই সাদিক ফোন ধরল, 'সালাম ওয়ালাইকুম রুমানভাই। আপনি নেই, আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছি না কী করে সামাল দিব।'

গলাটা আন্তরিকই শোনাল। অমল বলল, 'ওয়ালাইকুম আসসালাম। কী আর বলি বলেন তো ভাই, আমার ফ্ল্যাটে পুলিশ দেখার পর থেকে আমার মাথার ঠিক নাই। খুব ভয় লাগতাসে ভাই।'

সাদিক বলল, 'আপনেরা আমার কাছে চলে আসেন মিয়াঁ। কুনো হালার পুত আপনাগো গায়ে হাত দিতে পারব না। আমি কইতাছি। আমার ওয়াদা রইল। কই আছেন কন, আমি গাড়ি পাঠাইতেছি।'

অমল বলল, 'দরকার নাই ভাই। আমি আসতাছি আপনার বাসায়।' অমল গলায় কান্না নিয়ে এল, 'আসগরের লইগা খুব মন খারাপ লাগে ভাই।'

সাদিক বলল, 'ভাববেন না ভাই, আপনি আসেন। আমি সব সামলায়ে নিতাছি। অনেক কাম আছে ভাই, আপনি ছাড়া হবে না।'

অমল বলল, 'আইতাছি ভাই। আইতাছি।'

ইমতিয়াজ আয়নায় রাণার দিকে তাকাল। রাণার চোখে পড়ল ইমতিয়াজ তাকে দেখছে। ইমতিয়াজ চোখ নামিয়ে বলল, 'খুব ভালো সেটিং করে ফেলেছ যাই হোক।'

অমল বলল, 'নাটক নাকি বুঝতে পারলাম না। হি ইজ আ টাফ নাট টু ক্র্যাক। দু-তিন বার দেখেছি, এভাবেই নিজের লোকেদের ডেকে এনে হাপিশ করে দিত। ভেরি শ্রুড ব্রেইন। ওকে অত তাড়াতাড়ি পড়ে নেওয়া অসম্ভব।'

ইমতিয়াজ হঠাৎ গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল রাস্তার পাশে। অমল বলল, 'কী হল?'

ইমতিয়াজ দাঁত বের করল, 'হালকা হই।' ইমতিয়াজ গাড়ি থেকে নেমে গেল।

অমল বলল, 'সাদিকের কাছে যাওয়া ঠিক হবে রাণা? তোমার কী মনে হয়?'

রাণা বলল, ‘আমার থেকে আপনি ওকে বেশিদিন চেনেন। আপনি যা বলবেন তাই করা যাবে।’

অমল বলল, ‘তোমার ইন্সটিংক্ট কী বলছে?’

রাণা বলল, ‘সাকিনাকে বাঁচাতে হলে যেতেই হবে। না গিয়ে উপায় নেই। ওকে ছাড়া সাকিনার কাছে পৌঁছনোর উপায় আছে কি?’

অমল ঘাড় নাড়ল, ‘রাইট। মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে। ওভাবে জানোয়ারদের হাতে মেয়েটাকে ছাড়া যাবে না।’

রাণা আরও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। অমল ঠিক কী করেছে যার জন্য এরা এভাবে...?

৪৮

জাহির হোসেন চেম্বারেই ছিলেন। তার সেক্রেটারিকে গিয়ে নাম বলায় চেম্বারে প্রবেশের অনুমতি মিলল।

জাহির নির্মলকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, ‘এস এস। কী সৌভাগ্য আমার, তুমি এখানে এসেছ।’

নির্মল লজ্জা পেল, ‘এরকম বলবেন না স্যার। আমি নিতান্ত নিরূপায় হয়েই আপনার কাছে এসেছি।’

জাহির বললেন, ‘বোস।’

নির্মল বসল। জাহির বললেন, ‘বলো কী হয়েছে।’

নির্মল একটু চুপ করে থেকে বলল, ‘স্যার, আমার মনে হয় না আনোয়ার সাহেবের মৃত্যুটা স্বাভাবিক।’

জাহির ভ্রু কুঁচকালেন, ‘কেন এরকম মনে হচ্ছে?’

নির্মল বলল, ‘সাদিক শেখের নাম জানেন?’

জাহির বললেন, ‘কে সে?’

নির্মল বলল, ‘একজ্যাক্টলি স্যার। সাদিক শেখ এই সেদিনও কী করত আমরা কেউ জানতাম না। আমি জানলাম, আনোয়ার সাহেব জানলেন, তার ঠিক পরেই সাহেবের অকস্মাৎ মার্ডার...তারপর থেকে ক্রমাগত আমি থ্রেট পাচ্ছি একটা জায়গা থেকে, আমাকে হঠাৎ করে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে। আমি বুঝতেই পারছি না আমি ঠিক কী করব এখন। এত কিছুর পরে আবার আজকে দেখলাম কুড়িটা ছাত্র নিয়ে একটা বাস নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমি কোনও দিশা না পেয়েই আপনার কাছে এলাম স্যার।’

জাহির পেপারওয়েট হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, ‘তুমি বলছ আনোয়ার সাহেব সাদিক শেখের ব্যাপারে জানার পর মার্ডার হলেন। সাদিক শেখটা কে?’

নির্মল বলল, ‘যার কয়েক কোটি টাকা ব্ল্যাক ট্রানজাকশান চলছে বিদেশের কয়েকটা দেশের সঙ্গে অথচ আমাদের কর দফতর যার ব্যাপারে লিস্ট ইন্টারেস্টেড। যখনই আমি ওর সাগরেদ আসগর খুনের পর কেসটা তদন্ত করতে শুরু করি, একটার পর একটা অদ্ভুত তথ্য সামনে আসতে শুরু করল। কিন্তু বাধা পাচ্ছি প্রতি মুহূর্তে। এখন মনে হচ্ছে আমারই বোধ হয় লাইফ থ্রেট...’

জাহির জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, ‘একবারেই না, ওসব ভেব না। ভালো হয়েছে তুমি আমার কাছে এসেছ। আমি বিষয়টা দেখছি। বাই দ্য ওয়ে, সোবাহানকে তো টেম্পোরারি পোস্ট দেওয়া হয়েছে, সে তো রীতিমত পাকিস্তানপন্থী লোক, সবাই জানে সেটা। সে লোক তোমার পেছনে লাগবে সেটা জানা কথা...ওয়েট।’

জাহির সোবাহানকে ফোন করে ফোন স্পিকারে দিলেন। সোবাহান ধরলেন, ‘সালাম ওয়ালাইকুম সাহেব।’

জাহির প্রত্যুত্তরে সালাম জানিয়ে বললেন, ‘ম্যাডাম আপনার খবর নিচ্ছিলেন জনাব।’

সোবাহান বললেন, ‘ম্যাডাম মানে? পিএম?’

জাহির বললেন, 'হ্যাঁ। কেমন চলছে ইত্যাদি। উনি কয়েকজন পাকিস্তানপন্থী রাজাকারদের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই বেশ বিরক্ত হয়েছেন। কয়েকটা সিক্রেট রিপোর্ট এসেছে ওর কাছে। আপনি জানেন তো?'

সোবাহান উত্তেজিত গলায় বললেন, 'আপনার কাছে মালাউনটা গেছে, না? আমি জানি তো, ও আপনার কান ভারি করছে।'

জাহির গলা খাকরে বললেন, 'মালাউন? আপনি ওই পদে থেকে এই শব্দটা ইউজ করছেন? আপনি জানেন তো এই শব্দটার ব্যাপারে ম্যাডাম কতটা স্ট্রিক্ট?'

সোবাহান বললেন, 'জনাব আপনি আমার কথা শুনুন। আমি যেটা বলছি, সেটা শুনুন। আমরা একসঙ্গে বসতে পারি। কথা বলতে পারি। সাহেব, দেশটা তো আমারও, তাই না?'

জাহির বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন আপনি যে পদে আছেন সে পদটা আপাতত টেম্পোরারি? সাদিক শেখের ফাইলগুলো কোথায়?'

সোবাহান আমতা আমতা করতে শুরু করলেন। জাহির বললেন, 'এখন দুপুর দুটো বাজে। আমি তিনটে অবধি আমার চেম্বারেই বসে আছি। আপনি সশরীরে এসে সাদিকের সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়ে যাবেন।'

সোবাহান বললেন, 'আপনার কাছে নির্মল বসে আছে তো? ওর কাছেই সাদিকের সব রিপোর্ট আছে।'

জাহির ঠান্ডা গলায় বললেন, 'একজন এফিশিয়েন্ট অফিসারকে আপনি অকারণে হ্যারাস করছেন, তাকে ফলো করছেন, সম্ভবত তার ফোন ট্যাপও করছেন। আপনি যদি ভেবে বসে থাকেন যা ইচ্ছে তাই করবেন, আপনার হাতে অগাধ ক্ষমতা আছে, তাহলে আপনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আমার ডেস্কে দুপুর তিনটের মধ্যে সাদিক সম্পর্কিত সব ডকুমেন্ট চাই। নইলে আপনি ওই সময়েই পদত্যাগ করবেন প্রেস ডেকে। অ্যাম আই ক্লিয়ার?'

বলেই ফোন কেটে দিলেন। জাহির নির্মলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভয় কমেছে?'

নির্মল হেসে ফেলল।

জাহির বললেন, 'নির্ভয়ে কাজ করো। আমি আছি। এসব সোবাহান দিয়ে বাংলাদেশ চলবে না। ওসব গল্প একাত্তরেই শেষ হয়ে গেছে। রাইট?'

নির্মল ঘাড় নাড়ল, 'রাইট স্যার।'

৪৯

জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা।

বাথরুমের মেঝেতে পড়ে আছে রুমা। সাদা ধবধবে টাইলসের উপরে সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শুয়ে।

চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে। কোনমতে চোখ খুলে দেখল তাকে বাথরুমে ফেলে রেখে গেছে। হাতটা কি ভেঙে গেছে? কী প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছে!

শরীরটা ঘষে ঘষে কলের তলায় পৌঁছে মাথা দিল সে।

চুলটা একটু একটু করে ভিজছে।

দিব্যেন্দুর কথা মনে পড়ছে। দিব্যেন্দুও একবার তাকে বাথরুমে আটকে রেখেছিল। বিয়ের প্রথম প্রথম। সেদিনই সম্ভবত বলে দিয়েছিল তার প্রথম প্রেমের কথা। আবেগের বশে। দিব্যেন্দুকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি সে! কী ভালো ভালো কথা বলত ছেলেটা!

'এ তো কিছুতেই হতে পারে না তোমার জীবনে আমিই প্রথম পুরুষ। মানুষের জীবন দীর্ঘ হয়। সে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে এই সময় দেখা করে। তোমারও নিশ্চয়ই কারো না কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল। হতেই পারে।

এ নিয়ে চিন্তার তো কিছু নেই। হিংসার কথা তো থাকতেই পারে না!'

রুমা গড় গড় করে বলে দিয়েছিল। দিব্যেন্দু শুনে হাসি হাসি মুখে বসে রইল।

রাত দশটা নাগাদ রুমা টিভি দেখতে বসেছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল তখন বাইরে। বাজ পড়ছে। কী মনে হতে উঠে টিভি বন্ধ করে সবে প্লাগটা খুলেছে, হঠাৎ পিঠে কে যেন সজোরে চাপড় মারল। সে ছিটকে গিয়ে মেঝেতে পড়ল।

'খানকি মেয়েছেলে, আমার সঙ্গে বিয়ে করেছিস তুই? চরিত্রহীন কোথাকার!'

রুমা শিউরে উঠেছিল। পিঠে কী ব্যথা করছে তখন। কিছুই বুঝতে পারছে না! পাগলের মতো তার গায়ে লাথি মারছে তখন দিব্যেন্দু, 'শুওরের বাচ্চা, আমাকে ঠকিয়ে দিলি? কেন আগে বলতে কী হয়েছিল? এতদিন পরে আমি কেন জানতে পারব তুই কী করে এসেছিস? শুয়েছিলি লোকটার সঙ্গে? কী রে? শুয়েছিস?'

রুমা 'মা গো' বলে চিৎকার করে উঠছিল। দিব্যেন্দু চুলের মুঠি ধরে বলেছিল, 'নাটক মাড়াচ্ছিস? এখন সিমপ্যাথি আদায় করার চেষ্টা না? কী ভেবেছিস? আমি কিছুই বুঝতে পারব না? চল...চল।'

চুল ধরে টানতে টানতে তাকে বাথরুমে ছুঁড়ে ফেলে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল দিব্যেন্দু। এখানেই তো সে দুপুরে স্নান করেছিল! সাবান শ্যাম্পুর গন্ধটা তখনও আছে। অবিশ্বাস আর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে রুমা শুয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙেছিল মাঝরাতে। তার ভীষণ ভূতের ভয় করতে শুরু করল। সে দরজা ধাক্কাল, 'খোলো, দরজা খোলো না।'

দরজা খুলল না। ধাক্কাতে ধাক্কাতে একসময় ক্লান্তিতে মেঝেতে বসে পড়ল সে।

সকালে দরজা খুলে দিব্যেন্দু অফিস চলে গেল।

তার জ্বর এল। জ্বর নিয়েই কোনমতে ঘরের বাইরে গিয়ে মেঝেয় অনেকক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে ছিল রুমা।

মা-র কথা মনে পড়ছিল তার, 'শ্বশুর বাড়িতে অনেক কিছু হতে পারে। বর গায়ে হাতও তুলতে পারে। তা বলে রাগারাগির তো কিছু নেই। তোর বাবা আমার গায়েও কত হাত তুলত। নতুন বউ সংসারে পাগলা হাতির মতো। তাকে বশ করার জন্য গায়ে মাথায় চড়-চাপড় মারতেই পারে। ওগুলোকে ধরে বসে থাকলে হবে না। বুঝতে হবে ওই সংসারটাই তো সারাজীবন করতে হবে। বর যেভাবে বলবে, তোকে তেমনভাবেই চলতে হবে। আমি কোনও কথা শুনব না।'

চোখের জলও কখন যেন শুকিয়ে গিয়েছিল। একটা সময় সে উঠে রান্না বসিয়ে খেয়েও নিল।

অফিস থেকে দিব্যেন্দু যখন ফিরল, একবারে স্বাভাবিক। মিষ্টি কিনে এনেছিল। হাসিমুখে প্যাকেটটা তার হাতে দিয়ে বলল, 'নতুন দোকান খুলেছে। খেয়ে দেখো তো।'

যেন কিছু হয়ইনি। রুমা বলতে গেছিল, 'তুমি কি আমার উপর রেগে আছ?'

দিব্যেন্দু হাত নেড়ে বলেছিল, 'ধুস, কী যে বলো!'

প্যাকেট খুলে একটা মিষ্টি মুখেও দিয়েছিল সে। হঠাৎ আঁতকে উঠে দেখল, দিব্যেন্দু তার গলা টিপে ধরেছে, 'খুব নোলা? আমি এনেছি, আমাকে না দিয়ে নিজে নিজে খেয়ে নিচ্ছিস?'

দম বন্ধ হয়ে উঠছে তার, বমি উঠে আসছে...দিব্যেন্দুর সেই রূপ, সে এখনও, এতদিন পরেও কিছুতেই ভুলতে পারেনি।

...

বাথরুমের দরজা খুলে গেল।

একটা কাপড় তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গিয়াস বলল, ‘গেট রেডি।’

কাপড়টা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকল রুমা...।

৫০

সোবাহান তিনটের সময়েই এলেন।

জাহিরের চেম্বারের ওয়েটিং রুমে নির্মল টিভি দেখছিল। সোবাহান এলে নির্মলকে ডেকে নিলেন জাহির।

নির্মল চেম্বারে প্রবেশ করতেই সোবাহান তাকে দেখে বললেন, ‘সাদিকের ফাইল তোমার কাছে কিছু আছে?’

নির্মল বলল, ‘না। আমার কাছে কিছু নেই। অফিসেই ছিল যা থাকার।’

সোবাহান একটা মাত্র ফাইল নিয়ে এসেছিলেন। জাহিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘জনাব আমার কাছে এই একটা ফাইলই আছে। এই ফাইলে সাদিকের বিষয়ে তেমন সন্দেহজনক কিছু নেই। আসগর এককালে ক্রিমিনাল ছিল, পরে ভালো হয়ে যায়। সাদিক ওকে সৎ পথে নিয়ে আসে।’

নির্মল বলল, ‘ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিকের ফাইলগুলো আনার ব্যবস্থা করা হোক। সেখান থেকেই ওর যাবতীয় ট্রানজাকশানের সম্পর্কে জানা যাবে।’

জাহির বললেন, ‘সে সব ঠিক আছে। সোবাহান সাহেব, আপনি নির্মলকে ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টে দিয়েছেন কেন?’

সোবাহান বললেন, ‘আমি দিইনি তো। আনোয়ার সাহেবের সময় থেকেই ওকে ওখানে দেওয়া হয়েছে। আমি মন্ত্রীসাহেবের হুকুম তামিল করেছি মাত্র। ওকে ওর ভালোর জন্যই ওখানে দেওয়া হয়েছিল জনাব। নিরাপত্তার ব্যাপার আছে। যদি সাদিক শেখ সত্যিই বড় প্লেয়ার হয়, তাহলে নির্মলকে টার্গেট করবে। সেটা তো হতে দেওয়া যায় না।’

জাহির বললেন, ‘ওকে যেখানে ছিল, সেখানে দিন। বাকিটা আমি দেখছি।’

সোবাহান বললেন, ‘জি জনাব। আমি যাব এখন?’

জাহির বললেন, ‘যান। বাই দ্য ওয়ে নির্মল, সাদিকের ট্যাক্সের ফাইলটা কে দিয়েছে তোমাকে?’

নির্মল বলল, ‘আমার এক বন্ধু। সোর্সটা বলা যাবে না স্যার।’

জাহির মাথা নাড়লেন, ‘তা ঠিক। তোমার ফ্যামিলি আছে তো?’

নির্মল বলল, ‘জি জনাব। স্ত্রী।’

জাহির বললেন, ‘তোমার ভয় লাগে না? বউ নিয়ে সংসার করছ, এই যে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের ফাইল নাড়াচাড়া করছ, যদি ওদের কাছে খবর যায়, তোমার বউকে তুলে নিয়ে যায়, তাহলে কী হবে?’

নির্মল চমকে জাহিরের দিকে তাকাল। জাহির বললেন, ‘সোবাহানকে আমিই চার্জ দিয়েছিলাম।’

নির্মলের মাথা কাজ করছিল না। এই একটু আগেই তো জাহির অন্য কথা বলছিলেন! সোবাহান হাসছিলেন। জাহিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘সংখ্যালঘুদের নিয়ে এই সমস্যা বুঝলেন জনাব। এরা সবসময় দেখাতে চায় এরা দেশকে ভালোবাসে। আসলে তো কাজ করে ইন্ডিয়ার জন্য। আবার কেমন সাহস দেখুন, আপনার কাছেও চলে এসেছে।’

নির্মলের শরীরটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

জাহির বললেন, ‘তোমরা ইন্ডিয়ায় চলে যাও না কেন নির্মল? সুন্দর দেশ। কলকাতা সাইডে একটা জমি কিনে নিলে। নেতাদের টাকা খাইয়ে ওখানকার আইডিও পেয়ে যাবে। কী দরকার এ দেশে পড়ে থাকার? তুমি ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টে থাকতে চাও না, ঠিক আছে, এক কাজ করো, আমি তোমাকে মায়ানমার সীমান্তে

ট্রান্সফার করছি। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের চার্জটা বরং তুমি নিয়ে নাও। ওদিকে থাকলে খানিকটা বুঝতে পারবে বাকি দেশগুলো কীভাবে সংখ্যালঘুদের ট্রিট করে। নিজেই ঠিক করো, কলকাতা পালাবে না মায়ানমার সীমান্তে যাবে।'

সোবাহান বললেন, 'তাই দিন জনাব। ওর রক্ত গরম। এখন ব্যস্ত থাকুক। ঢাকা ওর জন্য না। ছোট ভাইয়ের মতো বোঝালাম, বাবা, আনোয়ার সাহেবকে দেখে শিক্ষা নাও। ওই লোকেরও তো অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। সে থাকতেই পারে। ছেলের সে ইচ্ছাই নাই! তোমাকে রিম্যান্ডে নিলাম না, হ্যারাসও করলাম না, শুধু তোমাকে একটা ভদ্র জায়গা দিলাম, বললাম শান্ত হয়ে বসে চাকরিটা কন্টিনিউ করো, ট্রেনিং দাও, কিন্তু না! ছেলের হিরো সাজতে লাগবে। সব ইন্ডিয়ান সিনেমা দেখার ফল। এভাবেই আমাদের দেশটা ইন্ডিয়া ধীরে ধীরে কিনে নিচ্ছে। সবই বুঝতে পারি, কী করব, সহানুভূতির সঙ্গেই তো নির্মলের ব্যাপারটা বিবেচনা করেছি। অন্য কেউ হলে কি ওকে বাঁচিয়ে রাখত বলুন?'

জাহির বললেন, 'আমিই রাখতাম না। আপনি পরম ক্ষমাশীল।'

বমি পাচ্ছিল নির্মলের। মনে হচ্ছে মাথার উপর যেন কেউ একমণ ভার চাপিয়ে দিয়েছে। দেওয়ালে বঙ্গবন্ধুর ছবিটা যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

সোবাহান বললেন, 'তাহলে নির্মলের ট্রান্সফার লেটারটা...?'

জাহির বললেন, 'পেয়ে যাবে এখনই।'

দুজনেই হেসে উঠলেন...।

৫১

দাবা খেলছেন দুজনে। মাথুর জিতছেন।

খান চিন্তিত মুখে বললেন, 'তুমি এত ভালো খেলা শিখলে কবে বল তো? আগে তো আমিই তোমাকে কতবার কিস্তিমাৎ করেছি। ইদানীং তুমি একবারে নতুন স্ট্র্যাটেজি নিয়েছ দেখছি। দাঁড়াতেই দিচ্ছ না। এত আক্রমণাত্মক খেলা শিখে গেছ, ভয় লাগছে তোমার সঙ্গে খেলতে।'

মাথুর বললেন, 'কাশ্মীরে জওয়ানদের সঙ্গে খেলে খেলে হাত পাকিয়েছি। কর্নেল রায় যেমন। উনি যদি সেনায় না গিয়ে দাবা খেলতেন, তাহলেও অনেক দূরে যেতেন। দে আর অসাম।'

খান কোনমতে রানি বাঁচিয়ে বললেন, 'সে তো ঠিক আছে, কিন্তু এখানে কাকে ডাকলে লাভ আছে বলে তোমার মনে হয়?'

মাথুর বললেন, 'আমার তো একজনের কথাই মনে পড়ছে।'

খান বললেন, 'কার কথা?'

মাথুর বললেন, 'আরে সায়কের আগে যে করাচীতে ছিল। ওকে কী যেন একটা কারণে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিল না যে তুমি জাস্ট এখানে থাকো। তোমাকে আর কোথাও যেতেও হবে না, তোমাকে আর কিছু করতেও হবে না। একপ্রকার শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।'

খান বললেন, 'অমল? ভেবোও না। তুষার স্যার রেগে যাবেন।'

মাথুর বললেন, 'হ্যাঁ, সে তো জানি, রেগে যাবেন, কিন্তু ঘটনাটা কী হয়েছিল করাচীতে? কী করেছিল অমল?'

খান বললেন, 'জানি না। সেগুলো স্যার জানেন। তবে ঢাকার কোনও ব্যাপারে ওকে ইনভল্ভ করা হয় না, এটা তো অলিখিতভাবে সবাই জানে।'

খানের ফোন বেজে উঠল। তুষার ফোন করছেন। খান স্পিকারে দিলেন, 'হ্যাঁ স্যার।'

তুষার বললেন, 'তোমাকে অদ্ভুত একটা খবর দিই খান। শেখাওয়াত বহু আগেই অমলকে অপারেশনে নিয়ে নিয়েছিল। অমল ঢাকায় বেশ খানিকটা সময় ধরেই সক্রিয়!'

মাথুর শিস দিয়ে উঠলেন, 'কী অদ্ভুত ব্যাপার স্যার, আমরা এতক্ষণ ওর ব্যাপারেই আলোচনা করছিলাম। আপনি আমাদের বলতেন ওকে অপারেশনে নেওয়া যাবে না, এদিকে শেখাওয়াত ওকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে? এরকম কন্ট্রাডিক্টরি কেন ব্যাপারটা?'

তুষার বললেন, 'জানি না। শেখাওয়াতের কথা একবারেই ট্রান্সপারেন্ট না। আমার মনে হচ্ছে ও অনেকখানি কথা পেটে রেখে তবেই কথা বলছে। ওকে আমি সবটা বিশ্বাসও করতে পারছি না। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি অমল অ্যাক্টিভ থাকে, তাহলে আমি অমলকে ছাড়া আর কারো নাম ভাবতে পারব না। শেখাওয়াত একটা নাম্বার দিয়েছে। সেন্ড করছি। কন্ট্যাক্ট অমল।'

খান বললেন, 'ওকে স্যার।'

তুষার বললেন, 'শেখাওয়াত ঠিক কী কী করে রেখেছে, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। অমলের সঙ্গে আরেকটা ছেলে থাকার কথা। সে কন্ট্র্যাক্ট কিলার। শেখাওয়াত ওকে অমলের কাছে পাঠিয়েছে কাজ শেখার জন্য।'

খান ভ্রু কুঁচকে মাথুরের দিকে তাকালেন, 'যা ইচ্ছে তাই করছে তো!'

তুষার বললেন, 'করতে পারে। শেখাওয়াত সব সময় কিছু না কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করেই যায়। এবারেও তাই করেছে। যাই হোক, ওসব নিয়ে ভেবো না, ওকে কন্ট্যাক্ট করো। আই এস আইয়ের হাতে আমাদের যেই থাকুক, তাকে রেসকিউ করা আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি। বাকি পরে দেখা যাবে। ক্লিয়ার?'

খান এবং মাথুর দুজনেই বললেন, 'ক্লিয়ার স্যার।'

তুষার বললেন, 'ওকে, টেক কেয়ার। আপডেট দিয়ে যাবে।'

ফোন কেটে দিলেন তুষার। খান মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'শেখাওয়াত কী করতে চাইছে বল তো? ওর মধ্যে আমি দেখেছি হিরো সাজার একটা ব্যাপার ছিল বরাবরই। যেদিনই ঢাকা থেকে আমরা সরে গেলাম, সেদিন থেকে ও অমলকে অ্যাক্টিভেট করেছে। অথচ আমি জানতাম...'

মাথুর বললেন, 'কী জানতে?'

খান বললেন, 'থাক। পরে সব ঘটনা মনে করে তারপর না হয় বলব। হতে পারে আমি ভুল।'

তুষার নাম্বার পাঠিয়েছেন। খান দেরি করলেন না, নাম্বারটায় ফোন করলেন। একটা রিং হতেই ও-প্রান্তে ফোন রিসিভ হল, 'হ্যালো।'

খান বললেন, 'আকাশে মেঘের সঙ্গে অ্যালিয়েন দেখা যাচ্ছে।'

ও-প্রান্ত বলে উঠল, 'অ্যালিয়েন আমেরিকা ছাড়া কিছু চেনে না।'

খান হেসে উঠলেন, 'রিয়েলি ফানি। আপনি অমল?'

'না। ইমতিয়াজ। আপনি?'

খান বললেন, 'বাবা চাইছে ছেলে মা'র সঙ্গে কথা বলুক।'

একটু নীরবতা। তারপর অমলের গলা পাওয়া গেল, 'বলুন।'

খান বললেন, 'পাখি শহরের কাছে ঘুরছে না?'

'না। পাখি তাড়া খেয়েছিল।'

'ওকে। বুঝেছি। পাখির ঈদে জামা হবে, ট্রায়াল দেওয়ার দরকার। সব কাজ ফেলে আগে জামা কেনা দরকার।'

'কিন্তু ঈগল সীতাকে নিয়ে গেছে।'

'একসঙ্গে খোঁজা যাবে। আগে এখানে।'

'ওকে।'

খান মাথুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসছে।'

মাথুর বললেন, 'ওকেই জিগ্যেস করব করাচীতে কী হয়েছিল?'

খান হেসে ফেললেন, 'একবারেই না। কাজের বাইরে কোনও কথা বলবে না।'

মাথুর কাঁধ ঝাঁকালেন, 'ওকে হুজুর। আপনার যেমন মর্জি।'

৫২

বৃষ্টি পড়ছে গাড়ির উইন্ডশিল্ডে। সাদা হয়ে যাচ্ছে চারদিক। নির্মল চুপ করে বসে আছে। চোখের কোণে জল আসছে, সে আর মোছার চেষ্টা করছে না।

এ দেশটা তার না? জন্মভূমি, তার সব স্মৃতি তো এই দেশেই। এই দেশের মানুষদের কোনদিন পর বলে ভেবেছিল সে? চাকরি করতে গিয়ে প্রতিকূলতা থাকলেও যতদিন আনোয়ার সাহেব ছিলেন, কোনদিন মনে হয়নি এদেশ তার না। আজকে এভাবে অপমানিত হতে হল?

জাহিরের চেম্বার থেকে বেরোনোর সময় শরীর খারাপ লাগছিল তার। আশাভঙ্গ একরকম, আর এ তো কেউ ডেকে এনে চড় মারার মতো ব্যাপার!

গাড়ি স্টার্ট দিতে পারছে না। পা কাঁপছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বৃষ্টিটা ধরে এল হঠাৎ করেই। একটু বসে থেকে গাড়ির দরজা থেকে বেরোতেই দেখল আলমগির হোসেন দল নিয়ে চলে এসেছেন, 'চলো।'

নির্মল বুঝল তাকে রিমান্ডে নিতে এসেছে। সে বলল, 'স্ত্রীকে একটা ফোন করতে পারি? এতদিন একসঙ্গে কাজ করেছি, এটুকু করতে দেবেন তো?'

আলমগির থমথমে মুখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'করে নাও।'

নির্মল কাঁপা কাঁপা হাতে ফোন বের করে দীপাকে ফোন করল।

দীপা ফোন ধরেই বলল, 'কোথায় থাকো বলো তো? আমরা কক্সবাজারে এসেছি। কী মজা হচ্ছে! মামা বলছে যেখানেই থাকুক জামাইকে এখানে চলে আসতে বল। চলে এস না।'

নির্মল কয়েক সেকেন্ড ধরে থেকে বলল, 'আমাকে রিমান্ডে নিচ্ছে দীপা।'

দীপা আর্তনাদ করে উঠল, 'মানে? ইয়ার্কি মারছ তুমি?'

নির্মল বলল, 'না। রিমান্ডে নিচ্ছে। সাবধানে থেক। আমি যদি আর কোনদিন না ফিরি...'

আলমগির নির্মলের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে ফোন কেটে সুইচ অফ করে দিয়ে বললেন, 'চলো।'

নির্মল গাড়ির চাবিটা আলমগীরের হাতে দিয়ে বলল, 'আমার গাড়িটা বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।'

আলমগির নির্মলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। আমি পাশে বসছি। তুমি বাড়িতে গাড়ি রেখে চলো।' আলমগির বাকিদের বললেন, 'নির্মলের গাড়িটা ফলো করে এস।' বাকিরা জিপে উঠে পড়ল।

নির্মল গাড়িতে উঠে বসল। আলমগির তার পাশে। নির্মলের পা কাঁপছে, হাত কাঁপছে। আলমগির সেটা দেখে বললেন, 'আমি চালাচ্ছি।'

নির্মল গাড়ি থেকে নামল। আলমগির ড্রাইভিং সিটে এসে বসলেন। নির্মল বসল। গাড়ি স্টার্ট করে আলমগির বললেন, 'কী করেছ তুমি? এই তো সারাক্ষণ আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে কাজ করছিলে। এখন

রিম্যান্ডে নিচ্ছে কেন?'

নির্মল জানলার বাইরে তাকাল। শহরটাকে অচেনা লাগছে। এখন তাহলে সে বিদেশে আছে? এ দেশটা তো তার নয়!

আলমগির হর্ন দিলেন, 'শুনতে পাচ্ছ কী বলছি? কী করেছ যে সোবাহান সাহেব আমাকে স্পেশাল ইন্সট্রাকশন দিলেন তোমাকে এখনই রিমান্ডে নিতে হবে? তাড়াতাড়ি বলো, দেরি কোরো না।'

নির্মল বলল, 'আমাকে বলা হয়েছে আমি ইন্ডিয়ার এজেন্ট। আমি জানি না আমি কী করেছি ইন্ডিয়ার এজেন্ট হবার মতো।'

আলমগির বললেন, 'ব্যস? আর কিছু করোনি?'

নির্মল বলল, 'একজনকে এক্সপোজ করতে গেছিলাম। বুঝলাম তার হাত অনেক উপরে। আর কী বলি বলুন তো?'

আলমগির বললেন, 'হুঁ। মানে তোমার জায়গায় যেকোনও দিন আমিও থাকতে পারি আর কী।'

নির্মল বলল, 'তা কেন? আপনি তো আর সংখ্যালঘু নন। আপনাকে শুনতে হবে না আপনি ইন্ডিয়ার এজেন্ট।'

আলমগির চুপ করে গেলেন। নির্মলের বাড়িতে গাড়ি পার্ক করা হল। নির্মলকে জিপে তোলা হল। সেই একই বিল্ডিং। কত লোককে এখানে এনে জেরা করেছে সে। এবার তাকে জেরা করা হবে। বাজে একটা কারণ দেখিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। নির্মল অনেকটা স্বাভাবিক হচ্ছিল। শেষটা জানলে টেনশন করার কোনও কারণ থাকে না।

করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আলমগির গলা নামিয়ে বললেন, 'লোকটা কি সাদিক শেখ?'

নির্মল অবাক হল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

আলমগির বললেন, 'সাদিক সোবাহানের দুলাভাই। তুমি কেন, অনেকেই জানে না সেটা। আমরা যারা পুরোনো লোক, তারা জানি।'

নির্মল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

৫৩

'আমরা সাদিকের বাড়ি নামব না। আগে নেমে যাব।'

গাড়ি সবে শহরে ঢুকেছে। ফোন রেখে অমল ইমতিয়াজের দিকে তাকাল। অমলের কথা শুনে ইমতিয়াজ অবাক হল।

'কেন? কী হয়েছে?'

অমল বলল, 'তুমি চলে যাও। আমাদের নামিয়ে দাও।'

ইমতিয়াজ বলল, 'ফোনটা কে করেছিল?'

অমল বলল, 'তোমার জানা উচিত। তুমি জানো না?'

ইমতিয়াজ গম্ভীর হয়ে বলল, 'উস্তাদ ফোন করেননি। উস্তাদ ছাড়া অন্য কারো কথা শোনা ঠিক হবে না।'

অমল বলল, 'আমি কোডের গোলাম বস। আমার এখানে কিছু করার নেই।'

ইমতিয়াজ বলল, 'বেশ। তুমি যখন বলছ, তখন তাই হোক। কোথায় নামাব?'

অমল বলল, 'এখানেই নামিয়ে দাও। এখান থেকে ফিরতে সুবিধে হবে তোমার।'

ইমতিয়াজ বলল, 'আমি যাব না?'

অমল বলল, 'না। তুমি চলে যাও।'
রাণা অবাক হল। ফোনটা আসার পর থেকে অমল কেমন পাল্টে গেল।
ইমতিয়াজ গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। অমল রাণার দিকে তাকাল, 'অস্ত্রটা ফেরত দিয়ে দাও।'
রাণা কোনও কথা না বলে ইমতিয়াজের গাড়ির সিটে সন্তর্পণে রিভলভারটা রেখে দিল।
অমল গাড়ি থেকে নামল, 'চলো।'
রাণা নামতে যেতেই ইমতিয়াজ বলল, 'আজকেই করবে। মাথায় রেখো।'
রাণা কথা না বলে গাড়ি থেকে নেমে গেল। ইমতিয়াজ বেরিয়ে গেল। অমল একটা সি এন জি ধরে ঠিকানা বলল। সি এন জি চলতে শুরু করলে রাণা ফিসফিস করে বলল, 'কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না।'
অমল ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় রাণাকে চুপ করে যেতে বলল।
রাণা আর কোনও কথা বলল না। দোকানের সামনে এসে সি এন জি ছেড়ে দিল অমল।
ট্রায়াল রুমে ঢুকে নক করতেই দরজা খুলে গেল।
খান বললেন, 'এস এস।'
দুজনে ঘরে ঢুকতে খান দরজা বন্ধ করে দিলেন।
মাথুর বললেন, 'সেই ফেমাস অমল, হ্যাঁ? আপনার কথা অনেক শুনেছি। কত গল্প, কত মিস্ট্রি, ভাবাই যায় না।'
অমল হাসল, 'ও রাণা। ওকে উস্তাদ পাঠিয়েছেন আমার সঙ্গে থেকে কাজ করতে।'
খান রাণার দিকে হাত বাড়ালেন, 'তুমি জানো তুমি কত বড় কাজ করেছিলে? তারেক শেখকে কেমন অনায়াসে উড়িয়ে দিয়েছিলে! আনবিলিভেবল!'
রাণা বলল, 'আমার কাজই ওটা। তারেক শেখ কী কাজ করে, আমি কিছুই জানতাম না।'
খান বললেন, 'ঠিক। তোমাকে শেখাওয়াত এখানে পাঠিয়েছে কেন, আমরা সেটাই এখনো বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এখন সবার আগে আমাদের লোককে উদ্ধার করতে হবে। তারপর বাকি কথা। আপনি বলুন অমল, আমরা কীভাবে ওকে উদ্ধার করতে পারব।'
অমল বলল, 'জল খাই একটু? তারপর বলি?'
মাথুর ব্যস্ত হয়ে অমলের দিকে জলের বোতল এগিয়ে দিলেন। অমল অনেকটা জল খেয়ে বলল, 'লাস্ট তিন বছরে আই এস আই এখানে অনেকটাই শক্তিবৃদ্ধি করেছে। অনেকগুলো জায়গায় ওদের ডেরা হয়েছে। তিন-চারজন রাজাকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কাজে লাগানো শুরু হয়েছে। তবে আমার মনে হয় গিয়াস ঢাকার বাইরে নয়, ঢাকার মধ্যেই কোথাও সাকিনাকে রেখেছে। তবে এখনো আছে নাকি জানা নেই। ওরা ওকে নিয়ে যেতে চাইবে যদি না কোনও ম্যাজিকে সাদিক সাকিনাকে আবার নিজের কাছে রেখে দেয় কিংবা...'
একটু চুপ করে থেকে অমল বলল, 'মেরে ফেলে।'
মাথুর মাথায় হাত দিলেন। খান বললেন, 'সে মারতেই পারে। কিন্তু ধরে নিয়ে গেলে...কতটা কী জানে আমাদের অ্যাসেট?'
অমল বলল, 'ঢাকা অপারেশনের সবটাই।' রাণা অবাক হয়ে অমলের দিকে তাকাল।
খান বললেন, 'মাই গড। ইজ শি কেপেবল এনাফ?'
অমল বলল, 'কোন মেয়ে এসে সাদিকের মতো নরকের কীটের সঙ্গে শোবে বলুন তো? আর কত কেপেবিলিটি প্রমাণ করতে হবে?'
খান লজ্জা পেলেন, 'ছি ছি। আমি সেটা বলিনি। সব জানে বললেন বলেই বললাম। তার মানে শি ইজ দ্য মোস্ট ইমপরট্যান্ট অ্যাসেট নাও। ওর কাছে সব থেকে তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর কী উপায়?'

অমল বলল, 'সাদিক।'

খান বললেন, 'সাদিক আপনাকে সাকিনার ডিটেলস দেবে কেন?'

অমল বলল, 'জানি না। কিন্তু ও ছাড়া অত তাড়াতাড়ি কেউ গিয়াসের কাছে নিয়ে যেতে পারবে না। একটা ফোন দিন।'

খান তার ফোন এগিয়ে দিলেন। অমল নাম্বার ডায়াল করল। চট্টগ্রামের ভাষায় কিছুক্ষণ কথা বলে ভ্রু কুঁচকে বলল, 'কুড়ি জন মাদ্রাসা স্টুডেন্ট হারিয়ে গেছে। আমাকে সাদিক যেখানে যেখানে পাঠিয়েছিল, তার মধ্যে একটা জায়গার কোডে M ছিল। কাঠমান্ডুর কোড। M=মাদ্রাসা? আমি কাঠমান্ডু গেছি প্রায় এক মাস আগে। এক মাস আগে আজকের প্ল্যানটা করা ছিল তাহলে। আমাকে একটা কাগজ আর পেন দিন প্লিজ।'

খান একটা প্যাড আর পেন এগিয়ে দিল।

অমল দ্রুত গতিতে প্যাডে লিখল

T M S = Twenty Madrasa Students (?)

ভ্রু কুঁচকে সেদিকে কয়েকসেকেন্ড তাকিয়ে অমল বলল, 'এত সোজা? এর জন্য কেউ কাঠমান্ডু যাবে কেন? অদ্ভুত!'

৫৪

'আপনি শেষ কবে ইন্ডিয়া গেছেন নির্মল?'

একটা বাল্ব ঝুলছে। এই ঘরটা তার চেনা। কতবার প্রশ্নকর্তার জায়গায় বসেছে সে।

এখন উল্টো দিকে তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। প্রশ্ন করছেন আরিফ রহমান। আরিফ সব সময়ে আসেন না। মাঝে মাঝে আসেন। হাই প্রোফাইল অপরাধীদের জন্য। সে তাহলে এদের কাছে হাইপ্রোফাইল অপরাধী। হয়ত আজ রাতেই তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে ফেলে দেওয়া হবে। গরম সীসার বুলেট ভেদ করে ফেলবে তার শরীর। এই দেশের মাটি, যাকে সে সবথেকে বেশি ভালোবেসেছিল, সে মাটি ভিজে যাবে তার রক্তে।

আরিফ রহমানের প্রশ্নের উত্তরে নির্মল তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নভেম্বরে। কলকাতায়, স্ত্রীর মামার ছেলের বিয়েতে।'

আরিফ তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বললেন, 'সেখানে কার কার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

'আমার শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে।'

'আর?'

'আর কেউ না।'

'আপনি শিওর?'

নির্মল হেসে ফেলল। আরিফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে কি র-এর লিংক খুঁজতে চাইছেন? এমনিই তো মেরে ফেলবেন বুঝতে পারছি। খামোখা নাটক প্যাঁচাচ্ছেন কেন?'

আরিফ রাগী গলায় বললেন, 'আমি যা প্রশ্ন করছি তার উত্তর দিন।'

নির্মল বলল, 'ওকে। করুন।'

আরিফ বললেন, 'আপনার ফোনে মাঝে-মাঝেই ইন্ডিয়া থেকে ফোন আসে। তারা কারা?'

নির্মল বলল, 'উনিশশো সাতচল্লিশ সালের আগে পাকিস্তান বলে কোনও দেশ ছিল না। শুধুই ইন্ডিয়া ছিল। দেশ ভাগ হল। এ-প্রান্তে থাকা অনেকেই ও-প্রান্তে চলে গেলেন। আত্মীয়তা সূত্রে অনেক মানুষই এখন

এভাবেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত আছে। যদি সত্যিই আপনি সোর্সগুলো দেখতে চান, এমব্যাসিতে খবর পাঠান, তারা ঠিকই বলে দেবে ফোনগুলো আমি আমার আত্মীয়-স্বজনকেই করেছিলাম।'

আরিফ বললেন, 'আপনার কথাগুলো কোনটাই সোজা না। আপনি কি এভাবেই টেরিয়ে কথা বলতে পছন্দ করেন?'

নির্মল বলল, 'গল্পের শেষটা দেখতে পারলে ছোটখাটো ভয়গুলো চলে যায়। আমি আমার গল্পের শেষটা জানি। একজন কোরাপ্টেড মানুষের সঙ্গে কতগুলো কোরাপ্টেড মানুষ যুক্ত হয়ে একটা দেশবিরোধী কাজ করছে। আমি মাঝে পড়ে গেছি। আমাকে সরাতে হবে। অকারণে আপনি নাটক করছেন আরিফ সাহেব। আপনার সময়ের দাম আছে। আপনি চলে যান। যা করার ওদের করে নিতে দিন। আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব, কথা দিচ্ছি।'

আরিফ নির্মলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু থেমে বললেন, 'কোরাপ্টেড মানুষ মানে?'

নির্মল বলল, 'একটা ইনভেস্টিগেশন করছিলাম। সেখানেই সাপের ল্যাজে পা পড়েছে। আপনি কিছু জানেন না এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

আরিফ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে বললেন, 'ইন্ডিয়ার এজেন্টরা এভাবেই কথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছে?'

নির্মল বলল, 'ইন্ডিয়ার এজেন্ট? আমার পারফরম্যান্স দেখেছেন আপনি? আনোয়ার সাহেবকে চিনতেন না আপনি? আপনি জানেন না উনি ইন্ডিয়ার হয়ে কাজ করেছেন না বাংলাদেশের জন্য শেষ দিন অবধি কীভাবে ভেবে গেছেন?'

আরিফের ফোন বেজে উঠল। আরিফ ভ্রু কুঁচকে ফোনের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'ওকে। এখনকার মতো এই অবধিই। রেস্ট করুন অফিসার।'

অদ্ভুতভাবে আর কোনও কথা না বলে আরিফ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নির্মল টেবিলে চুপ করে বসে রইল। আলমগির কাচের জানলার ওপাশ থেকে তাকে দেখছিলেন।

নির্মল বলল, 'কী হল? সাহেব চলে গেলেন কেন? অকারণ বসিয়ে রেখেছে কেন রাজাকারগুলো? যা করতে চায়, করতে বলে দিন না।'

আলমগির চেম্বারে প্রবেশ করে বললেন, 'তুমি মাথা ঠান্ডা করো। তুমি কেন ধরে নিচ্ছ যে এখনই সব শেষ হয়ে গেছে?'

নির্মল বলল, 'আমি তো বুঝতে পারছি। এটা না বোঝার কি কিছু আছে? আমি ইন্ডিয়ায় কার সঙ্গে দেখা করতে যাব? প্রশ্নগুলো কোনদিকে যাচ্ছে, তা বোঝার মতো বুদ্ধি কি আমার নেই?'

আলমগির নির্মলের কাঁধে হাত দিলেন, 'আবারও বলছি। আরিফ সাহেব কেন বেরোলেন সেটা দেখা যাক।'

নির্মল দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল।

৫৫

দুপুর তিনটে। একটা এস ইউ ভি গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে হাইওয়ের উপরে। গাড়ি থেকে কেউ নামেনি। যেন অপেক্ষা করছে গাড়িটা। অপেক্ষাটা সফলও হল। একটা সেডান এসে দাঁড়াল এস ইউ ভির পেছনে।

সেডান থেকে সাদিক নেমে এস ইউ ভির দরজার কাছে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল। সাদিক গাড়িতে উঠে বসে দরজা বন্ধ করল। গিয়াস বসে আছে গাড়িতে। সাদিককে দেখে ঘড়ি দেখল, 'পনেরো মিনিট লেট।

সময়ের দাম দেওয়া উচিত।'

সাদিক বলল, 'জ্যাম। ঢাকার জ্যাম। বোঝেন তো কী সমস্যা?'

গিয়াস ভর্ৎসনার চোখে সাদিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাই হোক, মেয়েটা কিছুই বলছে না। ওকে হেডকোয়ার্টারে পাঠানোর অর্ডার এসেছে।'

সাদিকের মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল, 'সে কী? আমি তো কিছু জানি না।'

গিয়াস বলল, 'সব কথা তোমাকে জানানোর কথা তো নয়। এটা নিয়ে এত ভাবনারই বা কী আছে?'

সাদিক মাথা নিচু করে বলল, 'জনাব, আমি জানি মেয়েটা কিছু করেনি। এ মেয়ের অত ক্ষমতা নেই।'

গিয়াস বলল, 'সেটা আমরা বুঝব। আমাদের বুঝতে দাও।'

সাদিক বলল, 'আপনারা যা ভালো বোঝেন। আমাকে কী করতে হবে?'

গিয়াস বলল, 'তোমার কাছে আরেকটা মেয়ে আছে। জরিনা বলে। ওকেও আমি নিয়ে যেতে চাই।'

সাদিক চমকে উঠল, 'কেন জনাব? জরিনা কী করল?'

গিয়াস বলল, 'ওর কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। ঘুমের ঘোরে সাকিনা অনেকবার ওর নাম নিয়েছে।'

সাদিক বলল, 'যন্ত্রণা থেকে নিয়েছে জনাব। জরিনাকে আমি জন্ম থেকে চিনি। ওর কোনওভাবেই কোনও কিছুতে থাকার কথা না। ঘর থেকে ও মেয়ে বেরোয় না।'

গিয়াস বলল, 'কী রকম চেনো তুমি ওকে?'

সাদিক বলল, 'জরিনার মা আমার ওখানেই ছিল। ওখানেই ওর জন্ম। ও কিছুতেই কোনও ব্যাপারে জড়িত না। সাকিনাও না। আপনি ওকেও অকারণে নিয়ে যাচ্ছেন।'

গিয়াস বলল, 'সেটা আমি ঠিক করব। হেডকোয়ার্টার ঠিক করবে। তুমি না। জরিনাকে রাত আটটার মধ্যে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর। ওকেও ইন্টারোগেট করার দরকার আছে। হতে পারে এই সাকিনা জরিনার মাধ্যমেই র-এর এজেন্টের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করত।'

সাদিক কয়েক সেকেন্ড গিয়াসের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'দেখছি কী করা যায়।'

গিয়াস রেগে গেল, 'দেখছ মানে? এখানে দেখার কী আছে? আমি বলছি, তোমাকে সেটাই শুনতে হবে। আমার কথার অমান্য করার অধিকার তোমায় দেওয়া হয়নি।'

সাদিক বলল, 'মেয়েটাকে আপনার কাছে রেখে দিলেন। অকথ্য অত্যাচার করলেন। ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করালেন। কিছুই পেলেন না। অকারণে টেনে টেনে নিয়ে যাবেন। তারপর জরিনাকেও নিয়ে যেতে চাইছেন। এভাবে কি কিছু করা যায়? আপনি আপনার ব্যর্থতা ঢাকতে এই মেয়েগুলোকে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিতে চাইছেন কেন?'

গিয়াস বিস্মিত হয়ে সাদিকের দিকে তাকাল, 'আরে? তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ? তোমার এত সাহস? তুমি জানো আমি কে?'

সাদিক বলল, 'আপনি যখন এখানে আছেন, তখন আপনারও জানা উচিত আমি কে? জানেন আশা করি?'

গিয়াস থতমত খেয়ে গেল, 'তুমি কিন্তু প্রসিডিওর মানছ না। এটা কথা ছিল না। কথা ছিল আমি যা যা বলব, যা যা চাইব, তা তোমাকেই সাপ্লাই করতে হবে। তুমি এখন বেঁকে বসছ, সমস্যাটা কী? জরিনাকে দিতে তোমার কী সমস্যা?'

সাদিক বলল, 'শুধু জরিনা কেন, সাকিনাকে দিতেও আমার সমস্যা আছে। আপনি ওকে আমার কাছে হ্যান্ড ওভার করে দিন।'

গিয়াস বড় বড় চোখ করে সাদিকের দিকে তাকাল।

গিয়াস বলল, 'কী হয়েছে তোমার?'

সাদিক বলল, 'কিছু হয়নি। তবে কুড়িটা ছেলেকে বর্ডার পার করতে হলে আপনার আমাকে প্রয়োজন। সেটা ভুলে যাবেন না। অকারণে এসব মেয়েদের ট্যানাহ্যাচড়া করলে ফল ভালো হবে না। আমি দরকার হলে ইসলামাবাদেও কথা বলব।'

গিয়াস বলল, 'ওকে। জরিনাকে লাগবে না। কিন্তু ডোন্ট টক অ্যাবাউট সাকিনা। আমার গাট ফিলিং বলছে ও অনেক গভীর জলের মাছ।'

সাদিক বলল, 'আমার সাকিনাকে লাগবে। ওকে আমি নিয়ে যেতে দেব না।'

গিয়াস ফোন ঘাঁটতে শুরু করল, 'তুমি এখন যাও। আমরা বরং পরে কথা বলব, কেমন?'

সাদিক বলল, 'আপনি ঢাকা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমি জানি, সাকিনা আপনার সঙ্গে আছে। কোথায় আছে?'

গিয়াস বলল, 'নেই তো।'

সাদিক পকেট থেকে রিভলভার বের করে গিয়াসের মাথায় তাক করল, 'ডিকি খোল।'

গিয়াস রাগল না। ড্রাইভারকে বলল, 'ওকে ডিকি খুলে দেখাও।'

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে ডিকি খুলল। সাদিকও নামল। ডিকি ফাঁকা। সাদিক গাড়ির দরজা খুলে রাগী গলায় বলল, 'কোথায় সাকিনা?'

গিয়াস হাসি হাসি মুখে বলল, 'বাই। পরে কথা হবে।'

সাদিক বলল, 'বাইরে আয়। গাড়ির বাইরে আয়।'

গিয়াস মুখে চুক চুক শব্দ করে বলল, 'একজন বেশ্যার জন্য এত প্রেম তোমায় মানায় না সাদিক। তোমার জন্য ভালো মেয়ে পাঠিয়ে দেব। দরজা বন্ধ কর। দেরি হলে মৌলানাকে আমি উত্তর দেব না। তুমি দেবে।'

মৌলানা শব্দটায় যেন সাদিকের মুখে নুন পড়ল। সে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। গিয়াসের গাড়িটা বেরিয়ে গেল।

সাদিক পকেট থেকে ফোন বের করল। কয়েকটা রিং হতে জরিনা ধরল, 'জি সাহেব। কিছু বলবেন?'

সাদিক বলল, 'না। কিছু বলার নাই।'

জরিনা বলল, 'তাহলে ফোন দিলেন কেন?'

সাদিক বলল, 'কোনও কারণ নাই। তুই ফোন রাখ।'

জরিনা বলল, 'জি।'

ফোন কেটে গেল। সাদিক অসহায়ের মতো কয়েক সেকেন্ড রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফোন করল, ফোন বাজতে শুরু করল। ও-প্রান্ত দুটো রিং হবার পর ফোন তুলল, 'জি ভাই।'

সাদিক বলল, 'রুমানভাই, আপনি আমার লগে এখন দেখা করতে পারবেন?'

৫৬

'সাদিক ডাকছে।'

অমল ফোন রেখে বলল।

খান বললেন, 'ঠিক কী রকম পরিস্থিতি হল যে তোমাকে ডাকতে হচ্ছে?'

অমল বলল, 'বুঝতে পারছি না। সাদিক গিয়াসকে পারসোনালি ডিল করে। সেখানে আমাদের সবার প্রবেশ নিষেধ। আমি জানতেও পারি না গিয়াস ঠিক কী করছে বাংলাদেশে এসে। আন্দাজ করার চেষ্টা করি শুধু। এই ফোনটা গিয়াসের ব্যাপারে নাকি তাও জানি না।'

খান মাথুরের দিকে তাকালেন। মাথুর বললেন, 'ডাকছে যখন, তখন যাওয়াই ভালো। কী বলো?'

অমল বলল, 'জানি না। কভার এক্সপোজ হয়ে গেলে অনেক সময় সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে মেরেও দিতে পারে। অবশ্য আমি ঠিক করেই এসেছিলাম সাদিকের কাছে যাব। আমাদের এজেন্টের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। সাদিক ছাড়া ওর কাছে যাওয়াও যাবে না।'

খান বললেন, 'তাহলে যাও। রাণাও যাও অমলের সঙ্গে।'

অমল মাথা নাড়ল, 'না, থাক। একসঙ্গে দুটো উইকেট পড়লে কী করে হবে? রাণাকে দরকার হলে বরং তখন ডেকে নেওয়া যাবে।'

খান বললেন, 'আমরা ঠিক কী ভাবে তোমাকে হেল্প করতে পারব?'

অমল বলল, 'এই মুহূর্তে আমাকে কেউ হেল্প করতে পারবে না।'

খান বললেন, 'তোমাকে পাঠিয়ে আমরা এখানে বসে বসে কি সিনেমা দেখব? সেটা তো সম্ভব না। আমরা একটা গাড়ি নিয়ে যাই, দূরে অপেক্ষা করি। তুমি সাদিকের সঙ্গে ডিল করো। কী হবে, পরে দেখা যাবে।'

অমল বলল, 'ঠিক আছে। কী বলে দেখা যাক।'

মাথুর বলল, 'গাড়ির ব্যবস্থা?'

অমল বলল, 'করছি।'

একটা নম্বরে ফোন করল অমল। ফোন রেখে বলল, 'চলুন, বেরোন যাক। গাড়ি আসছে পার্কের সামনে। তার আগে চারজন প্রত্যেকের সঙ্গে একটা দূরত্ব রেখে এখান থেকে বেরোব। আমি বেরিয়ে ফুটপাথের উল্টো দিকে যাচ্ছি। ঠিক দু'মিনিট গ্যাপে একজন করে বেরোবেন।'

খান বললেন, 'ফাইন।'

অমলের প্ল্যান অনুযায়ী সবাই এক একজন করে বেরিয়ে রাস্তার অপর প্রান্তে গিয়ে অমলের পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করল।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল পার্কের গেটের সামনে। অমল গাড়ির সামনের সিটে গিয়ে বসল। একজন একজন করে তিনজনে গাড়ির পেছনের সিটে বসল। গাড়ির ড্রাইভারকে রাণা চিনতে পারল। মাঝরাতে উঠে অমল এর সঙ্গেই দেখা করেছিল।

রাণার মধ্যে দ্বিধা তৈরি হতে শুরু করল। এই লোকটা কে? গিয়াসের লোক নয়তো? অমলকে কেন উস্তাদ মারতে বলেছিল? গিয়াসের লোক যদি এই দুজন লোককে ধরে ফেলে তাহলে সমস্যা তৈরি হতে

পারে। অমলকে অবিশ্বাস করার মতো এখনও কিছু হয়নি কিন্তু হঠাৎ এই ড্রাইভারকে দেখার পর থেকে তার অস্বস্তি হচ্ছে।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। অমল মাথা ঘুরিয়ে বলল, ‘ও জামাল। সাদিকের সঙ্গে প্রথম দেখা করতে ওই আমাকে সাহায্য করেছিল। সাদিকের বাড়ির উপর নজর রাখার জন্য ওই লোক রেখেছে।’

খান আর মাথুর একসঙ্গে জামালকে সালাম জানালেন। জামাল প্রত্যুত্তরে সালাম জানিয়ে বলল, ‘সাদিক খানিকটা দিশেহারা হয়ে গেছে যা বুঝতে পারছি। সকাল থেকে অনেকবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। শেষবার বেরোনর পর ফেরেনি। আপনাকে বাড়িতে ডেকেছে মানে বাড়িতে ফিরছে।’

অমল বলল, ‘হ্যাঁ। তাই হবে। ও বাইরে বেরিয়ে আমাকে ফোন করেছে, তার মানে দাঁড়ায় ও গিয়াসের সঙ্গে মিট করেছে। সাকিনা যদি আমার কভার এক্সপোজ করে দেয়, আর গিয়াস যদি সেটা সাদিককে বলে থাকে, তাহলে আমার আজ শেষ দিন হওয়া উচিত।’

কথাটা বলে অমল হেসে ফেলল।

রাণা অবাক হল। অমলের ভয় একবারেই নেই। কেমন স্বাভাবিকভাবে কথাটা বলছে।

খান বললেন, ‘এরকম সিচুয়েশনে আমরা এরকম মিট আপ অ্যাভয়েড করতে বলি...’

খানের কথা শেষ করতে দিল না অমল, ‘একবারেই না। এই চান্স আমরা কিছুতেই নিতে পারি না।’

মাথুর বিষণ্ণ গলায় বললেন, ‘হোয়াট আ সিচুয়েশন।’

ওয়াকিটকি বেজে উঠল জামালের। ও-প্রান্ত থেকে জড়ানো গলায় কী বলল তার কিছুই শোনা গেল না, তবে জামাল বলল, ‘সাদিক বাড়িতে ঢুকেছে।’

রাণা অমলের দিকে তাকাল। অমল কেমন ভাবলেশহীন হয়ে বসে আছে।

ওর মাথায় অন্য কিছু ঘুরছে না তো? সে সন্দেহ করতে না চাইলেও মনে সন্দেহ আসছে।

৫৭

কলকাতা অফিস। সন্ধে সাড়ে ছ’টা।

বৃষ্টি হচ্ছে। জানলার বাইরে কিছুক্ষণ বৃষ্টি দেখে তুষার তার ডায়েরিটা টেনে নিলেন।

পেন দিয়ে লিখলেন,

‘শেখাওয়াত।’ ‘স্লিপার সেল বাংলাদেশ...কেন?’ ‘কন্ট্রাক্ট কিলার ইন এজেন্সি- কেন?’

ভ্রু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে ফোন বের করে পীযূষকে ফোন করলেন। পীযূষ ফোন ধরতেই বললেন, ‘তেরো-চোদ্দ বছর আগে এজেন্ট ট্রেনিং চিফ কে ছিল একবার চেক করে বল তো। আমি জানি কে ছিল, আরেকবার ক্রস চেক করতে হবে।’

পীযূষ বললেন, ‘দু’মিনিট স্যার।’

তুষার বললেন, ‘হ্যাঁ। ধরে আছি।’

পীযূষ দু’মিনিট নিলেন না। এক মিনিটের মাথায় বললেন, ‘শেখাওয়াত ছিলেন স্যার।’

তুষার বললেন, ‘ওই সময় ওর আণ্ডারে অমল ছিল?’

পীযূষ ত্রিশ সেকেন্ড সময় নিলেন এবার, দেখে বললেন, ‘হ্যাঁ স্যার ছিল।’

তুষার বললেন, ‘ওকে। রাখো এখন।’

ফোন কেটে তুষার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে আরেকটা নাম্বার ডায়াল করলেন। রিং হতেই ও-প্রান্ত থেকে একজন বয়স্ক মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ‘তুষার। আমি কি ঠিক দেখছি? এত দিন পরে

বুড়ো মানুষটার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হল তোমার?'

তুষার হাসলেন, 'কেমন আছেন স্যার? অবসর জীবন কেমন কাটছে? আই এস আই এখন আর জ্বালাতন করছে না তো?'

সিং বললেন, 'নাহ্। ওরা এখন তোমার মাথার চুল শেষ করবে। আমার না। আমার তো ওদের চুপ করে থাকাটাই ভয় লাগে বরাবর। যখনই দেখি কিছু হচ্ছে না, ভয় লাগতে থাকে যে আবার কোনও প্ল্যান করছে নাকি। কমপ্লিট ডিসগ্রেস টু হিউম্যানিটি যদি কিছু হয়ে থাকে, তা হল এই দেশটা। বাদ দাও। এসব কথা বললেই আমার প্রেশার বেড়ে যায়। নিজের প্রেশার অকারণ বাড়িয়ে লাভ নেই। কেন ফোন করেছিলে বলো।'

তুষার বললেন, 'স্যার তেরো-চোদ্দ বছর আগের একটা ব্যাপারের জন্য ফোন করেছি। আমি তখন ইরানে ছিলাম বলে এখনও আমার ঘটনাটা অত স্পষ্ট করে মনে নেই। আপনার শেখাওয়াতকে মনে আছে?'

সিং বললেন, 'অনিল শেখাওয়াত?'

তুষার বললেন, 'হ্যাঁ স্যার।'

সিং বললেন, 'কেন মনে থাকবে না? এক্সট্রিমিস্ট তো বরাবরই। ওর ধারণা গোটা পৃথিবীটা ওকে ঘিরেই ঘুরছে। আজব টাইপের ছেলে। আমাকে বলত স্যার আমরা কতগুলো শিক্ষিত মেয়েকে সেক্স ওয়ার্কার বানিয়ে পাকিস্তানে ছেড়ে দিতে পারি। বেস্ট রেজাল্ট আসবে। আমি ওকে অনেকবার বুঝিয়েছিলাম, এসব আমাদের ওয়ার্ক এথিকসের বিরুদ্ধে। কিন্তু মনে হয়নি সে কথাগুলো ও কোনভাবে কানে নিয়েছিল বলে।'

তুষার বললেন, 'নেয়নি। এবং শেখাওয়াত একটা উইঙ এর চার্জেও আছে এখন।'

সিং বিস্মিত গলায় বললেন, 'সে কী? আজে বাজে কিছু করে বসে আছে নাকি?'

তুষার বললেন, 'সেসবই বুঝতে চেষ্টা করে যাচ্ছি স্যার। আপাতত আমি যেটা জানতে চাইছি, সেটা হল শেখাওয়াত থাকাকালীন আমরা অমল বলে একজন বাঙালি ছেলেকে পাকিস্তানে ইনফিল্ট্রেট করেছিলাম। সে ছেলেটাকে এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। আমাদের বলা হয়েছিল অমলকে ইউজ করা যাবে না। অমলের ফাইলের অ্যাক্সেস অবধি আমাদের দেওয়া হতো না একটা সময়ে। অমলকে পাকিস্তান থেকে যে সরানো হয়েছিল, তার কারণটা কী ছিল?'

সিং বললেন, 'অমল? নামটা চেনা লাগছে। এক বছর পাকিস্তানে ছিল?'

তুষার বললেন, 'হ্যাঁ স্যার।'

সিং ইতস্তত করে বললেন, 'খুব ইম্পরট্যান্ট ম্যাটার কী? বলাটা স্কিপ করা যাবে না?'

তুষার বললেন, 'বললে ভালো হয় স্যার। সিচুয়েশন ডিমান্ডটাই এমন এখন।'

সিং বললেন, 'ওকে। তাহলে বলছি। করাচীতে শেখাওয়াত অমলের হ্যান্ডলার ছিল। কিছু হয়ে থাকবে ওদের দুজনের মধ্যে। শেখাওয়াত রিপোর্ট করেছিল, অমল কথা শুনছে না, নিজের মতো করে চলাফেরা করছে। আমি ওর রেকমেন্ডেশনেই অমলকে বাংলাদেশে স্লিপার সেল থাকার নাম করে ট্রান্সফার করে দিই। ঠিক কী কী কারণ দেখিয়েছিল সেটা জানতে চেও না, সেটা বলব না।'

তুষার বললেন, 'ঠিক আছে স্যার, এটুকু জানলেই হবে। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। গুড নাইট।'

ফোন কেটে তুষার ভ্রু কুঁচকে বসে রইলেন। হিসেবগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে...।

'সাকিনাকে যেভাবে এখানে কাজে লাগানো হল, তুমি সাপোর্ট করেছিলে?' খান অমলকে জিগ্যেস করলেন। খান অমলকে শুরুর দিকে আপনি বললেও পরে তুমি করে বলছেন।

খানের আচমকা প্রশ্ন শুনে অমল ঘাবড়াল না। বরং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'আমি কোডের চাকর। আমি তো এখানে একরকম রেস্ট করছিলাম। কোনও কিছুতেই জড়িত ছিলাম না। হঠাৎ করে আমাকে উস্তাদ যোগাযোগ করলেন। সাকিনার ব্যাপারে জানালেন। ওর সলিড কভার বানাতে হল। আমি প্রশ্ন করিনি। তবে এখন সময় পাল্টাচ্ছে। এক একটা এজেন্সি এক একরকম ভাবে তার অ্যাসেটদের কাজে লাগাচ্ছে। অবাক হলেও একবারে যে আকাশ থেকে পড়েছি, তা নয়। আই এস আই বেশ কয়েকটা হানি ট্র্যাপ ইউজ করেছে আমাদের লোকেদের উপর। সেটাও মাথায় ছিল।'

খান ঘাড় নাড়লেন, 'ঠিকই। আমাদের উপায় থাকে না।'

জামালের গাড়ি এসে দাঁড়াল সাদিকের বাড়ির সামনে। অমল জোরে শ্বাস ছেড়ে বলল, 'ঠিক আছে। জামাল, তুমি ওদের নিরাপদে রাখবে। আমি যাচ্ছি।'

রাণা মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'আমি যাব। আমি গাড়িতে বসে থাকব না।'

অমল বিরক্ত হল, 'জেদ করছ কেন? তুমি তো বুঝতে পারছ কতটা ঝুঁকি আছে?'

মাথুর অবাক হয়ে বললেন, 'সেটাই তো। রাণার কী হল আবার?'

রাণা বলল, 'আমার অস্বস্তি হচ্ছে। আমি এভাবে বসে থাকতে পারব না।'

অমল বলল, 'থাকতে হবে। জেদ কোরো না।'

রাণা অমলের দিকে তাকাল। সে একবার ভাবছে খান আর মাথুরকে বলে দেবে সবটা। পরক্ষণে তার মনে হচ্ছে হতে পারে অমল সত্যিই কিছু জানে না। কিন্তু দুরকম ভাবনার একটাই ফলাফল আসছে। সে গাড়িতে বসে থাকতে পারবে না।

রাণা বলল, 'নিয়ে চলুন। আপনাকে কিছু করতে গেলে একটা বাধা তো দেওয়া যাবে। এমনি এমনি উড়িয়ে দেবে নাকি?'

অমল বলল, 'ওদের সবার হাতে অটোমেটিক গান থাকে। তুমি গিয়ে কী বাধা দেবে বলো তো?'

রাণা বলল 'না, আমি যাব। আপনাকে একা ছাড়ব না।'

অমল শ্বাস ছেড়ে বলল, 'কী বাচ্চা ছেলের মতো শুরু করলে তুমি রাণা? ঠিক আছে। কী আর বলি? চল।'

অমল রাণাকে নিয়েই গাড়ি থেকে নামল। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে সাদিকের বাড়ির দিকে রওনা হল। তাদের ছদ্মবেশ আগেই মুছে দিয়েছিল অমল। নিরাপত্তারক্ষীরা দুজনের কাউকেই আটকাল না।

সরাসরি ড্রইং রুমে প্রবেশ করল দুজনে। অমলকে দেখে সাদিক শ্বাস ছাড়ল, 'রুমানভাই, আপনি ছিলেন না, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছিল।'

অমল বলল, 'কেন? কী হয়েছে?'

সাদিক বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে। আর কী বলি বলুন? আমার মাথা কাজ করছে না। সাকিনাকে তুলে নিয়ে গেছে, তারপর থেকে যা চলতাছে, আমি আপনাকে যে কী বলি।'

অমল অবাক হবার ভান করল, 'সাকিনাকেও তুলে নিয়ে গেছে? কে তুলেছে? পুলিশ? ওকে আসগরের ব্যাপারে সন্দেহ করছে নাকি?'

সাদিক জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'না না। কী যে কন! তাহলে তো এত ঝামেলাই থাকত না। পুলিশ না। অন্য ব্যাপার।'

অমল বলল, 'কী ব্যাপার?'

সাদিক স্তিমিতচোখে অমলের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করল, ‘কীভাবে বলি আপনাকে। বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।’

অমল বলল, ‘বলুন না।’

সাদিক বলল, ‘আপনার তো বর্ডারে চেনা জানা আছে। জরিনারে কোনভাবে ইন্ডিয়া পাঠানো যায়?’

অমল চোখ ছোট করল, ‘জরিনাকে? জরিনার কী হয়েছে?’

সাদিক অস্বস্তিতে কাশতে শুরু করল, ‘কিছু লোকের ওর উপরে নজর পড়েছে।’

অমল বলল, ‘এটা তো আপনিই মিটিয়ে নিতে পারেন। আপনি আছেন, ওকে কেন ইন্ডিয়ায় পাঠাতে হবে? যাদের নজর পড়েছে তাদের চোখ গেলে দিন!’

সাদিক মাথা নাড়ল, ‘কী যে বলেন ভাই, যাদের নজর পড়েছে, তাদের চোখ কেন, তাদের দিকে তাকানোর ক্ষমতাও আমার নেই। আমাকে আর জিগাবেন না, আমি বলতে পারুম না। গৌতমভাই, আপনি জরিনাকে পার করাইতে পারবেন?’

সাদিক রাণার দিকে তাকাল। রাণা বলল, ‘আমাকে ওপারে খুঁজছে। আমি কী করে...?’

সাদিক বলল, ‘তাও ঠিক। রুমানভাই, আপনি দেখেন তবে।’

অমল বলল, ‘দেখছি। আর সাকিনার কী হবে?’

সাদিক অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল, ‘আমি কোনও আশাই দেখতাছি না।’

অমল বলল, ‘এখানে কি তারা জড়িত যাদের দিকে তাকানো যাবে না?’

সাদিক বলল, ‘জি ভাই।’

অমল বলল, ‘কোথায় আছে এখন?’

সাদিক বলল, ‘বুঝতে পারছি না ভাই। বেশি কিছু বলা যাবে না।’

অমল সাদিকের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইল। সাদিক মিথ্যে বলছে বলে মনে হচ্ছে না তার।

৫৯

আরিফ রহমান কিছুক্ষণ পর এসে ইন্টারোগেশন চেম্বারে প্রবেশ করলেন আবার। নির্মল আলমগিরের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। আলমগির থমথমে মুখে নির্মলের দিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিলেন।

আরিফ বসে বললেন, ‘বলো। তোমার ইন্ডিয়ান ট্রানজাকশানের ব্যাপারগুলো বলো। আমি শুনি।’

নির্মল বলল, ‘আমার কোনও ইন্ডিয়ান ট্রানজাকশান নেই।’

আরিফ বললেন, ‘তুমি শিওর?’

নির্মল বলল, ‘হ্যাঁ, শিওর।’

আরিফ পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে নির্মলের দিকে এগিয়ে দিলেন, ‘এখানে তোমার ফরেন ট্রানজাকশান দেখা গেছে। ইন্ডিয়ান রুপি কনভার্ট করেছ।’

নির্মল বলল, ‘হ্যাঁ। কত রুপি বলুন।’

আরিফ বললেন, ‘দশ হাজার রুপি।’

নির্মল হেসে ফেলল, ‘দশ হাজার রুপি মানে বাংলাদেশী টাকায় কত? ও দেশে গেছিলাম, এ টাকাটা বেঁচে গেছিল, নিয়ে এসে কনভার্ট করেছি আবার। এ টাকার জন্য আমার কী হতে পারে?’

আরিফ বললেন, ‘তোমার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে?’

নির্মল বিরক্ত গলায় বলল, 'এটা বাজে প্রশ্ন হচ্ছে আরিফ সাহেব। আপনার পারসোনালিটির সঙ্গে যাচ্ছে না একবারেই। নিজেও বুঝতে পারছেন।'

আরিফ থতমত খেলেন খানিকটা। নির্মল বলল, 'সাদিক শেখের অ্যাকাউন্টে লাস্ট মান্থে দেড় লাখ দিনার ঢুকেছে। চেনেন আপনি সাদিক শেখকে? তাকে কোনদিন আমার জায়গায় বসানোর সাহস হবে আপনাদের?'

আরিফ আরও একটু হকচকিয়ে গেলেন। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছেন।

সোবাহান চেম্বারে প্রবেশ করলেন। হাসি মুখে নির্মলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অসভ্যতা করছ তুমি। কোরো না। ফল ভালো হবে না।'

নির্মল বলল, 'আমাকে আটকে রাখা হয়েছে কেন স্যার? আমার দোষ কী?'

সোবাহান চেয়ার নিয়ে বসলেন, 'ওই যে, ইন্ডিয়া যোগ। তোমার সঙ্গে ইন্ডিয়ার লিংক আছে। তুমি র-এর কথা শুনে কাজ করছ।'

নির্মল হেসে ফেলল, 'কী অদ্ভুত ব্যাপার বলুন তো স্যার। আমি নিজেই জানি না আমি র-এর হয়ে কাজ করি, অথচ আপনি জানেন।'

সোবাহান কয়েক সেকেন্ড চুপ করে নির্মলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমাকে আমি সুযোগ দিয়েছিলাম নির্মল। তুমি সেটা নিতে পারলে না। তোমার একগুঁয়ে স্বভাব তোমার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আই অ্যাম সরি। ভেরি সরি।'

নির্মল ম্লান হাসল, 'আমি তো অঙ্কের উত্তরটা জানতাম। ঘাবড়াইনি, যেটা করতে চান, করতে পারেন।'

সোবাহান বললেন, 'ট্যাক্স থেকে সাদিকের ফাইল কে দিয়েছে তোমায়?'

নির্মল বলল, 'কেউ দেয়নি।'

সোবাহান বললেন, 'তোমার ফ্যামিলি এই মুহূর্তে বাইরে আছে নির্মল। আশা করব এমন কিছু কাজ করবে না যাতে তোমার সঙ্গে তোমার ফ্যামিলিরও ক্ষতি হয়।'

নির্মল সোবাহানের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি আপনাকে বললাম তো, সাদিকের যাবতীয় তথ্য আমি নিজেই বের করেছি।'

সোবাহান আরিফের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'দেখলেন আরিফ সাহেব, ছেলেটা কেমন তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের দেশের ছেলেদের এত সাহস থাকত? র-এর থেকে ট্রেনিংটা পেয়েছিল বলেই না এদের এত সাহস হয়ে গেছে?'

আরিফ সোবাহানকে বললেন, 'সাদিক শেখটা কে?'

সোবাহান বললেন, 'একজন তরুণ তুর্কী। খুব ভালো ব্যবসা করছে। দেশের উন্নতি করার চেষ্টা করছে। সে তো এই সব ভারতের দালালদের সহ্য হবে না। তার ফলে যা হবার তা হচ্ছে। দে হ্যাভ টু ফেস দ্য মিউজিক, তাই না?'

আরিফ বললেন, 'নির্মল বার বার বলছে ও একটা ইনভেস্টিগেশন করছিল, আপনি সেটা আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সেটা কি এই সাদিক শেখকে নিয়েই?'

সোবাহান আরিফের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন, 'আহ্ সাহেব, আপনি বুঝতে পারছেন না, সব র-এর শেখানো বুলি তো। এ দেশটাকে তো র কিনে নিয়েছে।'

আলমগির দরজা ঠেলে চেম্বারে প্রবেশ করলেন, 'স্যার, একটা ব্রেকিং নিউজ আসছে।'

সোবাহান বিরক্ত মুখে বললেন, 'কী নিউজ?'

আলমগির ফোন এগিয়ে দিলেন, 'এক অনলাইন চ্যানেলে খবর বেরিয়েছে বাংলাদেশের এক ব্যবসায়ীর অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকার বিদেশি ট্রানজাকশান হয়েছে, এই ফরেন ফান্ডের অনেকটাই এমন একটা

সন্দেহজনক ফান্ড থেকে আসে যা সন্দেহ করা হচ্ছে বাংলাদেশে টেরর ফান্ডের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। বেনামি সূত্রে এই ট্রানজাকশানের রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে তাদের দফতরে।'

সোবাহান খবরটা দেখে থমথমে মুখে নির্মলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা করে তুমি ভালো করলে কি?'

নির্মল হাসল, 'আমি করিনি। কিন্তু যে করেছে, ঠিক করেছে।'

সোবাহান বললেন, 'কে করেছে? আশা করি তোমার উপর আমায় থার্ড ডিগ্রি অ্যাপ্লাই করতে হবে না।'

আরিফ উশখুশ করছিলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি ভুলে গেছিলাম। আমার একটা ফ্যামিলি মিট আছে। আমাকে বেরোতে হবে।'

সোবাহান রাগে লাফিয়ে উঠলেন, 'বসুন আপনি। এখানে বসবেন। একদম কোথাও যাবেন না।'

আরিফ সোবাহানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানে? আপনি আমাকে বাধা দিচ্ছেন নাকি?'

সোবাহান বললেন, 'হ্যাঁ দিচ্ছি। আমার সে ক্ষমতা আছে। জানেন তো আমার কী ক্ষমতা আছে?'

আরিফ আঙুল তুলে বললেন, 'সোবাহান সাহেব, আমি অনেক দিন ধরে এই কাজ করি। আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল এই কাজটা আপনি নির্মলকে ফ্রেম করার জন্য করছেন। আপনার এই ঘৃণ্য প্ল্যানে আমি থাকব না। আমি বেরোলাম।'

সোবাহান চিৎকার করলেন, 'আলমগির, আরিফ সাহেবকে আটকাও।'

আলমগির চেম্বারে প্রবেশ করে সোবাহানের কপালে রিভলভার তাক করে বললেন, 'বসুন। অনেকক্ষণ ধরে আপনার বাড়াবাড়ি সহ্য করছি। বসুন।'

সোবাহান চমকে আলমগিরের দিকে তাকালেন।

৬০

আকাশে মেঘ করে আছে। গরম বাড়ছে। সাদিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাণা মাঝে মাঝেই পিছন ফিরে দেখছিল। তার বার বার মনে হচ্ছিল, কেউ তাদের ফলো করছে। অস্বস্তি হচ্ছে কেমন। অমল বলল, 'ভয় পাচ্ছ?'

রাণা বলল, 'সাকিনাকে কোথায় রেখেছে বলল না তো! পাচার করে দিয়েছে?'

অমল বলল, 'সাদিককে বলেনি। জরিনার জন্য সাদিক চিন্তিত হয়ে পড়ছে কারণ জরিনা সাদিকেরই মেয়ে। ওরই কোনও নারীসঙ্গের ফলশ্রুতি ওই মেয়েটা। যতই যাই হোক, মেয়েটা ওর রক্ত। তাকে গিয়াস তুলে নিয়ে যেতে চাইছে বুঝতে পেরেই সাদিক খানিকটা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। আমাদের এই ছোট ফাঁক দিয়ে ঢুকতে হবে। ঢুকতে পারলে ভালো। না পারলে আমাদের কপাল খারাপ। আর কী বলব? চলো, গাড়িতে ফেরা যাক। সাদিকের লোক কাছে পিঠে নেই। থাকলে জামাল এতক্ষণে জানিয়ে দিত।'

রাণা আর কিছু বলল না।

গাড়িতে ফিরে অমল বলল, 'সুখবর হল সাকিনাকে ওরা ভাঙতে পারেনি। আমাদের কভার এক্সপোজ হয়নি।'

খান বললেন, 'স্ট্রং গার্ল। ভেরি কমেন্ডেবল। আর্মি ট্রেনিং নিয়েছে?'

অমল হাসল, 'শুনেছি হাজব্যান্ড ট্রেনিং। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সেই মেয়েটা স্ট্রং হয়ে গেছে।'

খান বিস্মিত হয়ে অমলের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, 'বোঝো। আর দুঃসংবাদ?'

অমল বলল, 'সাকিনা কোথায়, সাদিক লুকিয়ে যাচ্ছে।'

মাথুর বললেন, ‘তাহলে সাদিককে তুলতে হবে। আর কোনও উপায় নেই।’
রাণা অবাক হল। এই দুর্গ থেকে সাদিককে তোলা হবে কী করে?
অমল অবাক হল না। বলল, ‘ওরা যদি বুঝে যায় আমরা সাদিককে তুলেছি তাহলে বিপদ হতে পারে।’
মাথুর বললেন, ‘রিস্ক নিতে হবে। কিছু করার নেই।’
রাণা আর থাকতে পারল না। বলল, ‘সাদিককে তুলব কী করে? এখানে এত লোক নিয়ে আছে। সেটা সম্ভব নাকি?’
অমল হাসল, ‘দেখছি। জামাল! আমাদের আর কোনও অপশন নেই। কী করে ব্যাপারটা কমপ্লিট করা যায়?’
জামাল বলল, ‘আটটা ছেলে আছে এখন সাদিকের কাছে। এতগুলোকে মেরে বের করে আনা যায়। ব্যাপারটায় রক্ত পড়বে। অন্যান্য ঝামেলাও আছে।’
খান বললেন, ‘বেরোয় কতজনে?’
অমল বলল, ‘কখনো কখনো শুধু ড্রাইভার নিয়েও বেরোয়।’
জামাল বলল, ‘অপেক্ষা করতে হবে সেক্ষেত্রে।’
খান অমলের দিকে তাকালেন, ‘ফোন করো। কিছু একটা করে ওকে বের করো।’
অমল বলল, ‘ঠিক আছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। তারপর ফোন করছি।’
মাথুর ঘড়ি দেখলেন, ‘ঠিক আছে। তাই হোক। সাদিককে চাই।’
অমল বলল, ‘জামাল আরিচা হাইওয়ের দিকে এগিয়ে চলো।’
জামাল গাড়ি স্টার্ট দিল।
রাণা বলল, ‘সাদিক যদি লোকগুলোকে নিয়ে আসে।’
অমল ঠান্ডা গলায় বলল, ‘তুমি আছ তো। জামালের অটোমেটিক মেশিনগান আছে। একটাকেও বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই।’
মাথুর খুশি হয়ে খানের দিকে তাকালেন, ‘এই তো, খাঁটি কথা বলে দিয়েছে। এবার ঠিক আছে।’
খান বললেন, ‘ঠিক। এবার অল আউটেই যেতে হবে। আর সময় নেই।’
রাণা ঘাড় নাড়ল, ‘আমি তৈরি।’
জামাল অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল। মাথুর বললেন, ‘আমরা এখানে জড়াচ্ছি, তুষার স্যারকে একবার বলার দরকার আছে?’
খান বললেন, ‘না। এই মুহূর্তে কিছু বললে বারণ করে দেবেন। সাদিক ছাড়া আর কোনও অপশন নেই। তাই থাক আপাতত।’
মাথুর ঘড়ি দেখলেন, ‘অমল, ফোন করো।’
অমল বলল, ‘শহর ছেড়ে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছই। আমি কী বলব সেটাও ভাবতে হবে।’
খান বললেন, ‘বলে দাও তুমি জানতে পেরেছ কে ওর ভাইকে মেরেছিল। সাদিক চলে আসবে।’
অমল বলল, ‘খারাপ আইডিয়া না। এটাই ঠিক লাগছে। সাদিক তারেককে খুব ভালোবাসত। ও কিছুতেই তারেকের চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছে না। যাই হোক, এতক্ষণে একটু শ্বাস নেওয়ার সময় পেলাম। আপনাদের আরেকটা খবর জানিয়ে রাখি।’
খান আর মাথুর দুজনেই উৎসুক চোখে অমলের দিকে তাকালেন।
অমল বলল, ‘এই যে এত বাইরে বাইরে পাঠানো হচ্ছিল আমাকে বা রাণাকে একবার পাঠানো হয়েছিল। সে কোডগুলো সব ফেলে ডিকোডের চেষ্টা করেছিলাম। উত্তর দাঁড়াচ্ছে, ওরা খুব বড় কিছু প্ল্যান করছে। মিডল ইস্ট স্টাইলে ড্রোন অ্যাটাক। বায়োলজিক্যাল ওয়্যারের চেষ্টা হয়েছিল। পাকিস্তান ওতে আগ্রহী নয়।

ওরা ডিরেক্ট অ্যাকশনে বিশ্বাসী। ড্রোন পার্টস বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে আলাদা আলাদা করে সাদিকের কারখানার স্টোরে আসছে। ওরা প্রচুর ফান্ডিং পাচ্ছে। এর অর্থ হল অদূর ভবিষ্যতে ওরা ড্রোন অ্যাটাকের প্ল্যান করছে।'

খান আর মাথুর দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'মাই গড। লোকেশন?'

অমল বলল, 'বাংলাদেশের পাঁচটা জায়গার কো-অরডিনেটস আর ভারতের সাতটা শহরের কো-অরডিনেটস আছে। নর্থ ইস্টের টানাপোড়েনে আই এস আই-এর ইন্ধনও আছে। সাদিকের সমস্ত ব্যবসার আসল জায়গা ওর স্টোরগুলো।'

খান বললেন, 'একইসঙ্গে এখানে আইএসআই সম্পূর্ণ আলাদাভাবে সক্রিয়। তাই তো?'

অমল বলল, 'হ্যাঁ। যার সঙ্গে সাকিনার মাধ্যমে আমরা যোগাযোগ করতাম, তার কভার এক্সপোজ হয়ে গেছিল। তাকে মরতে হয়েছে। ওর কভার এক্সপোজ হওয়া সম্ভব ছিল না। এর অর্থ হয় আমাদের মধ্যেই কেউ ওদের খবর দিয়েছিল।'

খান বললেন, 'কে কে জানে ওই এজেন্টের কথা?'

অমল বলল, 'আমি আর উস্তাদ ছাড়া কেউ জানত না।'

খান বললেন, 'আই এস আই এত এফিশিয়েন্ট হয়ে গেছে যে আমাদের ভেতরের কারো ইনপুট ছাড়া এত বড় অপারেশন করে নেবে, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। যাই হোক, এগুলো নিয়ে পরে ভাবা যাবে। তুমি সাদিককে ফোন করবে এখন? এখানে তো চারদিকে আর কাউকে দেখছি না। এ জায়গাটাও শুনশান।

অমল ঘাড় নেড়ে পকেট থেকে ফোন বের করল, 'রাইট। লেটস স্টার্ট দ্য অপারেশন।'

৬১

সোবাহান অবিশ্বাসী চোখে আলমগিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার এত বড় সাহস? তুমি জানো আমি তোমার কী করতে পারি?'

আলমগির বললেন, 'কিচ্ছু করতে পারেন না। আরিফ সাহেব নিজে দেখেছেন আপনি নির্মলকে ফ্রেম করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন ক্রমাগত। আপনি কী চান, সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। জাহির সাহেবের সঙ্গে মিলে আপনি যেটা করতে চাইছেন, সেটা আমরা করতে দেব না। বুঝেছেন? আপনার ফোন দিন।'

সোবাহান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আলমগির সোবাহানের মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে বললেন, 'একদম সময় নেই আপনার হাতে। আমি এখানেই যা করার করে দেব। যা বলছি করুন। ফোন দিন।'

সোবাহান কাঁপা কাঁপা হাতে তার পকেট থেকে দুটো ফোন বের করে আলমগিরের হাতে দিলেন। আলমগির সোবাহানের ফোন দুটো নিয়ে পকেটে রেখে বললেন, 'আপনাকে রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে। এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে অর্ডার এসে গেছে। আপনি এখানেই বসবেন।'

সোবাহান অবিশ্বাসী চোখে আলমগিরের দিকে তাকালেন। আলমগির বললেন, 'কী ভাবেন? তলে তলে কাজ করে যাবেন, কেউ কিছু বুঝতে পারবে না? আমরা এখানে ঘাস খাবার জন্য আছি? আনোয়ার সাহেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং তাকে হত্যার দায়ে আপনাকে রিমান্ডে নেওয়া হল। আপনি আপনার উত্তর তৈরি করুন। এস নির্মল, আসুন আরিফ সাহেব।'

সোবাহান দরদর করে ঘামছিলেন।

আলমগির আরিফ এবং নির্মলকে নিয়ে ইন্টারোগেশন চেম্বার থেকে বেরিয়ে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন। আরিফ নির্মলের হাত ধরে বললেন, 'বিশ্বাস করো, আমি জানতাম না এত জঘন্যভাবে তোমাকে

ফ্রেম করার প্ল্যান চলছিল। পরে বুঝেছি।'

নির্মল বলল, 'ঠিক আছে সাহেব। আপনি যে সোবাহান সাহেবের কথায় প্রভাবিত হননি, তার জন্যই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

আলমগির বললেন, 'আমি তো বুঝতে পারছিলাম আরিফ সাহেবের মনে দ্বিধা কাজ করছে। অনলাইনে খবর পাঠানোর কাজটা অবশ্য আমিই করেছি। আমার মনে হয়েছিল খবরটা বেরোনো দরকার। পি এম আমাকে এখানে সিক্রেট মিশনে রেখেছিলেন। সোবাহানের ব্যাপারটা তিনি জানতেন। সাদিকের ব্যাপারটা নির্মল না থাকলে জানা সম্ভব ছিল না। পি এম স্পেশাল অর্ডার পাঠিয়েছেন সাদিকের ব্যাপারটা যেন নির্মল নিজে দেখে। এই মুহূর্তে কী করা উচিত বলে তোমার মনে হয় নির্মল?'

নির্মল অবিশ্বাসী চোখে আলমগিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি সত্যি বলছেন? পি এম অর্ডার করেছেন?'

আলমগির বললেন, 'হ্যাঁ। জাহিরের ব্যাপারে উনি সন্দেহ করেছিলেন। সোবাহান যে এত বেড়ে গেছে, তিনি ধারণা করতে পারেননি। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কী হয়েছিল তুমি কি ভুলে গেলে? কাছের লোকেরাই তো সব থেকে বড় শত্রু হয়। সবখানেই নজর রাখা প্রয়োজন। যাক গে, যা হয়, ভালোর জন্যই হয়। তুমি গেম প্ল্যান বল।'

নির্মল বলল, 'এই মুহূর্তে সাদিককে রিমান্ডে নিতে হবে। আমি ওকে জেরা করতে চাই। প্রয়োজনে সোবাহান সাহেবের পাশে বসিয়ে দুজনকে একসঙ্গে জেরা করতে হবে।'

আলমগির বললেন, 'ডান। তুমি যাবে সাদিককে তুলতে?'

নির্মল বলল, 'হ্যাঁ। আমাকে বাহিনি দিন।'

আলমগির বলল, 'দু'কোম্পানি বাহিনি নিয়ে যাও। প্রয়োজনে বাড়ি ঘিরে রেখে কলার ধরে ওকে তুলে নিয়ে আসবে। মিডিয়ায় খবর চলে গেছে। সাদিক আজকের মধ্যেই এক্সপোজ হয়ে যাবে।'

নির্মল বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

আলমগির বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ আমাকে না, তোমাকে আমার দেওয়া উচিত। তুমি ক্রমাগত সাদিকের পেছনে না লেগে থাকলে, জাহিরের কাছে না গেলে এদের নেক্সাসটা কিছুতেই ধরা পড়ত না। সোবাহান আর জাহির বড় কিছু প্ল্যান করছিল, সেটা আমরা বুঝতে পারছিলাম। কে জানে, সাদিকের কাজেও হয়তো এ দেশের বিরুদ্ধেই বড় কিছু প্ল্যান আছে।'

নির্মল বলল, 'আছে স্যার। এত টাকার ট্রানজাকশান অকারণে হতে পারে না। এ ছাড়া আমি মাদ্রাসার প্রধানকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই স্যার। আমার মনে হচ্ছে এই কুড়ি জন ছাত্রকে ইচ্ছে করে অদৃশ্য করা হয়েছে। এই বাচ্চারা তো কিছুই জানে না, এদের যদি তুলে নিয়ে গিয়ে মগজধোলাই করে কোনও অর্গানাইজেশনে জুড়ে দেওয়া হয়, সেটা আমাদের দেশের জন্য একবারেই ঠিক হবে না।'

আলমগির মাথা নাড়লেন, 'রাইট। ওকেও তোলার ব্যবস্থা করা হোক।' নির্মলের সঙ্গে যাওয়ার জন্য বাহিনি এসে উপস্থিত হল। নির্মল তার অফিস থেকে মাথা উঁচু করে বেরোল। এবার সাদিককে ধরার পালা।

৬২

বড় রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে।

কেউ গাড়ি থেকে নামেনি। সবাই গাড়ির ভেতর চুপ করে বসে আছে।

জামালের ওয়াকিটকিতে সংকেতের মাধ্যমে কেউ কিছু বলল। জামাল সেটা শুনে বলল, 'সাদিক বেরিয়েছে। গাড়িতে ড্রাইভার বাদে তিন জন আছে।'

রাণা বলল, 'ঠিক আছে।'

অমলের ফোন বেজে উঠল। অমল ফোন কানে দিল। ও-প্রান্ত থেকে কেউ একজন কিছু বলল। অমল সঙ্গে সঙ্গে ফোন রেখে মোবাইলের ব্রাউজার খুলে বিরক্ত গলায় বলল, 'উফ্! এবার কী হবে?'

মাথুর বাদাম খাচ্ছিলেন। অমলের বিরক্তি দেখে বললেন, 'কী হল?'

অমল বলল, 'সাদিক এক্সপোজড। নিউজ এজেন্সিগুলোতে সব বেনামে সাদিকের ফরেন ট্রানজাকশানের ডকুমেন্টস পাঠিয়ে দিয়েছে।'

খান বললেন, 'সে তো ভালো কথা।'

অমল বলল, 'সাকিনাকে পাওয়ার জন্য ভালো কথা না স্যার। বুঝতে পারছেন না, সাকিনাকে পেতে গেলে আমাকে সাদিককে লাগবে। ওর কোনওরকম সমস্যা, আমাদের সমস্যা বাড়িয়ে দেবে।'

খান ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'তাহলে?'

অমল বলল, 'আমি সাদিককে ফোন করে অবস্থা বোঝার চেষ্টা করি? যদি এখানে না এসে চলে যায়? এখানেই ফার্স্ট আসুক, আমি বরং সেটা কনভিন্স করাই?'

খান ভেবে নিয়ে বললেন, 'করো।'

অমল সাদিককে ফোন করল। সাদিক ফোন ধরে নার্ভাস গলায় বলল, 'রুমানভাই, খবর পেয়েছেন?'

অমল বলল, 'মাথা ঠান্ডা রাখুন। আমার কাছে চলে আসুন। আমি দেখছি কী করা যায়।'

সাদিক বলল, 'আপনি কী করবেন জনাব? আমার তো আর বাসায় ফেরা হবে না বুঝতে পারতাছি। দু'কোম্পানি ব্যাবও নাকি আসতাছে। আপনার ভাবিরে আমি কী বুঝামু?'

অমল বলল, 'ব্যাবে আপনার আত্মীয় আছে না?'

সাদিক বিরক্ত গলায় বলল, 'আর বইলেন না, তার আমি ফোনই পাই না। কিছুতেই ফোন ধরে না, এত বড় অফিসার।'

অমল বলল, 'আপনি ফোন অফ করে চলে আসুন। দেখছি।'

সাদিক বলল, 'আইতাছি জনাব। আমি ফোন অফ কইরা দিলাম। চইলাই আইতাছি।'

অমল বলল, 'আসুন। গাড়ির নাম্বার বলছি, ঢাকা ভ ৩৪৫৩। রাস্তার বাঁ-দিকে দাঁড়িয়ে আছি। তাড়াতাড়ি আসুন।...'

অমল বলল, 'এসে গেছে প্রায়। আপনারা দুজন কি গাড়িতে থাকবেন?'

খান আর মাথুর পরস্পরের দিকে তাকালেন।

মাথুর খানকে বললেন, 'এবার তুষার স্যারকে জিগ্যেস করি?'

খান গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন, 'করো।'

মাথুর তুষারকে ফোন করলেন। একবার রিং হতেই তুষার ফোন তুললেন, 'বলো মাথুর।'

মাথুর বললেন, 'স্যার, সাদিককে হাইওয়েতে ডাকা হয়েছে। এখানেই পাকড়াও করে থার্ড ডিগ্রি দেওয়ার প্ল্যান করছি।'

তুষার বললেন, 'সর্বনাশ! অমল কোথায়?'

মাথুর বললেন, 'আমার কাছেই আছে।'

তুষার বললেন, 'অমল এই বুদ্ধি অ্যাপ্রুভ করছে?'

অমল বলল, 'কিছু করার নেই স্যার, সাদিককে ইন্টারোগেট না করলে সাকিনাকে আর পাওয়া যাবে না। এছাড়াও একটু আগে সাদিক এক্সপোজড হয়ে গেছে। গিয়াস সাদিকের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক বন্ধ করে

দেবে। আমাদের হাতে এক ঘণ্টারও কম সময় আছে আমি যা বুঝতে পারছি।'

তুষার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, 'গো অ্যাহেড। আমি দেখছি কী করা যায়। কেউ মরে যেও না, তাহলেই হবে। অ্যাম আই ক্লিয়ার?'

খান হাসলেন, 'টু হান্ড্রেড পারসেন্ট।'

সাদিকের গাড়ি দেখা যাচ্ছে। অমল গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়াল। জামাল খান, মাথুর এবং রাণা, তিনজনের হাতেই প্রয়োজনীয় অস্ত্র দিয়ে দিয়েছিল।

সাদিকের গাড়ি দাঁড়ান মাত্র কাচ নামিয়ে সাদিকের গাড়ির সামনে বসে থাকা আসলাম অমলকে বলল, 'গাড়িতে আসেন।'

রাণা সময় দিল না মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে আসলামের দু'চোখের মাঝখানে গুলি চালাল, আসলাম আর নড়ার সময়ও পেল না। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিতে গেছিল, রাণা তাকেও গুলি করল। শব্দহীন গুলি। আশে পাশে কেউ কোনও শব্দও পেল না। সাদিকের সঙ্গে আরেকজন ছিল। গাড়ি থেকে নামার আগেই তাকেও রাণা মেরে দরজা খুলে সাদিককে বলল, 'নামুন।'

সাদিক ফ্যাকাসে মুখে অমলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গৌতমভাই, রুমানভাই, এসব কী?'

অমল বলল, 'আমাদের গাড়িতে আসুন। আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। আসুন। ব্যাব আসছে আপনাকে তুলতে। তার আগে চলুন।'

সাদিক বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের গাড়িতে উঠল। মাথুর তখনও বাদাম খেয়ে যাচ্ছিলেন। সাদিক গাড়িতে উঠতেই মাথুর বললেন, 'বাদাম খাবেন?'

সাদিকের বিস্ময়ভাব কাটেনি তখনও। অমলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাই এগুলো কী হচ্ছে?'

গাড়ি চলতে শুরু করে দিয়েছে। অমল বলল, 'কিছু হয়নি। আমি আপনারই লোক সাদিকভাই। আমাকে বলুন গিয়াস এখানে এসে কোথায় উঠেছে।'

সাদিক হতভম্ব গলায় বলল, 'আপনি আসলামকে মেরে দিলেন? ড্রাইভারকে মারলেন? হারুনকে মারলেন কেন?'

রাণা সাদিকের কপালে রিভলভার ঠেকিয়ে বলল, 'আসগরকেও মেরেছি। এবার গিয়াস কোথায় আছে বল, নইলে তোর কী হতে পারে তুই নিজেও জানিস না।'

সাদিক সিঁটিয়ে গেল।

অমল বলল, 'আহ রাণা। তুমি সাদিকসাহেবকে ভয় দেখাছ কেন? সাহেব কি বলেছে বলবে না? বলেন সাহেব, দেরি করবেন না।'

সাদিক বলল, 'আপনাকে তো আমি বলেছি রুমানভাই, সাকিনাকে গিয়াস কোথায় রেখেছে আমি বুঝতে পারছি না। আমি জানি গিয়াস কোথায় ছিল। এখন কোথায় আছে তা জানি না।'

অমল বলল, 'যেখানে ছিল সেখানেই চলুন আগে। তারপর দেখা যাবে।'

সাদিক বলল, 'গুলশানে আমার হোটেলে ছিল।'

রাণা সাদিকের মাথায় রিভলভারটা আবার ঠেকিয়ে বলল, 'কোনওরকম নাটক করবি না।'

সাদিক বলল, 'এমন করেন কেন গৌতমভাই, আপনারে কোনওদিন পর ভাবসি?'

রাণা বলল, 'তোকে এত প্রশ্নের উত্তর দেব না। তুই যদি মিথ্যে বলিস, তাহলে তোর কী হবে, তুই নিজেও জানিস না।'

সাদিক বলল, 'গুলশানে চলেন। দেরি কইরেন না। আমি তো এমনিই শেষ ভাই। আমার নামে নিউজ বাইরায় গেছে।'

অমল বলল, 'দেখব আমি। দরকার হলে আপনাকে ইন্ডিয়া নিয়ে যাব। ও নিয়ে চিন্তা নাই।'

সাদিক চমকে গিয়ে বলল, 'ইন্ডিয়া?'

খান খুক খুক করে কেশে বললেন, 'আমরা ছাড়া আর আছেই বা কে?'

৬৩

জিপে উঠেই মোখলেসকে ফোন করল নির্মল। মোখলেসের ফোন পুরোটা রিং হয়ে কেটে গেল। বিরক্ত হল সে। এখন প্রতিটা মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেরি হওয়া মানেই অন্য কোথাও সমস্যা তৈরি হওয়া। গাড়িটা কিছুটা পথ যাবার পর সে দেখল দীপা ফোন করছে। নির্মল লজ্জা পেল। ছাড়া পাবার পর তার দীপাকে ফোন করার কথা মনে হয়নি! ছি-ছি।

সে সঙ্গে সঙ্গে ধরল, 'বলো।'

দীপা কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'কোথায় তুমি? আমি ঢাকায় রওনা দিয়েছি।'

নির্মল বলল, 'না না। রওনা দেওয়ার দরকার নেই। তখন একটা সিচুয়েশন হয়েছিল। ঠিক হয়ে গেছে। চিন্তা কোরো না।'

দীপা বলল, 'তুমি ঠিক বলছ তো?'

নির্মল দেখল, মোখলেস ফোন করছে। সে বলল, 'হ্যাঁ। নিশ্চিন্তে ঘোর। আমি একটা রেইডে যাচ্ছি। রাখছি, পরে কথা বলছি।'

দীপাকে কিছু বলতে না দিয়েই ফোন কেটে দিল নির্মল। মোখলেসের ফোন ওয়েটিঙে ছিল। ধরে বলল, 'বল বল। পাখি ঘরে আছে?'

মোখলেস বলল, 'আমি বেরোয়ছিলাম তো স্যার। এখনও বাইরে আছি।'

নির্মল বিরক্ত হয়ে বলল, 'কোথায় বেরিয়েছিলে?'

মোখলেস বলল, 'আমি ভাবলাম কেস ক্লোস হয়ে গেছে। আমি আগের ডেরায় ফিরে গেছিলাম।'

নির্মল বলল, 'এখনই এস। আমি যাচ্ছি।'

মোখলেস বলল, 'জি স্যার।'

নির্মল ফোন কেটে ড্রাইভারকে বলল, 'তাড়াতাড়ি চল।'

ড্রাইভার চেষ্টা করছে, কিন্তু বিশেষ লাভ হল না। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি জ্যামে পড়ে গেল। নির্মল হতাশ হয়ে ড্যাশবোর্ডে ঘুষি মারল।

ড্রাইভার বলল, 'হাইওয়ের দিকে রাস্তা ফাঁকা আছে স্যার। এদিকেই জ্যাম আজ।'

নির্মল বলল, 'আমি হাইওয়ের দিকে গিয়ে কী করব? আমার ওদিকে কোনও কাজ নেই।'

বাহিনীর কয়েকজন গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা করে নিল। সাদিকের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই নির্মল জিপ থেকে নেমে গেটে বলল, 'দরজা খোল। ব্যাব।'

গেট খুলল। নির্মল সাদিকের বাড়ির কলিং বেল টিপল। সাদিকের এক শাগরেদ বেরিয়ে এল। নির্মল বলল, 'সাদিক শেখ কোথায়?'

শাগরেদ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'সাহেব বেরিয়ে গেলেন। আধঘণ্টা হয়েও গেছে গিয়া।'

নির্মল ভ্রু কুঁচকে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিথ্যে বলছিস?'

ছেলেটা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'না স্যার। আপনি ক্যামেরা দেখেন। স্যার সত্যিই বাইরইয়া গেসে।'

নির্মল বুঝল ছেলেটা মিথ্যে বলছে না। তবু বাহিনীর ছেলেদের ঘর তল্লাশি করতে বলে দিল। মিনিট দশেকের মধ্যে সবাই জানিয়ে দিল সত্যিই বাড়িতে সাদিক নেই। নির্মল বিরক্ত মুখে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে

এল। সাদিকের না থাকার লক্ষণ একবারেই ভালো না। এ ধরনের প্রভাবশালী অপরাধীদের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, ধরামাত্র এদের সবরকম যোগাযোগের উপায় বন্ধ করে দিতে হয়। ফোন একটা মারাত্মক যন্ত্র। এটার সাহায্যে এরা যেকোনও জায়গা থেকে সাহায্য পেয়ে যেতে পারে। পোর্টালে খবর বেরনোর পর থেকে কি সাদিক পালিয়ে গেল? সেক্ষেত্রে সাদিককে কী করে পাওয়া যাবে?

নির্মল ফোন বের করল। ট্যাক্সের নথি থেকে সাদিকের সম্পত্তিগুলোর তালিকা পাওয়া গেছে। সেগুলোতে হানা দেওয়া যেতে পারে। সাদিকের বাড়িতে থাকা শাগরেদগুলোকে আটক করে ভ্যানে তোলার নির্দেশ দিয়ে জিপে উঠে ড্রাইভারকে বলল, 'আলোছায়া টেক্সটাইল মিল চল।'

ড্রাইভার অবাক হয়ে বলল, 'ওখানে গিয়ে কী করবেন স্যার? ওখানে তো কাপড় তৈরি করে।'

নির্মল বলল, 'চল। যা বলছি কর।' ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল।

মোখলেস ফোন করছে। নির্মল ফোন ধরে বলল, 'কী হল? কোথায় আছ?'

মোখলেস বলল, 'আমি এসে গেছি স্যার। এই দাঁড়ায় আছি। আপনার গাড়ি বেরোয় গেল, দেখলাম তো।'

নির্মল বলল, 'সাদিকের ব্যাপারে কী জানা গেল?'

মোখলেস বলল, 'এখানের দোকানি বলল কিছুক্ষণ আগে গাড়ি বাইর হইছে। সাদিক ওতে করেই গেছে।'

নির্মল বলল, 'এই জন্য তোমার এখানে থাকার কথা ছিল। তুমি থাকলে ও কোথায় গেছে সেটা জানা যেত।'

মোখলেস বলল, 'হোটেল যায় তো দু'দিন ধরে। মাঝে মাঝেই হোটেল যায়।'

নির্মল বলল, 'কোন হোটেল?'

মোখলেস বলল, 'গুলশানের হোটেল।'

নির্মল বলল, 'ওখানে যেতে পারে?'

মোখলেস বলল, 'যাইতেই পারে। আমি জানি না স্যার।'

নির্মল শ্বাস ছাড়ল, 'তুমি কিছুই জানো না। রাখো।'

ফোন কেটে ড্রাইভারকে বলল, 'গুলশান চলো তো।'

৬৪

ট্রাক চলছে বন্দরের দিকে।

ট্রাকের ভিতরে বাচ্চাগুলো গাদাগাদি করে বসে আছে। কেউ ভীত চোখে তাকিয়ে আছে। দু'চারজন কান্নাকাটি করছে।

লতিফ চৌধুরী বসে বসে ঢুলছিল। বলল, 'কান্নাকাটি করার কী আছে? তোমরা আমাগো ভবিষ্যৎ।'

একটা বাচ্চা বলল, 'বাসায় যাব।'

লতিফ চৌধুরী বলল, 'বাসায় যাবা? কেন? বাসায় কী আছে?'

বাচ্চাটা বলল, 'আব্বা আম্মা আছে।'

লতিফ বলল, 'কিছুই শেখ নাই। তোমরা জানো না, আমাগো আব্বাহুজুর একজনই? জানো? তোমাগো যাতে কষ্ট না হয়, তার জন্য আমি নিজে যাইতাসি তোমাগো লগে। তোমরা আমার কষ্ট দেখতে পাও না?'

বাচ্চাটা চুপ করে গেল। লতিফ বলল, 'কও তো পোলারা, তোমরা কোন দেশের নাগরিক?'

সবাই একযোগে বলল, 'বাংলাদেশ।'

লতিফ দাড়ি নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না-না, হয় নাই। আমাগো দেশের নাম পাকিস্তান। কও জোরে। কী আমাগো দেশের নাম?'

কেউ কেউ পাকিস্তান বলল। বেশিরভাগ বাচ্চা চুপ করে রইল।

লতিফ রেগে গেল, 'কিছু শেখায় না এরা। শুধু টাকা লইয়া যায়। কামের কাম কিছু হয় না। আমাগো দ্যাশের নাম পাকিস্তান। ঠিক কইছি?'

এখনও অনেকে চুপ করে রইল। লতিফ এবার চিৎকার করল, 'ঠিক কইছি কি না? যার মনে হবে ভুল কইছি, সে জাহান্নামে যাবে। বুঝছ?'

একটা বাচ্চা ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করল, 'আমরা এখন কোই যাইতাছি হুজুর?'

লতিফ বলল, 'কাম শিখতে যাইতাছি। আমরা কেউ তো কাম শিখি নাই। শিখছি? শুধু তর্ক করতে শিখছি। কেউ কিছু জানি না। শিখুম না? শিক্ষামূলক ভ্রমণ মানে কি বোঝো তোমরা?'

বাচ্চাগুলো কেউ কিছু বলল না।

ট্রাক দাঁড়াল। লতিফ ঘাবড়ে গিয়ে ফোন করল ড্রাইভারকে। 'কী হইল? থাইমা গেলা কেন?'

ড্রাইভার বলল, 'জ্যাম লাগছে হুজুর।'

লতিফ বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই জন্য এখানে এত সমেস্যা। রাস্তায় নামলেই শুধু জাম হয়। পাকিস্তান হইয়া গেলে এসব হইবো না। আমাগো লক্ষ্য পাকিস্তান। দেখি সবাই কও দেখি, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। কও কও। পাকিস্তান...' বাচ্চাগুলো কেউ কেউ বলল, 'জিন্দাবাদ।' একসঙ্গে বলল না।

লতিফ রেগে গিয়ে বলল, 'শিখাতে হবে। সব কয়টারে শিখাইতে হবে। অনেক কাম।'

ট্রাক আবার চলতে শুরু করল। লতিফ একসময় বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। ঢুলে ঢুলে ঘুমাতে শুরু করল।

ফোন বেজে উঠল আবার তার। সে ধড়মড় করে উঠে বসে ফোন ধরল, 'জি হুজুর।'

'আপনারা প্রায় পৌঁছে গেছেন?'

'জি হুজুর।'

'আপনাদের আনলোড করে দেওয়া হবে। বাকিটা আমরা রিসিভ করে নেব। চিন্তার কোনও ব্যাপার নেই।'

'জানি তো হুজুর। চিন্তা আমি করি না। আমি এই ছেলেগুলারে আপনাদের হাতে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হব।'

'গুড জব চৌধুরী। তুমি পুরস্কৃত হবে। তোমার জন্য আমরা গর্বিত।'

'কী যে বলেন জনাব! যতক্ষণ না আর একবার এ দেশ পাকিস্তান হবে, ততক্ষণ আমার জীবনে বেঁচে থাকার কোনও মানে আমি খুঁজে পাব না।'

'ইনশাল্লাহ।'

'ইনশাল্লাহ জনাব।'

ফোন কেটে লতিফ বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমরা কত সৌভাগ্যবান জানো? তোমাগো নির্বাচন করা হইছে তার কাজে। স্বয়ং উপরওয়ালা তোমাগো নির্বাচন করসে। তোমরা এবার লড়াই করা শিখবা।'

কয়েকজন আবার কেঁদে উঠল, 'বাসায় যামু।'

লতিফ বিরক্ত হয়ে হাতের কাছে যে ক'টা বাচ্চাকে পেল, তাদের চড় মারতে শুরু করল।

বাচ্চাগুলো ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করল।

লতিফ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'চুপ। সবাই চুপ। আমরা এসে গেছি। আর চিন্তা নেই। বসে থাকো।'

কেউ কেউ চুপ করল। বেশিরভাগই আতঙ্কে কান্নাকাটি করে যাচ্ছিল। একটা ছেলে হঠাৎ করে লতিফের হাতে কামড়ে দিল। লতিফ চিৎকার করে উঠল, 'ও মাগো, কত সাহস? এই শিখছ তোমরা মাদ্রাসায়?'

লতিফ ঘাবড়ে গেছে দেখে ছেলেটার দেখা দেখি বাকি বাচ্চারাও লতিফকে আক্রমণ করল। কেউ কামড়াল, কেউ লতিফের দাড়ি ধরে টান মারল। একটা ছেলে লতিফের ফোন নিয়ে ট্রাকের দেওয়ালে সজোরে ছুঁড়ে মারল।

কুড়িটা ছেলে একসঙ্গে লতিফকে আক্রমণ করল। লতিফ হাত-পা ছুঁড়েও সামলাতে পারল না। কয়েক মুহূর্তের আচমকা হানায় ছেলেগুলো তার জামাকাপড় ছিঁড়ে বিধ্বস্ত করে দিল।

ট্রাক গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই লতিফ অজ্ঞান হয়ে গেল।

৬৫

'এই দেশগুলোর সমস্যাই হল একনায়কতন্ত্র। কেউ যখন ক্ষমতায় বসে, তখন সে এমনভাবে চলতে শুরু করে, দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বলে আর কিছু থাকে না। সবটাই চেয়ারের প্রতি আনুগত্য। এই দেশগুলোতে কাজ করতে গিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হয়। তার রাজনৈতিক বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকলে আমরা সমস্যায় পড়ে যাব। সন্ত্রাসবাদী দেশগুলো এই দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সুবিধা নিতে চায় সবসময়।'

মিটিং শেষ হয়ে এসেছিল। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কথায় সবাই সায় দিল। মন্ত্রী বললেন, 'ঠিক আছে। আজকের মতো এখানেই আমি মিটিংটা শেষ করছি। তুষার, আপনি প্লিজ থাকবেন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

তুষার হাসলেন, 'আমি কলকাতা থেকে ফিরে আপনার জন্যই বসে আছি স্যার।'

কনফারেন্স রুম ফাঁকা হতে বেশিক্ষণ লাগল না। তুষার মন্ত্রীর কাছেই বসে ছিলেন। ঘর পুরোপুরি ফাঁকা হলে মন্ত্রী বললেন, 'কী আপডেট? পাওয়া গেছে?'

তুষার মাথা নাড়লেন, 'আমরা চেষ্টা করছি। এই ডিফারেন্ট উইং যেভাবে কাজটা করেছিল, সেটাকে তাড়াতাড়ি বুঝে নিয়ে অপারেশনটা চালাতে হচ্ছে, কিছু গ্যাপ তো আছেই।'

মন্ত্রী বললেন, 'শেখাওয়াত কী বলছে? ও আমাদের বুঝিয়েছিল বাংলাদেশে আমাদের অনেক বেশি গভীরতার সঙ্গে কাজ করা উচিত। এমন ইন্টেন্সিটি নিয়ে কাজ করল যে নিজেদের এজেন্টই ধরা পড়ে গেল। কী লজ্জার ব্যাপার বলুন তো?'

তুষার বললেন, 'এই মুহূর্তে আমি কোনও গ্রুপের কথা মাথায় নিচ্ছি না স্যার। শেখাওয়াতের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি।'

মন্ত্রী বললেন, 'ও সহযোগিতা করছে?'

তুষার মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার অনেক কিছু জায়গা ক্লিয়ার না। হয়তো আমাকে বলতে চাইছে না। হয়তো আপনিই আমাদের কাউকে বলতে বারণ করেছেন। ওদের উইংটা তো আপনার অর্ডারেই আমাদের থেকে আলাদা হয়েছিল। শেখাওয়াত এমন কিছু কাজ করেছে, যেটা প্রেসে এলে আমরা সমস্যায় পড়তে পারি।'

মন্ত্রী বললেন, 'তুমি কি আমাকে ইন্ডাইরেক্টলি দোষী বলতে চাইছ?'

তুষার বললেন, 'আমার এজেন্টরা এতদিন ধরে কাজ করছে স্যার। আমরা কখনো এত বাজেট গ্র্যান্ট পাইনি যেটা শেখাওয়াত পেয়েছে। ও ঠিক কী বলে আপনাদের কনভিন্স করেছিল? কোনও অ্যাপ্রুভালের ব্যাপার নেই, যাকে খুশি যখন তখন এজেন্সিতে রিক্রুট করে নিচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে থাকছে, এত ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করার পারমিশন পেল কোত্থেকে? আমরা তো পাই না স্যার। আমাদের হাজার ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বরাবর কাজ করতে হয়েছে। কতবার বাজেটে স্যাংশানও পাইনি। এখানে ঠিক কী হচ্ছে যে এরা এত বাজেট নিয়ে চলে গেছে?'

মন্ত্রী ইতস্তত করে বললেন, 'বেশিদিন তো এটা হয়নি।'

তুষার বললেন, 'হ্যাঁ, এই তো লাস্ট বছর দুয়েক। শেখাওয়াত ওর মতো করে নেটওয়ার্ক বাড়িয়ে গেছে, অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে গেছে, আমাদের সঙ্গে কোনরকম কো-অর্ডিনেশন করেনি, যা ইচ্ছে, তাই করেছে। আমি সেটাই বুঝতে চাইছি। ঠিক কীভাবে এসব হয়েছে?'

মন্ত্রী বললেন, 'ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে আই এস আই এর অ্যাক্টিভিটি বেড়েছে। শেখাওয়াত আমাকে সেটার প্রমাণ দিয়েছিল। ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে চেয়েছিল। তাতে সমস্যা হবার কথা ছিল না।'

তুষার বললেন, 'অনেক বড় সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে স্যার। আমাদের আবার নতুন করে ঘুঁটি সাজাতে হবে। আশা করব, এজেন্ট সুস্থভাবে ফিরবে।'

মন্ত্রী বললেন, 'আর এজেন্ট কম্প্রোমাইজড হয়ে গেলে?'

তুষার বললেন, 'আমাদের সব ড্যামেজের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। প্রাইমারিলি আমরা রিস্ক অ্যানালিসিস করছি।'

মন্ত্রী বললেন, 'কীরকম?'

তুষার বললেন, 'ধরা যাক একজন লোক বর্ডার পেরিয়ে দেশে প্রবেশ করেছে। তার ইন্টেনশন এ দেশের ভিড়ে মিশে যাওয়া। এ ধরনের লোকের থেকে রিস্ক থাকে। আবার থাকেও না। কিন্তু এই লোকই যখন একটা ভিড় বাসে বা ট্রেনে একটা এক্সপ্লোসিভ জ্যাকেট পরে উঠে পড়বে, তখনই আমাদের সমস্যা শুরু হয়। বাংলাদেশের যেসব জায়গায় এসব মগজ ধোলাইয়ের কাজ হয়, আমাদের এজেন্ট তার প্রাইম সাসপেক্টের কাছে ছিল। তার সম্পর্কে প্রচুর তথ্য শেখাওয়াতকে পাঠিয়েছে। ওদের ফিউচার প্ল্যান কী, তা হয়তো আমাদের এজেন্ট জানে, শেখাওয়াত জানে না। সে প্ল্যান না জানলে কী সমস্যা হতে পারে, আমরা সেটাই অ্যানালাইজ করছি স্যার।'

মন্ত্রী ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'ইন্টেলিজেন্স ফেইলিওর থেকে এজেন্ট ধরা পড়ল?'

তুষার বললেন, 'দেখছি সেটাও। আপাতত আপনি শেখাওয়াতকে যদি ইন্সট্রাকশন দিয়ে আমাকে রিপোর্ট করতে বলেন, তাহলে ভালো হয়। আমি ওর সঙ্গে দেখা করলেও ও আমায় সব বলেছে বলে আমার মনে হয় না। প্লিজ এটা আপনি দেখুন। ন্যাশনাল সিকিউরিটির ব্যাপার, এখানে ইগো জিনিসটা যত কম আসে, তত ভালো। তাই না স্যার?'

মন্ত্রী বললেন, 'ঠিক। বলে দিচ্ছি। সরি মিস্টার রঙ্গনাথন। আপনার সঙ্গে আমার আগে কনসাল্ট করা উচিত ছিল।'

তুষার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঠিক আছে স্যার। আগে ক্রাইসিস কাটুক, পরে দেখা যাবে।'

মন্ত্রী চিন্তিতমুখে চুপ করে বসে রইলেন।

৬৬

সাদিক ঢোক গিলছে। ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, বেশ ভয় পাচ্ছে। খান বলল, 'কী প্ল্যান আছে এখন মিয়াঁ? এ দেশটাকে আবার পাকিস্তান করে ফেলবে?'

সাদিক হাসার চেষ্টা করল, 'কী যে বলেন ভাই! আমার অত ক্ষমতা আছে? আমাকে যেভাবে বলা হয়, আমি সেভাবে কাজ করি।'

অমল সাদিকের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। সাদিক সেটা দেখে বলল, 'ঠিক বলিনি রুমানভাই?'

অমল বলল, 'গিয়াস কী করছে এখানে? বলবেন? বলে দিলে ঠিক থাকবেন। না বললে আমি আপনার গ্যারান্টি নিতে পারব না।'

সাদিক ঢোক গিলে বলল, 'আমি কী জানি ভাই? সাকিনার উপর খুব নজর ওর। জরিনার উপরেও। জরিনা তো আমার মাইয়া। ও যদি ওরে চালান কইরা দেয়, তাহলে কী হইত আপনিই বলেন।'

অমল বলল, 'প্রায় সাড়ে ছ'শো মেয়েকে আরবে পাঠিয়েছেন। তারা কারো মেয়ে ছিল না বলুন?'

মাথুর চোখ কপালে তুললেন, 'সাড়ে ছ'শো? শিওর?'

অমল মাথুরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কম হবে না। বেশি হবে। চাইল্ড ট্রাফিকিং দিয়েই শুরু করেছিল।'

সাদিক বলল, 'রুমানভাই, আপনি একজন পাকিস্তানপন্থী পরিবারের ছেলে হয়ে ইন্ডিয়ার হয়ে কাজ করতাসেন?'

খান হেসে ফেললেন। অমলও হাসল, 'আপনি একজন বাংলাদেশী হয়ে পাকিস্তানের হয়ে কাজ করছেন আর আমি করলেই দোষ?'

সাদিক মুখ কালো করে বসে রইল। সাদিকের হোটেলের বেসমেন্টে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল জামাল। বেসমেন্ট ফাঁকা। অমল বলল, 'আপনারা সাদিককে দেখুন। চল রাণা...সরি গৌতমভাই।'

খান বললেন, 'দুজনে কী করে হবে?'

অমল বলল, 'আমার মনে হয়, আমি জানি কোথায় ছিল গিয়াস। অধিক সন্ন্যাসী দরকার নেই।'

রুমাল মুড়িয়ে সাদিকের মুখে ঢুকিয়ে অমল বলল, 'জামাল, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাও। এখানে সাদিককে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ না। অন্য কেউ এলেই একে চিনে ফেলবে। দরকার হলে আমি ডাকব।'

গাড়ি থেকে নেমে গেল অমল। জামাল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অমল বলল, 'চলো রাণা।'

দু'জনে লিফটের সামনে দাঁড়াল।

লিফট খুলতে অমল চার নম্বর টিপে বলল, 'সাদিকের মিটিং রুম। আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার।'

রাণা বলল, 'সিসিটিভি আছে তো?'

অমল বলল, 'ওই ফ্লোরে নেই। নিশ্চিন্ত থাকো।'

রাণা আশ্বস্ত হল।

চার নম্বর ফ্লোরে পৌঁছে লিফটের দরজা খুলে গেল। হোটেলের ইউনিফর্ম পরে একটা ছেলে ছুটে এল, 'কী দরকার?'

অমল ছেলেটার কাঁধে ছোট একটা রদ্দা মারল। ছেলেটা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

করিডোরের দুদিকে ডানদিক বাঁদিকে দরজা। অমল বলল, 'ওহ্‌, মাস্টার কী, এই ছেলেটার পকেটে আছে নাকি দেখো তো!'

রাণা ঝুঁকল। ছেলেটার ডানদিকের পকেটে কিছু নেই। বাঁপকেটে একটা কার্ড খুঁজে পেল। অমলকে দিতে সে প্রথম দরজাটা খুলল।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ঘর। পরিপাটি করে বিছানা করা। অমল বাথরুমের দরজা খুলল। নাহ। কিছু নেই। রাণাকে বলল, 'ওইদিকের দরজাটা দেখো।'

রাণা দরজা খুলল। এই ঘরটাও পরিষ্কার। এভাবে ডানদিক বাঁ দিকে সবক'টা ঘরের দরজা খুলে দেখা শুরু হল। করিডোরের শেষ ঘরে গিয়ে চাবি দেওয়ার দরকার হল না। দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। অমল শিস দিয়ে উঠল।

একটা বিরাট স্যুইট রুম। দুটো ছোট ছোট সোফার মাঝে একটা কাচের টেবিল রাখা। টেবিলের উপরে চাপ চাপ রক্ত। পাশের ঘরে দরজা ঠেলতেই দেখা গেল খাটে কোনও চাদর নেই। চাদর মেঝেতে পড়ে

আছে।

অমল ঘরে রাখা ওয়ার্ডরোব খুলল। ওয়ার্ডরোব ফাঁকা।

রাণা বলল, 'কেউ নেই?'

অমল বলল, 'নাহ্। তুমি বাথরুমটা দেখো তো তাও।'

রাণা বাথরুমে ঢুকল। বিরাট বড় বাথরুম। একদিকে স্নানের জায়গা, সেটা কাচ দিয়ে ঘেরা। রাণা স্নানের জায়গার দরজা ঠেলে ঢুকল। বাথটবে জল উপচে পড়ছে। মেঝেতে রক্ত। সে ঝুঁকে রক্ত দেখতে গিয়ে টের পেল বাথরুমের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

সে সঙ্গে সঙ্গে স্নানের জায়গা থেকে বেরিয়ে দরজা খুলতে গেল।

দরজা খুলল না...।

৬৭

গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে। স্ট্রিট লাইট খারাপ। আলো জ্বলছে না। জামাল দেখেশুনেই গাড়িটা রেখেছে।

সাদিকের মুখের রুমাল খুলে দেওয়া হয়েছে।

সাদিক খান আর মাথুরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা দেখি খুব ভালোই বাংলা বলেন।'

খান সাদিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অবাক হলেন?'

সাদিক বলল, 'অবাক তো আমার হবার কথা জনাব। ইন্ডিয়ান লোকজন আমারে মুরগি কইরা গেল, আমি তো যত ভাবি, তত অবাক হই।'

মাথুর বললেন, 'আমরাও অবাক হই, যখন কোনও শান্তশিষ্ট জায়গায় হঠাৎ করে ব্লাস্টের খবর আসে, আপনারাই সেগুলো করান, তখন আমরা অবাক হই। বুঝলেন?'

সাদিক ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, 'তাহলে আপনাদের অনেক অবাক হওয়া বাকি জনাব। এখনও সেভাবে অবাকই হন নাই।'

মাথুর প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, খান সঙ্গে সঙ্গে মাথুরের হাত চেপে ধরে সাদিককে বললেন, 'চুপ করে বসে থাক। তোর সঙ্গে ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করছি বলে ভাবিস না আমরা ভদ্রলোক। বেশি বক বক করলে তোর কপালে দুঃখ আছে।'

সাদিক খানের দিকে তাকাল, 'আপনি ভুইলা যান নাকি আপনি কোথায় আছেন? এত তাড়াতাড়ি ভুইলা গেলে হইব?'

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। সাদিক চোখ ছোট ছোট করে বলল, 'দুই খানা ইন্ডিয়ান এজেন্ট। আমার তো আর চিন্তাই নাই জনাব।'

খান পকেট থেকে রিভলভার বের করে সাদিকের মাথায় ধরলেন, 'চুপ কর। মাথুর এর মুখে রুমাল দাও। বড্ড কথা বলছে।'

জামাল হঠাৎ গাড়ি স্টার্ট দিল। খান বললেন, 'কী হল?'

জামাল বলল, 'এই গাড়িটা কেন দাঁড়িয়ে গেল বুঝছি না। দাঁড়িয়ে থাকব না, একটু এগিয়ে যাই।'

সাদিক হাসতে শুরু করল। তাদের গাড়ি কিছুটা এগোতেই পেছনের গাড়িটা এগোতে শুরু করল। খান পকেট থেকে রুমাল বের করে সাদিকের মুখে গুঁজে দিলেন। মাথুর দড়ি বের করে বলল, 'যদি এরই গাড়ি হয়, রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। হাত বেঁধে দিই।'

সাদিক ছটফট করছিল। খান সপাটে চড় কষালেন, 'অনেক হয়েছে। এবার আমার মতো করে কাজ হবে।'

মাথুর সাদিকের হাত বেঁধে দিল। খান বললেন, 'জামাল, কী আপডেট? গাড়িটা আসছে?'

জামাল বলল, 'না। দেখছি না।'

খান বললেন, 'আবার দাঁড়িয়ে যাও। ও গাড়ি এলে দেখা যাবে।'

জামাল আবার গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল।

সাদিকের মুখ রুমাল দিয়ে বন্ধ করা সত্ত্বেও হেসে যাচ্ছে। মাথুর জানলার বাইরে দেখে নিয়ে খানকে তামিল ভাষায় বললেন, 'কী ব্যাপার? এ এত কনফিডেন্স পাচ্ছে কোত্থেকে?'

খান বললেন, 'বুঝতে পারছি না। ওরা কোনও আপডেট দিল না। আপাতত আমাদের কিছু করার নেই। একে সামলে রাখতে হবে।'

মাথুর বললেন, 'বেশিক্ষণ সামলে রাখা যাবে না। এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাটা সুইসাইডাল হতে পারে। কোনও ঘরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে পারলে ভালো হতো।'

খান ঘড়ি দেখলেন, 'দশ মিনিট দেখি আর। অমল কোনও আপডেট না দিলে...'

জামাল আবার গাড়ি স্টার্ট দিল। খান বললেন, 'কী হল?'

জামাল বলল, 'ওই গাড়িটা।'

খান বললেন, 'কজন আছে দেখা যাচ্ছে?'

জামাল বলল, 'ভেতর দেখা যাচ্ছে না।'

খান কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে যাও। দেখি কজন আসে।'

মাথুর বললেন, 'ঠিক। দাঁড়িয়ে যাও।'

জামাল দাঁড়াতেই পিছনের গাড়িটাও দাঁড়িয়ে গেল। কেউ এল না। খান বললেন, 'দেখা যাক আসে নাকি।'

জামাল বলল, 'রিস্ক হয়ে যাবে স্যার, সাদিকের অনেক লোক।'

খানের ফোন বেজে উঠল। অমল। খান ধরলেন, 'বলো।'

অমল বলল, 'হোটেলে ব্যাবের রেইড হয়েছে। কী করে খবর পেয়েছে জানি না।'

খান বললেন, 'আমাদের লোক?'

অমল বলল, 'কোনও আপডেট নেই।'

খান বললেন, 'কী করব?'

অমল বলল, 'অপেক্ষা করুন। দেখছি।'

খান বললেন, 'শিওর?'

অমল বলল, 'হ্যাঁ।'

ফোন কেটে দিল অমল।

৬৮

সাদিকের হোটেলের সামনে তাদের গাড়ি দাঁড়াতে ভিড় হয়ে গেল। নির্মল সেদিকে পাত্তা না দিয়ে হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দৌড়ে রিসেপশনে গেল।

রিসেপশনে একজন যুবক বসে আছে। নির্মলকে বাহিনীর সঙ্গে রিসেপশনে ঢুকতে দেখে বলল, 'ইয়েস স্যার?'

নির্মল প্রবল উত্তেজিত হয়ে ছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'সাদিক শেখকে ডাকুন।'

রিসেপশনিস্ট থতমত হয়ে বলল, 'কাকে স্যার?'

নির্মল বলল, 'হোটেলের ওনারকে ডাকুন।'

রিসেপশনিস্ট বলল, 'উনি নেই স্যার।'

নির্মল মাথা নাড়ল, 'ওকে। এটা একটা রেইড। আপনি কাউকে ফোন করবেন না। রজ্জাক, তুমি ওর পাশে বসে থাকো। আমি দেখছি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখি।'

রিসেপশনিস্ট ঘাবড়ে মনিটরের দিকে তাকাল, 'দেখুন স্যার, এখানে কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

স্ক্রিনে করিডোরগুলো দেখা যাচ্ছে। নির্মল দেখল সন্দেহজনক তেমন কিছুই নেই। সে বলল, 'রুম এন্ট্রি দেখি।'

রিসেপশনিস্ট খাতা দেখাল। নির্মল ধমক দিল, 'আইডিগুলো দেখান।'

রিসেপশনিস্ট আইডির ফটোকপিগুলো নির্মলের দিকে এগিয়ে দিল।

মিনিট খানেক রেজিস্টার চেক করে নির্মল বুঝল, এন্ট্রিতে কোথাও সমস্যা নেই। কিন্তু রিসেপশনিস্ট অতিরিক্ত ঘেমে যাচ্ছে। সে তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী নাম আপনার?'

রিসেপশনিস্ট বলল, 'রায়হান।'

নির্মল বলল, 'রায়হান সাহেব, আপনি যদি কিছু জানেন, তাহলে বলতে পারেন। পরে যদি আমি অন্যভাবে জানতে পারি, আপনার কপালে দুঃখ আছে। আমার মনে হচ্ছে আপনার পেটে অনেক কথা জমে আছে। বলার ইচ্ছে থাকলে, বলে ফেলুন। কোনও সমস্যা নেই। আমি সব শুনে নেব।'

রায়হান ঘাম মুছল। নির্মল বলল, 'বলুন কী বলবেন।'

রায়হান বলল, 'আমি নতুন জয়েন করেছি। এক মাস হল।'

নির্মল বলল, 'ওকে। আর?'

রায়হান চারদিকে দেখে বলল, 'ফোর্থ ফ্লোরে কোনও ক্যামেরা নেই স্যার।'

নির্মল রজ্জাকের দিকে তাকাল, 'এখানে থাকো। দেখো এ কোথাও ফোন না করতে পারে। আর রায়হান সাহেব, হোটেলের বাকি স্টাফ কোথায়? কাউকে দেখছি না?'

রায়হান বলল, 'রিসেপশনে কেউ নেই এখন। সার্ভিস স্টাফরা সার্ভিস রুমেই আছে।'

নির্মল বাহিনীর কয়েকজনকে নিয়ে লিফটে উঠে চার টিপল। ফোর্থ ফ্লোরের দরজা খুলতেই দেখতে পেল মেঝেতে একজন পড়ে আছে। নির্মল নিচু হয়ে পরীক্ষা করে বলল, 'বেঁচে আছে। ঘরগুলো চেক কর।'

বাহিনীর জওয়ানরা ঘর চেক করতে শুরু করল। কোনও ঘরে কিছু পাওয়া গেল না। শেষ ঘরটার দরজা বন্ধ। নির্মল বলল, 'রায়হানের কাছে মাস্টার কি আছে। কেউ নিয়ে এসো।'

রাণা বাথরুমে আটকে গেছে। কিছুতেই বেরোতে পারছে না। সে জানলার দিকে তাকাল। জানলায় শক্ত কাচ দেওয়া, খোলা সম্ভব না। অনেক চেষ্টা করেও কিছু করা গেল না। সে কি ইঁদুর কলে আটকে গেল?

রাণার জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। অমল? অমল তাকে আটকে দিল? দরজায় ধাক্কা মারল। খুলল না। তারমানে উস্তাদ ঠিকই বলছিলেন?

ঘাড়ে জলের মতো কিছু একটা পড়ল। রাণা সঙ্গে সঙ্গে সরে উপরের দিকে তাকাল।

বাথরুমের লফট থেকে রক্ত পড়ছে!

রাণা তড়িঘড়ি চারদিকে দেখল। স্নানের জায়গায় একটা টুল আছে। সেটাকেই নিয়ে টুলের উপর উঠে লফটের দরজা খুলে তার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। লফট রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ নগ্ন রুমাকে গুটিসুটি

করে ওখানেই রাখা হয়েছে। রাণা চিৎকার করল, 'একী!'

তখনই বাথরুমের দরজা খুলে গেল। অমল বিরক্ত গলায় বলল, 'তুমি বাথরুমে কী করছ? ব্যাব ঢুকে গেছে। চলো।'

রাণা অবিশ্বাসী চোখে অমলের দিকে তাকাল। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে বলল, 'আমি আটকে পড়ে গেছিলাম। দরজা ধাক্কাচ্ছি, আপনি শুনতে পাননি?'

অমল বলল, 'আমি জানলা দিয়ে ব্যাবের গাড়ি আসতে দেখে ওদের ফোন করতে গিয়ে দেখি টাওয়ার নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোরে যেতে হয়েছিল। এর মধ্যে তুমি বাথরুমে আটকে গেছিলে। এই লকটাই ঠিক নেই যা বুঝছি। লকে কোনও সমস্যা আছে। কিন্তু এখানে রক্ত পড়ছে কী করে?'

রাণা বলল, 'টুলে উঠে দেখুন।'

অমল সঙ্গে সঙ্গে টুলে উঠে রুমাকে দেখে বলল, 'মাই গড। একটা চাদর নিয়ে আসো শিগগিরি। জানোয়ারটা ওকে এখানে রেখে গেছে! আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

রাণা দৌড়ে চাদর নিয়ে এল। সন্তর্পণে রাণা আর অমল মিলে রুমাকে নামিয়ে বিছানায় শোয়াল। অমল নাড়ি দেখে বলল, 'বেড়ালের প্রাণ। এখনও বেঁচে আছে। চলো। হাসপাতালে নিয়ে যাই। সাকিনা। সাকিনা।'

অমল রুমাকে ঠেলল। রুমার চোখ মুখ ফুলে গেছে। চোখ মুখ থেকে রক্ত পড়ছে। অমল বলল, 'ভয়াবহ অবস্থা। ভয়াবহ। গিয়াস মানুষ না, জানোয়ারেরও অধম। চলো। এখানে সময় নষ্ট করা যাবে না।'

রাণা বলল, 'ব্যাব?'

অমল বলল, 'কিছু করার নেই। সারেন্ডার করতে হবে। সাকিনাকে বাঁচানোটা আসল। বাকি পরে দেখা যাবে।'

অমল পকেট থেকে রুমাল বের করল। রাণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'গুলি চলতে পারে। তুমি উত্তর দিতে যেও না। আমি সাদা পতাকা দেখানোর ব্যবস্থা করি।'

রাণা একটু থমকে বলল, 'বাংলাদেশের জেলে পচব?'

অমল বলল, 'কিছু করার নেই। আগে মেয়েটার প্রাণ। পরে বাকি সব।'

অমল সন্তর্পণে দরজা খুলে সাদা রুমাল দেখাল।

নির্মল অমলের হাতে রুমাল দেখা মাত্র বাহিনীর প্রতি চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, দেখি কে আছে ওখানে। বেরিয়ে আসুন।'

অমল বেরিয়ে এসে বলল, 'আগে অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন। পরে বলছি।'

নির্মল চিৎকার করল, 'সেটা আমরা ঠিক করব। আপনি ডিরেক্ট করবেন না। হাঁটু গেড়ে বসুন।'

অমল দ্বিরুক্তি না করে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল...

৬৯

তুষার চুপ করে তার চেম্বারে বসে ছিলেন। খান আর মাথুরকে একবার ফোন করতে গিয়েও করলেন না। সাধারণত কেউ কোনও অপারেশনে গেলে আগে তারা ফোন করে রিপোর্ট না করলে তুষার নিজে থেকে ফোন করেন না।

পীযূষ চেম্বারে নক করলেন। তুষার বললেন, 'এস।'

পীযূষ ঘরে ঢুকে বললেন, 'স্যার, আমি একটা ফাইল পেয়েছি। কনফিডেন্সিয়াল ফাইল। আমাদের অ্যাক্সেস নেই। একমাত্র আপনারই অ্যাক্সেস আছে।'

তুষার বললেন, 'কার বিষয়ে?'

পীযূষ বললেন, 'বালুচিস্তান রিলেটেড। অনিল শেখাওয়াত তখন করাচীতে ছিল।'

তুষার নড়ে চড়ে বসলেন, 'আর অমলও? টাইমলাইন ম্যাচ করেছে?'

পীযূষ মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ স্যার।'

তুষার বললেন, 'কোথায় সে ফাইল?'

পীযূষ বললেন, 'আর্কাইভ রুমে। যাবেন?'

তুষার বললেন, 'চলো চলো।'

ব্যস্ত হয়ে আর্কাইভ রুমে পীযূষের সঙ্গে রওনা দিলেন তুষার। তুষারের আলাদা অ্যাক্সেস রুম আছে। তুষারের বায়োমেট্রিক আইডেন্টিটি ছাড়া সে রুমের দরজা খুলবে না। ঘরে ঢোকার আগে তুষার বললেন, 'ইনডেক্স মিলেছে তো? ফাইল নাম্বার কত?'

পীযূষ বললেন, 'আমি ওইটুকুই মিলিয়েছি। ফাইল নাম্বার সেভেন থ্রি ওয়ান স্যার।'

তুষার বললেন, 'ওকে।'

পীযূষ চলে গেলেন। তুষার ফাইলটা বের করে টেবিলে রাখলেন। গোটা ফাইলটাই বাইনারি কোডে লেখা। শুধু ১ আর ০ ব্যবহার করে। তুষারের এরকম ফাইল পড়ার অভ্যাস আছে। বেশ কিছুক্ষণ ফাইলটা ওলটপালট করে দেখে চুপ করে চেয়ারে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ফোনটা বের করে অনিল শেখাওয়াতকে ফোন করলেন।

শেখাওয়াত প্রথমে ফোন ধরলেন না। তুষার আবার ফোন করলেন।

এবার ধরলেন, 'বলো।'

তুষার বললেন, 'বাজে কথা বলব না। সরাসরি কাজের কথাতেই আসি। তুমি অমলকে এজেন্সি থেকে বের করে দেওয়ার সুপারিশ করেছিলে। সেই এজেন্টকে দিল্লি তোমার সুপারিশ না মেনে বাংলাদেশ স্লিপিং এজেন্ট হিসেবে পাঠিয়েছিল। তোমার রিপোর্ট অনুযায়ী অমল সিনিয়রের কথা শোনেনি, বালোচ নেতাদের সঙ্গে একা একা গিয়ে দেখা করে এসেছিল, প্রোটোকল ফলো করেনি। ইনসাবোরডিনেশনের মতো গুরুতর বিষয়ে তুমি অভিযোগ করেছিলে। সে ছেলেকে কেন তুমি বাংলাদেশে সবার আগে অ্যাক্টিভেট করলে?'

শেখাওয়াত কয়েকসেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার মনে হয়েছিল ওকে দিয়ে কাজ হবে।'

তুষার বললেন, 'হয়েছে?'

শেখাওয়াত বললেন, 'হ্যাঁ, ও ঠিক করেই কাজ করছিল।'

তুষার বললেন, 'ঠিক কী কারণে ওর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেছিলে তুমি করাচীর সময়ে?'

শেখাওয়াত বললেন, 'সেসব তো বলেছিলাম রিপোর্টেই। আমার কথা শুনত না।'

তুষার বললেন, 'আমি যদি বলি ব্যাপারটা সেটা না। অমল তখন নতুন ছিল, অতিরিক্ত উত্তেজনার বশে বালোচ নেতাদের একটা অ্যাটাকের প্ল্যান তোমাকে বাইপাস করে ও দিল্লিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তুমি চেয়েছিলে পাকিস্তান আর্মির উপরে বালোচ অ্যাটাক হোক। কিন্তু অমল বুঝেছিল ওই অ্যাটাকটা হলে আমাদের সঙ্গে বালোচ নেতাদের সমঝোতা প্রকাশ্যে চলে আসবে। ও সেই খবরটাই দিল্লিতে জানিয়ে ব্যাপারটা থেকে তোমাকে নিরস্ত করেছিল। এই ঘটনার পর থেকেই তুমি অমলের উপরে রেগে গেছিলে।'

শেখাওয়াত বললেন, 'তুমি কী করতে? তুমি একটা ডিসিশন নিয়েছ, তোমার সাবরডিনেট সেটা তোমাকে বাইপাস করে উপরে জানিয়ে দিলে ভালো লাগত তোমার?'

তুষার হাসলেন, 'এখানে ভালো লাগালাগির কিছু নেই তো। তুমি এ ঘটনার পর অমলকে পাকিস্তান থেকে তাড়িয়েছিলে। নেহাত দিল্লির কাছে অমলের ভালো ইম্প্রেশন ছিল বলে ওকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তুমি অমলের উপর সেই তখন থেকেই রেগে ছিলে। এতদিন পরে এমন কিছু ম্যাজিক হয়নি

যাতে তোমার রাগ কমে। সেটা কমার কোনও কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। তুমি এই রাণা ছেলেটাকে পাঠিয়েছ অমলকে সরাতে। তাই না?'

শেখাওয়াত চিৎকার করতে শুরু করলেন, 'হাউ ডেয়ার ইউ! তোমার এত সাহস তুমি এত সিরিয়াস একটা ব্যাপারে আমাকে অ্যাকিউজ করে দিলে? প্রমাণ দেখাতে পারবে?'

তুষার বললেন, 'প্রমাণ তো পরে। আপাতত আমাদের ফিল্ড এজেন্টদের কিছু হলে তোমার কপালে অশেষ দুঃখ আছে। তুমি যে ভাবেই তোমার কাজের জন্য গ্র্যান্ট নিয়ে থাকো, আমি কিন্তু ঠিক বের করব তুমি কেন রাণাকে পাঠিয়েছ। এবং খুব সম্ভবত কাজটা হবার পর তোমার রাণাকেও সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। তোমার যদি এখনও কিছু বলার থাকে, বলতে পারো। এরপরে কিন্তু আমি বুঝব, এখানে অ্যাকিউজিশনের কোনও ব্যাপার নেই। যদি কিছু থাকে, বলে ফেলো।'

ফোন কেটে দিলেন শেখাওয়াত। তুষার শান্তমুখে আর্কাইভ রুমে বসে রইলেন।

মিনিটপাঁচেক পরে মেসেজ এল। তুষার দেখলেন শেখাওয়াত লিখে পাঠিয়েছেন, 'আই ক্যানট কনট্যাক্ট রাণা নাও। টেল দেম টু স্টপ হিম।'

তুষার মেসেজটা দেখে হাসলেন। অঙ্কের উত্তর মেলার পর যে হাসি পায়, এ হাসিটা তেমনই...।

৭০

কত দূর থেকে কে যেন ডাকছে তাকে। সে শুনতে পাচ্ছে না কিছু। এই যন্ত্রণাটা নতুন নয়। আগে হয়েছে। কিন্তু এ যন্ত্রণার তীব্রতা বেশি। সে কি বেঁচে আছে? মরার ভয় তো সেই কবেই চলে গেছিল, যখন দিব্যেন্দু তাকে দরজা বন্ধ করে বাথরুমে রেখে যেত। সে ভয় তার আর নেই।

এখন সে আর ভয় পাচ্ছে না। প্রাণপণে চোখ খুলতে চাইছে। দেখতে হবে চারদিকে। দেখাটা বড় দরকার। যারা তাকে এখানে পাঠিয়েছিল তারা কোথায়? তাদেরকেও দেখতে ইচ্ছে করছে। প্রতিটা মানুষকে দেখার দরকার এখন।

রুমা শুয়ে আছে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে।

ডাক্তার খোন্দকার ভালো করে দেখে বললেন, 'মারাত্মক অত্যাচার হয়েছে! বলে বোঝানো সম্ভব না কী হয়েছে। অবজারভেশন দরকার। আমরা নজর রাখছি।'

নির্মল বলল, 'ওকে। জ্ঞান ফিরলে আমি কি একটা ফোন এক্সপেক্ট করতে পারি?'

খোন্দকার বললেন, 'সারটেনলি।'

নির্মল আইসিউ-এর বাইরে গেল। দীপা ফোন করছে। বেশ কয়েকবার করেছে সে ধরতে পারেনি। তার শরীরেও সাকিনার রক্ত লেগে গেছে।

ফোনটা রিং হচ্ছে। নির্মল ধরল, 'বলো।'

'ঠিক আছ তুমি?' দীপার গলায় স্পষ্ট উদ্বেগ।

নির্মল বলল, 'হ্যাঁ। ঠিক আছি। পরে কথা বলছি।'

দীপা বলল, 'ঠিক আছে। ফোন দিও।'

নির্মল বলল, 'দেব।'

ফোন কেটে সে চুপ করে বসল। সাদিককে পাওয়া গেল না। সাদিক কোথায় এখন? পালিয়েছে? অমলকে আর রাণাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে হাসপাতালের একটা ছোট ঘরে। নির্মল কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে সে ঘরে ঢুকল। অমল তাকে দেখেই বলে উঠল, 'সাকিনা কেমন আছে নির্মলবাবু?'

নির্মল অমলের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমার নাম জানলেন কী করে?'

অমল বলল, 'আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি। আনোয়ার আলিকে যে খুন করা হয়েছে আমার কাছে তার প্রমাণ আছে। সাদিকের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে সাকিনার জীবনটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা হয়তো আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না।'

নির্মলের ভ্রু কুঁচকাল, 'কে আপনি? আন্ডারকভার? পরিচয় দিন।'

অমল বলল, 'সাকিনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিন স্যার। ও একটু কিছু বলতে পারলেও আমাদের লাভ। বিশ্বাস করুন, ওতে বাংলাদেশেরও লাভ।'

নির্মল কড়া গলায় বলল, 'আগে পরিচয় দিন। সাদিক কোথায়?'

অমল বলল, 'সাদিককে পেয়ে যাবেন। সাদিকের ঘুঁটিগুলিও আমি আপনাকে দিয়ে দেব, কী করে ও এ দেশে পাকিস্তানি প্রভাব আনার চেষ্টা করছে এবং সেটা কাকে কাকে দিয়ে। আশা করি, আপনি জানেন বঙ্গবন্ধুকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তার চেনা লোকেরাই কিন্তু করেছিল। যদি এখন আবার সেরকমই একটা প্ল্যান ওরা করে থাকে? কিন্তু এগুলোও এখন গুরুত্বপূর্ণ না। সাকিনাকে আই এস আই তুলে নিয়ে গেছিল। ওরা সন্দেহ করেছিল সাদিকের এই বাধা রাখা মেয়েটার কোনও বড় পরিচয় আছে।'

নির্মল বলল, 'কোনও পরিচয় আছে?'

অমল নির্মলের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, 'সাদিকের সম্পর্কে সব জানতে পারবেন আপনি, সাদিকের সমস্ত মুখোশগুলো আপনার কাছে চলে আসবে। বাকি পরিচয় আপনার কি আদৌ জানার দরকার আছে?'

নির্মল শ্বাস ছাড়ল। সাদিকের বাধা মেয়েটা সব জানবে? মাথা কাজ করছে না তার। সে অনেক ক্যাজুয়াল্টি দেখেছে, কিন্তু এই মেয়েটাকে ওরা যেভাবে মেরেছে, তা অবিশ্বাস্য রকমের নিষ্ঠুর। চোখে দেখা যায় না। ছেলেটার বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কিত কথাটার তথ্যপ্রমাণ তো সে নিজেই পেয়েছে। সে জানত জাহির ম্যাডামের কাছের লোক। কিন্তু জাহির আসলে সোবাহানের সঙ্গেই হাত মিলিয়ে ছিল। জিগশ পাজলের অন্য একটা দিক প্রকাশ পাচ্ছে না? ভুল কিছু বলছে বলে মনে হচ্ছে না। বিশ্বাস করে দেখা ছাড়া তার হাতে অন্য কোনও অপশন আছে কি? কিছুক্ষণ আগে তাকেই ওরা সরিয়ে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। চক্র যে আছে, তা নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই আর। সে সম্পর্কে এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে।

তার ফোন বাজছে। ডাক্তার খোন্দকার সাহেব ফোন করছেন। নির্মল সঙ্গে সঙ্গে ধরল, 'বলুন।'

ডাক্তার বললেন, 'মেয়েটা কিছু একটা বলছে। আসবেন?'

নির্মল উঠে পড়ল, 'আসছি।'

নির্মল ফোন রাখতেই অমল বলল, 'জ্ঞান ফিরেছে।'

নির্মল অমল আর রাণার দিকে দ্বিধাগ্রস্থ মুখে তাকিয়ে বলল, 'আসতে চাইলে আসুন?'

রুমা বিড় বিড় করে কিছু বলে যাচ্ছে। নির্মল ঘরে প্রবেশ করতেই ডাক্তার বললেন, 'দেখুন তো কী বলছে।'

অমল দৌড়ে রুমার মুখের কাছে গিয়ে কান পাতল। রুমা বিড় বিড় করে যাচ্ছে, 'কন্টেনার ফোর টু ওয়ান থ্রি, চিটাগং পোর্ট, লতিফ, লতিফ, ফোর টু ওয়ান থ্রি, মাদ্রাসা, লতিফ...।'

শব্দগুলো বলতে বলতেই রুমা চুপ করে গেল। অমল ডাক্তারের দিকে তাকাল, 'কী হল?'

ডাক্তার খোন্দকার নার্সদের ডাকতে শুরু করলেন।

'রাণাকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল অমলকে মারতে। শেখাওয়াত পুরোনো রাগের বদলা নিতে পাঠিয়েছিল। আরেকটা এজেন্ট কাছেই থাকবে যে রাণাকেও সরাতে চাইবে। কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড।'

তুষার মেসেজ করেছেন। খান মেসেজটা মাথুরকে পড়ালেন। মাথুর ভ্রু কুঁচকে চুপ করে বসে থেকে বললেন, 'গাড়িটা?'

খান বললেন, 'ওয়েল, এখন বুঝতে পারছি। সাদিককে ক্লোরোফর্ম দাও তো জামাল...।'

মাথুর অবাক হলেন, 'কী বুঝতে পারলে?' মাথুর কিছু বুঝে ওঠার আগেই দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামলেন। গাড়িটা দশ হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। খান সরাসরি গাড়িটার দরজা খুলে বললেন, 'কী চাই?'

ড্রাইভার সিটে ইমতিয়াজ বসে আছে। খানকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, 'আপনাদের জন্যই ফলো করছিলাম। আপনাদের নিরাপত্তার দিকটাও তো দেখতে হবে, তাই না?'

খান বললেন, 'নামো। ভিড়ের মধ্যে বেশি নাটক আমার পছন্দ না। তুমি নামো।'

ইমতিয়াজ ঘাবড়ে গিয়ে নামল গাড়ি থেকে। খান বললেন, 'এখানে কী চলছে? ফলো করছ কেন? যদি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছ তাহলে কথা বলনি কেন? গাড়িতে চলো। ওখানে গিয়ে বসবে। তোমার নামে আমার কাছে অনেক রিপোর্ট আসত।' ইমতিয়াজ গাড়িতে উঠতে গেল তড়িঘড়ি।

খান বজ্রকঠিন হাতে ইমতিয়াজের হাত ধরে বললেন, 'চলো। ওই গাড়িতে চলো। কোনও চালাকি করবে না। তোমার রিভলভারটা আমি দেখেছি। চলো।'

রাস্তায় বেশ জ্যাম হয়ে গেছে। ভিড়ের মধ্যেই কোনমতে ইমতিয়াজকে ঠেলতে ঠেলতে গাড়িতে নিয়ে গেলেন খান। জামাল সাদিককে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। সাদিকের শরীরটা বসেই আছে। খান ইমতিয়াজকে সাদিকের পাশে বসালেন। খান বললেন, 'লুকিয়েছিলে কেন?'

ইমতিয়াজ বলল, 'আমার কী করার ছিল বলুন স্যার? অমল আমাকে বলল না কোথায় যাচ্ছে। আমার কৌতূহল হচ্ছিল। ফলো করছিলাম তাই।'

খান রিভলভার বের করে হাতে নিলেন, 'আর?'

ইমতিয়াজ ঘাবড়ে গেল, 'আর কিছু না।'

খান সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, 'রাণাকে সরাতে পাঠিয়েছে তোমায়, তাই তো? রাণা অমলকে না সরালে তুমি দুজনকেই সরিয়ে দিতে আজ, হিসেবটা তো খুব সহজ, না বোঝার কোনও কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

ইমতিয়াজ ঘামছিল। খান ঘড়ি দেখলেন, 'আজকে রাতের মধ্যে তুমি এ দেশ ছাড়বে। দিল্লিতে রিপোর্ট করবে কাল ভোরে। কী করে করবে আমি জানি না। নইলে তোমার এখানের সমস্ত কভার আমি ঢাকাকে দিয়ে দেব। গেট লস্ট!'

ইমতিয়াজ বলল, 'প্লিজ স্যার, আমাকে আরেকটা সুযোগ দিন।'

জামাল উত্তেজিত গলায় বলল, 'হোটেল থেকে ওদের বের করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। আমার লোক খবর দিল। কী করব?'

খান বললেন, 'ব্যাবের হাতে দুজন ধরা পড়েছে?'

জামাল বলল, 'হ্যাঁ।'

খান শ্বাস ছেড়ে মাথুরের দিকে তাকালেন, 'এবার?'

মাথুর বললেন, 'হাসপাতাল চলো। আমাদের আর কী করার আছে?'

খান বললেন, 'সাদিক?'

মাথুর বললেন, 'ইমতিয়াজ দেখুক। না দেখলে ইমতিয়াজকে আমরা দেখব।'

ইমতিয়াজ হাতে চাঁদ পেল, 'দেখব স্যার। চিন্তা করবেন না।'

খান জামালকে বললেন, 'ওরা যেখানে গেছে সেই নার্সিং হোমে চলো।'

জামাল গাড়ি স্টার্ট করল। খান বললেন, 'অমলকে সরানোর প্ল্যানটা তোমার উস্তাদের, তাই তো?'

ইমতিয়াজ মাথা নিচু করে বলল, 'শুরুতে আমাকেই বলা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম তাহলে আমার এখানের কভার এক্সপোজ হয়ে যাবে। ঝুঁকিও ছিল। উস্তাদ তখন রাণাকে পাঠানোর প্ল্যান করেন।'

খান বললেন, 'কী বলা হয়েছিল?'

ইমতিয়াজ ইতস্তত করে বলল, 'যে অমল সাদিকের এজেন্ট হয়ে গেছে।'

মাথুর শিস দিয়ে উঠলেন, 'ঠিক কী চলছিল এখানে, স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আপাতত তোমার উস্তাদকে তুমি ভুলে যাও। যা উস্তাদ আছে, তা আমরাই। নয়তো তোমার কপালে অশেষ দুঃখ আছে।'

ইমতিয়াজ সিঁটিয়ে গেল, 'ওকে স্যার।'

হাসপাতালের থেকে বেশ খানিকটা দূরত্বে গাড়িটা থেমে গেল। খান বললেন, 'এখন কী করা যায়?'

মাথুর বললেন, 'অমল কোনও ভাবে যোগাযোগ করতে পারে নাকি দেখা যাক। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও গতি নেই।'

খান গলা তুললেন, 'জামাল, সাদিকের ক্লোরোফরমের ডোজ আর কতক্ষণ?'

জামাল বলল, 'খুব বেশি হলে আধঘণ্টা।'

খান বললেন, 'ওকে। চলবে। মিনিট পনেরো পরে আবার দিও। আপাতত এটাকে ওদেশে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষার প্রহর গোণা শুরু হল...

৭২

'একটা সাধারণ মেয়ে চিটাগং পোর্ট ওভাবে উচ্চারণ করবে না। মেয়েটা কে?'

ডাক্তার খোন্দকার তাদের আইসিইউ-এর বাইরে দাঁড়াতে বলেছেন। রুমার জ্ঞান না ফিরলেও এখন নাড়ি আছে।

নির্মল বেরিয়েই অমলকে জিগ্যেস করল।

অমল চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'কুড়িটা বাচ্চা। নয়, গিয়াস। এদের মধ্যে যে কেউ থাকতে পারে ওই কন্টেনারে। আপনি পারবেন? না আমাকে দেখতে হবে?'

নির্মল ভ্রু কুঁচকে অমলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি ইন্ডিয়ার লোক, তাই তো?'

অমল বলল, 'বাচ্চাগুলো কিন্তু ইন্ডিয়ার না সাহেব।'

নির্মল শ্বাস ছাড়ল। বলল, 'গোটা ডিপার্টমেন্ট কম্প্রোমাইজড হয়ে গেছে। আমাকে কখন আটকে দেবে আমি নিজেই জানি না। আমি কী করে কী করব জানি না।'

অমল বলল, 'ফোন করতে পারি?'

নির্মল মাথা নাড়ল, 'করুন।'

রাণা চুপ করে বসে আছে। অমলকে মারতে পাঠিয়েছিল তাকে উস্তাদ। অথচ এখানে তো অমলই আছে। আর কে আছে? এই মেয়েটার কাছে সাদিক তাকে পাঠিয়েছিল। মেয়েটা সাদিকের কাছ থেকে এত বড় সব

খবর বের করেছে।

অমল ফোন করল। মিনিট পাঁচেক কথা বলে ফোন রেখে নির্মলকে বলল, 'বললাম। দেখা যাক।'

নির্মল বলল, 'কাকে বললেন?'

অমল বলল, 'যেখানে বললে ওই কন্টেনারটা ধরা যাবে। সোবাহান আর জাহিরের ব্যাপারটাও বলেছি। ম্যাডামের জানা দরকার তার কাছের লোকেরা ঠিক কী করছে! তাই না?'

নির্মল অন্যমনস্কভাবে বলল, 'হু।'

অমল বলল, 'সাদিকের মাস্টারমাইন্ডও জাহির সাহেবই। আমার সেটা বের করতে সময় লেগেছে। জানলে অনেক আগে স্টেপ নেওয়া যেত। অবশ্য এই কৃতিত্বটাও সাকিনারই।'

নির্মল চমকে অমলের দিকে তাকাল। অমল বলল, 'সাকিনার জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই। মেয়েটা অসাধ্যসাধন করেছে। আমার মনে হয় না কন্টেনারে গিয়াস আছে। ওরা এখনও বাংলাদেশের মানুষদের ক্যাটল ক্লাসই মনে করে। নিজেরা কন্টেনারে কোনদিন যাবে না। কুড়িটা বাচ্চা আইসিস বা কোনও লস্কর ট্রেনিং ক্যাম্পে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে।'

নির্মলের ফোনে মেসেজ এল। আলমগিরের মেসেজ এসেছে। পি এমের দফতর থেকে আলমগিরকে ব্যাবের প্রধান করার ফাইনাল অর্ডার এসে গেছে। তার মুখে হাসি ফুটল, 'আপনার ফোনে কাজ হয়েছে মনে হচ্ছে।'

অমল বলল, 'বিপদ বিন্দুমাত্র সরেনি সাহেব। এদেশে পাকিস্তান সিমপ্যাথাইজাররাই সংখ্যাগুরু। বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি কোথাও। সোবাহানরাই এগিয়ে থাকবে। চ্যালেঞ্জটা বুঝতে পারছেন আশা করি।'

নির্মল বলল, 'আমার মনে হয় আপনারা চলে গেলে ভালো হয়। এখানে থাকলে অন্য সমস্যা হবে। আশা করি বুঝতে পারছেন কী বলতে চাইছি?'

অমল বলল, 'আমরা অন্য কোথাও অপেক্ষা করব। সাকিনাকে ছেড়ে আপাতত কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারছি না।'

নির্মল হাত তুলে বাইরের পথ দেখাল, 'প্লিজ গো। থাকবেন না। আমি আর কোনও বিতর্ক চাই না।'

অমল রাণার দিকে তাকাল, 'চলো। আমাদের রিমান্ডে নিচ্ছে না চোদ্দোপুরুষের ভাগ্য ভালো।'

রাণা উঠল। দুজনে হাঁটতে শুরু করল। ফ্লোর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে এসে অমল রাণাকে বলল, 'তারপর? উস্তাদের কাজটা কখন করবে?'

রাণা চমকে উঠে অমলের দিকে তাকাল, 'আপনি জানেন?'

অমল হাসল, 'এস, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই। খান আর মাথুর স্যারের গাড়িটা কোথায় আছে দেখি। সাদিককে হালকা ভাবে নিলে হবে না। ব্যাটার লোক গোটা শহরে ছড়িয়ে আছে।'

রাণা বলল, 'আপনি জানলেন কী করে?'

অমল রাণার কাঁধে হাত রাখল, 'জানাটাই তো আমার কাজ। তা তুমি তোমার কাজটা করলে না কেন?'

রাণা বলল, 'আমি কখনোই কনভিন্স হইনি যে কাজটা আমার করার দরকার আছে। সিম্পল।'

অমল হাসল, 'তুমি বুদ্ধিমানও বটে। তবে উস্তাদ কাঁচা কাজ করার লোক না। নিশ্চয়ই আরও কাউকেও আমার পেছনে পাঠিয়েছে।'

রাণা বলল, 'কিন্তু আপনাকে কেন টার্গেট করেছে?'

নীচের ফ্লোরে এসে গেছিল তারা। অমল বলল, 'পুরোনো রাগ। পরে কোনদিন পুরো গল্পটা শুনবে।'

অমলের ফোনের মেসেজ টোন বেজে উঠল। মেসেজ দেখে অমল দাঁড়িয়ে পড়ল। পরক্ষণেই সে হেসে ফেলল।

রাণা বলল, 'কী হল?'

অমল ফোনটা রাণার দিকে এগিয়ে দিল, খানের মেসেজ। লেখা 'বি ওয়ার ফ্রম ইওর পার্টনার। হি ওয়ান্টস টু কিল ইউ।'

৭৩

রাত বারোটা।

অন্ধকার জায়গাটায় একটা ছোট গাড়ি এসে দাঁড়াল। গিয়াস গাড়ির ভেতর চুপ করে বসে আছে। তার ফোন বাজছে। সে ফোন তুলল, 'বলো।'

'জনাব, আপনি এসে গেছেন?'

গিয়াস বলল, 'হ্যাঁ। তোমরা কোথায়?'

'কাছেই। গাড়ির ভেতর বাচ্চাগুলো এত বেতমিজ যে কী বলব! চৌধুরী সাহেবকে অসুস্থ করে দিয়েছে।'

গিয়াস রাগী গলায় বলল, 'বেত্তমিজি করুক না। কোনও অসুবিধে নেই। ঠিক জায়গায় ঠিক দাওয়াই পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তার কোনও ব্যাপার না।'

'তাহলে কি চলে আসব? চৌধুরী সাহেবের কী হবে?'

'যা অবস্থা আছে, সে অবস্থায় নিয়ে এস। আমি বুঝে নেব।'

'জি জনাব।'

ফোন কেটে অন্য একটা নাম্বার ডায়াল করল গিয়াস। ও-প্রান্তে একবার ডায়াল হতেই ফোন ধরল, 'বলো।'

'জনাব, কন্সাইনমেন্ট এসে গেছে।'

ও-প্রান্তে উল্লাসের শব্দ শোনা গেল, 'আহ্...এটা যে কত বড় কাজ হয়েছে, মৌলানা সাহেব তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। ধরো।'

গিয়াস ফোন ধরে রইল।

ও-প্রান্ত থেকে মৌলানা সাহেবের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আমার বাচ্চা, আমার সন্তান। তুমি পেরেছ শেষ অবধি।'

আবেগে গিয়াসের গলা বুজে আসছিল, 'হুজুর, পেরেছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পরবর্তী লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাব।'

'আমি জানতাম তুমি পারবে', মৌলানার আবেগাপ্লুত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'তোমাকে আমরা এই জন্যই ট্রেনিং দিয়েছিলাম। আজকের কাজে তুমি আমাদের যেভাবে গর্বিত করেছ, তার কোনও তুলনা হয় না। আল্লাতালা তোমার মঙ্গল করবে। তুমি পাকিস্তান এসেই আমার সঙ্গে দেখা করবে। বাকি কথা সেখানে হবে।'

গিয়াস বলল, 'জি জনাব।'

মৌলানা বলল, 'শুনলাম তুমি ওখানে এক জেনানাকে আটকে রেখেছিলে?'

গিয়াস রাগী গলায় বলল, 'জি জনাব। সাদিকের পোষ্য মেয়ে। ভেবেছিলাম মেয়েটা র-এর এজেন্ট। পরে দেখা গেল একবারে বুরবক। কিছুই জানে না।'

মৌলানা বলল, 'সরিয়ে দিয়েছ?'

গিয়াস ক্রুর গলায় বলল, 'না জনাব। সাদিকের জিনিস, ও বুঝে নিক। বাকি জীবন আর কোনও কাজে লাগাতে পারবে না।'

মৌলানা হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'বেশ করেছ। ওখানে আমরা সাদিককে কাজের জন্য রেখে দিয়েছি, আর ও এই সব করে বেড়াচ্ছে। যা করেছ, ঠিক করেছ। আমি তোমাকে সমর্থন করছি। কন্সাইনমেন্ট নেক্সট স্টপেজে পৌঁছালে আমাকে জানাবে।'

গিয়াস বলল, 'জি জনাব।'

ফোন কেটে গেল। ট্রাক আসছে। গিয়াস টর্চ বের করে সিগনাল দেখাল।

তার গাড়ির সামনে এসে ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ল। ট্রাক ড্রাইভার ট্রাক থেকে নেমে বলল, 'বাচ্চাগুলো বড় জ্বালাতন করেছে। চৌধুরী সাহেব মনে হয় অজ্ঞান হয়ে গেছেন।'

গিয়াস হাত নেড়ে বলল, 'ও মরে যাক। ওকে নিয়ে আমার চিন্তা নেই। ওকে সুদ্ধ কন্টেনার লোড করে দাও।'

ড্রাইভার অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'যদি সত্যি মরে যায়, তাহলে বাচ্চাগুলো ওই ডেড বডি নিয়েই থাকবে?'

গিয়াস বিরক্তমুখে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাতে তোমার কী? তোমাকে সেটা দেখতে বলেছি? সাদিককে ফোন করেছিলে?'

ড্রাইভার বলল, 'সাদিককে ফোনে পাচ্ছি না। ওর বাড়িতে ব্যাবের রেইড হয়েছে।'

গিয়াস মাথা নাড়ল, 'শুনেছি। ওতে কোনও ক্ষতি নেই। তুমি শিপের দিকে এগিয়ে যাও...'

গিয়াসের কথা শেষ হবার আগেই তার মুখে একটা টর্চের আলো এসে পড়ল।

গিয়াস চিৎকার করে বলল, 'কোন বেতমিজ? কে?'

ড্রাইভারও চিৎকার করল।

আরেকটা টর্চের আলো এসে পড়ল গিয়াসের মুখে। গিয়াস রিভলভার বের করতে গেল, গুলির শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল। গিয়াস পা ধরে বসে পড়ল। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। সভয়ে বলল, 'কে?'

টর্চ নিভে গেল। একজন এগিয়ে এসে গিয়াসের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ভালো আছেন জনাব? ইসলামাবাদে আপনি আমার কাছ থেকে সিগারেট কিনতেন। মনে আছে?'

গিয়াস হাঁ করে কণ্ঠস্বরের মালিকের দিকে তাকাল, কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'কে? কে তুই?'

লোকটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আদর করে আপনার দেশের লোকেরা আমায় বাজ বলে। নাম শুনেছেন?'

গিয়াস আর কিছু বলে ওঠার আগেই রিভলভারের বাট তার মাথায় মেরে তাকে অজ্ঞান করে দিল...

৭৪

সকাল সাতটা। নরম সূর্যের আলো মুখের উপর পড়ছে সাদিকের।

চোখ খুলে সাদিক দেখল তার সামনের সিটে বসে খান আর মাথুর চা খাচ্ছেন।

খানের পাশ থেকে মাথুর চুক চুক করে শব্দ করে বললেন, 'হুমকিগুলো ভালো ছিল কিন্তু। মানে যেভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল, আমি তো খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম। লাহোরে ছিলাম কয়েকদিন, তখন আমাদের ঘরের সামনে আইএসআই-এর এক অফিসার আসত। সেদিনের থেকেও তুমি বেশি ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে।'

খান শব্দ করে হেসে ফেললেন। দরজা খোলা। সাদিক তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে বাইরে নামল।

বাইরে চায়ের দোকানে লেখা 'ভূতের কড়ক চা।'

সাদিক চোখ ছোট করে চারদিক দেখার চেষ্টা করল। খান গাড়ি থেকেই গলা ছাড়লেন, ‘চিনতে পারছিস? কোথায় আছিস বল তো?’

সাদিকের মাথায় ঘোর লেগে আছে। কোনওমতে বলল, ‘বরিশাল এলাম?’

খান হাসি হাসি মুখে সাদিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘না। আরও বল। দেখি মেলে কি না।’

সাদিক কোমরে হাত দিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। রাস্তার উপর দিয়ে একটা বাস গেল। সাদিক চোখ ছোট করে বাসের নাম্বার পড়ে নিজের মনেই বলল, ‘এইডা আবার কোন জায়গায় চইলা আইলাম?’

চায়ের দোকানি ব্যস্ত ছিল। সাদিক তার কাছে গিয়েই জিগ্যেস করল, ‘কোন জায়গা এইটা?’

দোকানি বলল, ‘দত্তপুকুর।’

সাদিক অবাক হয়ে বলল, ‘সেইটা কোথায়?’

দোকানি রেগে গিয়ে বলল, ‘পাগল নাকি?’

সাদিকও রেগে গেল, ‘আমারে চেন তুমি? তুমি জানো আমি কে?’

দোকানের বাকি খদ্দেররা হাসতে লাগল, ‘কে তুমি? খয়ের খাঁ? পাগলা গারদের লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছে নাকি?’

সাদিক জোর পায়ে হেঁটে গিয়ে গাড়ির জানলার কাছে গিয়ে খানকে বলল, ‘কোথায় এইটা? সত্যি কথা বলেন।’

খান বলল, ‘ইন্ডিয়া। আমরা সাফল্যের সঙ্গে এপারে এসে গেছি। এবার সাদিক সেখ, তোমার তো কোনও চিন্তাই নেই, আমরা দুজন শুধু না, তুষার রঙ্গনাথনও আছেন। আহা...তোমার জন্য আমার খুব ভালো লাগছে। ভালো ভালো লোকের সঙ্গে দেখা হবে। আরও ভালো ব্যাপার হল দিল্লিতে তুমি আরও দুজন পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। তোমার বন্ধু গিয়াস আর লতিফ চৌধুরী। লোকগুলো তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য কেমন হা-হুতাশ করছে তুমি জাস্ট ভাবতে পারবে না।’

মাথুর ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করলেন। সাদিক মাথায় হাত দিয়ে বড় বড় চোখ করে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত বাকি পথ সে আর কোনও কথাই বলতে পারল না...।

তিন দিন পরের কথা

নতুন দিল্লি।

বিশেষ কক্ষে জরুরি ইন্টারোগেশন শুরু হয়েছে অনিল শেখাওয়াতের।

অনিল ঘাম মুছছেন। তুষার বললেন, ‘রেকর্ডার অন করি শেখাওয়াত?’

অনিল ক্রুদ্ধ চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হু।’

তুষার ঈশারা করলেন। ভিডিও রেকর্ডার অন করা হল।

‘ওকে শেখাওয়াত। প্রথমেই আমি জানতে চাই রুমা মেয়েটির সম্পর্কে।’ তুষার অনিলের চোখে চোখ রাখলেন।

অনিল শেখাওয়াত ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘প্রত্যেকটা দেশই অ্যাগ্রেসিভ প্রসেসে স্পাইং করে। আমি আমার মতো করে রুমাকে ঠিক পথে আনতে চেয়েছি। ওর হাজব্যান্ড ওকে কষ্ট দিত, মারতো, ও এমনিই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। আমি ওর জীবনে একটা লক্ষ্য দিয়েছিলাম।’

তুষার পেপারওয়েট নিয়ে খেলতে শুরু করলেন, ‘অ্যাগ্রেসিভ স্পাইং? ওকে। তুমি আমাকে একটা কথা বলো, রুমার লাইফ প্যাথেটিক ছিল বলে তুমি ওকে ইউজ করনি, তাই তো?’

অনিল বললেন, 'করিনি বলিনি। করেছি। সাদিকের ওই একটাই লুপ হোল ছিল। সেখানে ঢুকতে হলে আমাকে একটা মেয়েকে আনতেই হতো। এত বড় ঝুঁকি আর কেউ নিত না। আমার কিছু করার ছিল না। দেশ বাঁচানোর জন্য আমি এই স্টেপটা নিয়েছিলাম।'

তুষার বললেন, 'আর রাণাকে রিক্রুট করা হয়েছিল কেন?'

অনিল বললেন, 'আমি নতুন এজেন্টকে কাজ শেখাতে চেয়েছিলাম বলে রাণাকে পাঠিয়েছিলাম। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে ফিল্ডে কাজই আসল কাজ। যে ফিল্ডে থাকবে, সে একটা ট্রেনিং রুমে থাকা ছেলের থেকে অনেক বেশি জানবে।'

তুষার বললেন, 'তাহলে কোনও ট্রেনিং ছাড়া আমি যাকে খুশি এই কাজে এনগেজ করে দিতে পারি। তাই তো?'

অনিল বললেন, 'ট্রেনিং কেন লাগবে? তারেককে মেরেছিল রাণা। ওর থেকে কোয়ালিফায়েড আর কে ছিল? আমাদের সবার পছন্দ ছিল ওকে।'

তুষার মাথা নাড়লেন, 'বুঝলাম। এবার জাল নোটের ঘটনাটা শুনি।'

অনিল বললেন, 'ইস্টার্ন সাইডে বাংলাদেশের কয়েকটা ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার ছিল। ওরা জাল নোটের ব্যবসা করত। এভাবেই ওদের বিশ্বাস জিতেছিলাম।'

তুষার বললেন, 'আর পূর্ণ বলে ছেলেটি? ও কোথায়?'

অনিল বললেন, 'পূর্ণকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম। আমার অফিসে চা দেয়। ওখানেই থাকে। ওকে কিছু করা হয়নি।'

তুষার হাসলেন, 'উদ্ধার করেছিলে? না ওকেও মারার প্ল্যান ছিল?'

অনিল বললেন, 'মারার কথা ভাবিনি কখনোই।'

তুষার বললেন, 'বেশ। অমলকে মারতে চাইছিলে কেন? মিথ্যে বলে লাভ নেই, ইমতিয়াজের সাক্ষ্য আমি পেয়ে গেছি। যা বলবে, ভেবেচিন্তে বলো।'

অনিল কুঁকড়ে গেলেন। মাথা নিচু করলেন।

তুষার বললেন, 'তুমি নিজে জানো তুমি কী করতে যাচ্ছিলে?'

শেখাওয়াত টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে জল নিয়ে পুরো গ্লাসটা খালি করে দিয়ে বললেন, 'আমি স্বীকার করছি আমি ভুল করেছিলাম। ঠিক করিনি।'

তুষার বললেন, 'গোটা অপারেশনটা পারফেক্ট সাজিয়েছিলে। আমি একেবারেই রুমাকে রাখার কাজটা সমর্থন করছি না, সেটা আমি এথিকস কমিটিকে ফরোয়ার্ড করব। কিন্তু তুমি আমাকে একটা কথা বলো তো অনিল, এটা কি পার্সোনাল স্কোর সেটল করার জায়গা ছিল?'

অনিল বললেন, 'ছিল না। ঠিক সে কারণেই আমি রাণাকে বলেছিলাম অমলের থেকে কাজ শিখে নিতে। আমি জানতাম সেটা টাইম কনজিউমিং ব্যাপার। অবচেতনে আমিও চাইনি অমলের ক্ষতি হোক।'

তুষার চুপ করে গেলেন। শেখাওয়ার উশখুশ করতে শুরু করলেন। ঘরে শুধু ঘড়ির কাঁটার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

মিনিট দুয়েক পর নীরবতা ভঙ্গ করে তুষার বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। অবচেতন। একজন কন্ট্র্যাক্ট কিলারকে পাঠিয়ে দিয়ে তোমার মনে হচ্ছে তোমার অবচেতন সেটাকে মানতে পারেনি। দুঃখের বিষয় শেখাওয়াত, আমাদের এখানে কার কী মনে হল, তা নিয়ে আমরা বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই। যা হয়েছে সেটা নিয়ে চিন্তিত। গোপন খবর যাতে বাইরে না আসে, সে ভয়ে তুমি একজন গরিব চা-ওয়ালাকে পর্যন্ত খুন করেছিলে। তোমার সম্পর্কিত প্রতিটা রিপোর্ট আছে আমার কাছে। তোমার জন্য অমলের মতো এজেন্টকে অবধি আমাদের হারাতে হতো। তোমার কী মনে হয়? তোমার এখন কী করা উচিত?'

অনিল ঘামছিলেন। রুমাল বের করে ঘাম মুছে বললেন, 'আ আ...আমি...আমি ক্ষমা চাইতে চাই।'

তুষার কড়া গলায় বললেন 'চাইবে। তবে তা বলে ভেবো না তাতে তোমার সাতখুন মাফ হয়ে যাবে। আমি তোমার ইউনিট ভেঙে দিচ্ছি শেখাওয়াত। স্ট্রংলি রেকমেন্ড করছি যাতে রুমার মতো কোনও মেয়ের জীবন নষ্ট না করা হয়। শেম অন ইউ! রাষ্ট্রের নামে তুমি একজনের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করেছ। শেম...। আন্তর্জাতিক মিডিয়া আমাদের ছিঁড়ে খাবে। আমি জানি না কী করে এত সব কিছু আমি ধামাচাপা দিতে পারব। সত্যিই জানি না। শেম...।'

অনিল মাথা নিচু করে বসে রইলেন...

কয়েক দিন পরের কথা

কলকাতা।

ফ্ল্যাটের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। কলিং বেল টিপে দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্লান্ত দৃষ্টি তার। চেহারায় হেরে যাবার ছাপ স্পষ্ট।

দরজা খুলে গেল। ভদ্রলোক বললেন, 'আসতে পারি?'

মেয়েটি কয়েকসেকেন্ড ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন।'

লোকটা ঘরের ভেতরে ঢুকল। মেয়েটি বলল, 'বসুন।'

ভদ্রলোক সোফায় বসে বললেন, 'আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমি যেটা করেছি ঠিক করিনি। আপনাকে আমার ওভাবে ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। অনেক পরে আমার উপলব্ধি হয়েছে। হ্যাঁ, আমাকে টিম থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে এই ক্ষমা চাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনি আমার মেয়ের মতো। আমাকে ক্ষমা করবেন কি?'

মেয়েটা চুপ করে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

কিছুক্ষণ পর বলল, 'একটা মেয়ে নরকে আছে দেখে তাকে আরও সহজেই আরেকটা নরকে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায়, বলুন?'

লোকটা মাথা নিচু করে বলল, 'কিন্তু তুমি পেরেছ রুমা, অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি। তুমি অসাধ্যসাধন করেছ, তুমি নিজে জানো না, তুমি কী করেছ।'

রুমা হাসল, 'আমার জানার দরকার নেই। তার থেকেও বড় কথা, আমি করিনি, পরিস্থিতি করিয়ে নিয়েছে। আপনি, আর আপনার বিচার ভালো থাকুক। আপনি আসুন বরং। আর কোনদিন দেখা না হলেই খুশি হব মিস্টার শেখাওয়াত।'

লোকটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুমা দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল...।

দুবাই এয়ারপোর্টের লাউঞ্জ। কিছুক্ষণ আগেই ঢাকা থেকে দুবাই এসে পৌঁছেছে তাদের বিমান। এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জে তারা ছাড়া আর কেউ নেই এই মুহূর্তে।

অমল বলল, 'দেশটা ছাড়তে খারাপ লাগল।'

রাণা গলা নামিয়ে বলল, 'সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি এখনও কোনও ব্রিফ দেননি আমায়। আমরা কী করব, কোথায় যাব, দুবাই গিয়ে কী করব?'

অমল হাসল, ‘অনেকদিন তুমি তোমার প্রিয় কাজ করনি। এবার করবে। আসগরেই কাউন্ট থামিয়ে দিলে চলবে? অপারেশন ব্লু উইং। দেখো তো, নামটা পছন্দ হচ্ছে নাকি?’

রাণা বিস্মিত হয়ে অমলের দিকে তাকাল।

দরজা খুলে গেল। অমল সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল, ‘স্যার এসে গেছেন।’

একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে ঢুকে রাণার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, ‘হাই রাণা, আমি তুষার, তুষার রঙ্গনাথান...।’

শেষ